অনৈক্য, অনৈক্যের আর দ্বিতীয় কারণ নাই। যেখানেই মঙ্গল-ইচ্ছার প্রভাব সেই খানেই ঐক্য, ঐক্যের আর দ্বিতীয় কারণ নাই। কি পরিবারের মধ্যে কি দেশের মধ্যে যাহার যে সম্বন্ধ; মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইলে তাহা ঠিক্ রূপে রক্ষিত হইতে পারে। কেবল বাহিরের ঐক্য নহে, মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে ঐক্য সাধন করিতে হইলেও, মঙ্গল ইচ্ছা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে যেখানে ঐক্যের অভাব সেখানে হয় ত উগ্রভাব, উদ্ধত ভাব, মত্ত ভাব, নয় ত নিস্তেজ ভাব, বিমর্ষ ভাব, ম্রিয়মাণ ভাব,মঙ্গল-ইচ্ছার অপ্রতুল হইলেই মনে ঐরূপ রোগ জন্মে; সুতরাং মঙ্গল ইচ্ছাই সে রোগের একমাত্র ঔষধি। ব্রাহ্মধর্ম্মে যে আছে যে "ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ লোভোব্যাধিরনন্তকঃ" ইহার অর্থ কি? ক্রোধ সুদুর্জ্জয় শত্রু কেন? লোভ অনন্ত ব্যাধি কেন? ক্রোধ বাহিরের শত্রুর দল বৃদ্ধি করে, লোভ শরীরের ব্যাধি উৎপন্ন করে, ইহারি জন্য শুধু নয়, ক্রোধ আমাদের নিজের মনের মধ্যেই শত্রুদলের শিবির সংস্থাপন করে, লোভ শরীরের নয় মনের অভ্যন্তরে ব্যাধির গৃহপ্রতিষ্ঠা করে। মঙ্গল ইচ্ছাই সে শত্রুদমনের এক মাত্র মহাস্ত্র, মঙ্গল ইচ্ছাই সে ব্যাধির এক মাত্র ঔষধি।

ঈশ্বরের নিকট যেমন আমরা আর আর মঙ্গল প্রার্থনা করি, তেমনি যেন তাহার সঙ্গে মঙ্গল ইচ্ছাও প্রার্থনা করি; কেন না মঙ্গল ইচ্ছাটি মঙ্গলের স্পর্শমণি স্বরূপ; যত প্রকার মঙ্গল আছে মঙ্গল ইচ্ছার সংযোগেই তাহা মঙ্গল, মঙ্গল ইচ্ছার বিশ্লেষেই তাহা অমঙ্গল; অতএব স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন যত প্রকার প্রার্থনীয় বিষয় আছে, মঙ্গল ইচ্ছা তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য।

মঙ্গল ইচ্ছা যে কি অমূল্য সামগ্রী তাহা তাহার বিপরীত ... রূপে পরিস্ফুট হই... নিশ্বাস পর্য্যন্ত বায়ুে... ইচ্ছার ভাবভঙ্গী যেন... করিতে আইসে, ... পিশাচ এবং জঘন্য ... মেয়। এই—আর ম... নির্ব্বিষ, কেমন স্থ... মাত্রে মন কেমন ... নিশ্বাস-বা...ত স্বাস্থ্যের প্রশান্ত মুখ-জ্যোতিতে পলায়ন করে, তাহা বি... সোপান, তাহা মনুষ্যে... সহিত উপমেয়, দেবতার...

...কার এই সুমঙ্গল পরমাত্মাকে হৃদয়ে সাক্ষা... আইস আমরা সকলে মিলি... শুভ বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি ... মঙ্গলময় প্রসাদ আমাদিগকে ... তোমার মঙ্গল ইচ্ছা যেন ... জীবনের পথপ্রদীপ হয়; ম... মাদের চিন্তা হয়, মঙ্গলই ... কার্য্য হয়, মঙ্গলই যেন আমা... তোমার প্রসাদ-বারিতে নূতন হইয়া অসঙ্কোচে যেন আমরা ...ধানে অগ্রসর হইতে পারি, তুমি আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ ক...

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

আদেশবাদ।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তা... অবসৃত্ত হয়েন নাই। শিল্পকর যে... শিল্পকার্য্য করিয়া মুক্ত হয় তিনি... মুক্ত হয়েন নাই। তিনি জগতে... সঙ্গে থাকিয়া, জগতের প্রাণস্বরূ...

জগতের [illegible] সম্পাদন করিতেছেন। তিনি জগতের বর্ত্তমান নির্ভর-স্থল। তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছার উপরে জগতের অস্তিত্ব ও পালন নির্ভর করিতেছে। ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে প্রতি মুহূর্ত্তে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে যে হেতু তিনি ইচ্ছা করিলেই সমস্ত জগৎ এখনই বিধ্বংশ হইয়া যায়। জগতের অস্তিত্ব যেমন ঈশ্বরের বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে তেমনি জগৎ পরিপালন-কার্য্যও তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, অতএব ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে তিনি স্বহস্তে আমাদিগকে অন্নপান বিতরণ করিতেছেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, এবং ধর্ম্মবল ও জ্ঞানালোক জন্য আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। করুণাময় পরমেশ্বর যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নানা প্রকারে আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিতেছেন তখন ইহা কি সম্ভব নহে যেমন এক ব্যক্তি তাঁহার সুহৃদ কিংবা আশ্রিত ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান কিংবা কোন বিষয়ে উদ্বোধিত করেন তেমনি পরমেশ্বর কি তাঁহার সাধককে উদ্বোধিত কিংবা হিতকর সুপরামর্শ প্রদান করেন না? ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সকল মনুষ্যকে অহরহ বুদ্ধি ও বিবেক-বৃত্তি দ্বারা যে আদেশ করিতেছেন তদ্ব্যতীত কি তিনি আদেশ করেন না? ভৌতিক জগৎ কঠোররূপে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎ উহাতে বদ্ধ হইলেও এরূপ কঠোর রূপে বদ্ধ নহে। এক আত্মা যেমন অন্য আত্মাকে কোন বিষয়ে উদ্বোধিত করে, তেমনি পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয় সাধকের হিতের নিমিত্ত তাঁহার আত্মার উপর স্ফূর্ত্তি করিয়া তাঁহাকে [illegible] কোন বিষয়ে উদ্বোধিত [illegible] দেশের সকল কালের ধার্ম্মি-[illegible] এইরূপ দেবোদ্বোধনে, এইরূপ দেবানুপ্রাণনে, চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। ভৌতিক জগতের তত্ত্ব যেমন ভৌতিক দর্শন ও পরীক্ষা-সিদ্ধ তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা-সিদ্ধ। সকল দেশের সকল কালের ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগের আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা প্রতিপাদন করিতেছে যে, ঈশ্বর সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন ও তাঁহার নিকট পরমার্থ বুদ্ধি প্রদর্শন করেন।

ঈশ্বর শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন বলিয়া যে তিনি অহর্নিশি সাধকের সঙ্গে কথোপকথন করেন ও সকল বিষয়ে তাঁহাকে আদেশ করেন ইহা সম্ভব নহে। তাহা হইলে মনুষ্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। সকল বস্তুর বিকার আছে; নিকৃষ্ট বস্তুর বিকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর বিকার আরও জঘন্য। এমন যে উৎকৃষ্ট মত যে মঙ্গলময় ঈশ্বর সাধকের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে উদ্বোধিত করেন ইহারও বিকার আছে। এই মত বিকৃত আকার ধারণ করিলে তাহা হইতে বিষময় ফল প্রসূত হইতে থাকে। কোন কোন বিষয়ে ঈশ্বর সাধককে আদেশ করেন বলিয়া কোন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে ঈশ্বর সকল বিষয়ে তাঁহাকে আদেশ করেন। এরূপ অবস্থাতে মনুষ্য ঈশ্বরের স্কন্ধে আপনার ভ্রম ও পাপ চাপাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এরূপ অবস্থাতে মনুষ্য আপনার দোষ ও পাপ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া তাহা দ্বিগুণিত করে। কি ভয়ানক! একে পাপ করিতেছি, আবার তাহার উপর বলা যে ঈশ্বর সেই পাপ করিতে আমাকে আদেশ করিতেছেন? ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের মোহান্ধতা আর কি হইতে পারে? আমরা উপরে

যাহা বলিলাম তাহা মোহান্ধ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিলাম। প্রতারকেরা এই ঈশ্বরাদেশের মত অবলম্বন করিয়া আপনারদিগের অসৎ অভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে দৃষ্ট হয়। আর ইহাও বিবেচ্য যে ধর্ম্মোন্মত্ততা হইতে প্রতারণার পথ পিচ্ছিল।* অতএব ঈশ্বরাদেশ যথার্থ ঈশ্বরাদেশ কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। যাহা বিশুদ্ধ নীতি-সম্মত তাহাই ঈশ্বরাদেশ হইতে পারে। মনুষ্য আপনার মনের কোন ভাব প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেরিত না হইলেও তাহা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিতে পারে, অতএব ভ্রান্ত-স্বভাব মনুষ্যের হৃদয়ে স্ফুরিত ঈশ্বরাদেশের কথা দূরে থাকুক যদি এরূপ আকাশবাণী হয় "মনুষ্যগণ! চুরি কর ও মিথ্যা কথা কহ; চুরি করাতে ও মিথ্যা কথা কহাতে কোন পাপ নাই" এবং সেই আকাশবাণী যদি পৃথিবীর সকল মনুষ্য শুনিতে পায় তাহা হইলেও তাহা আমরা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

যেমন দীর্ঘ ও প্রস্থের সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হয় তেমনি ঐশী কার্য্য ও মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা সম্ভূত কার্য্য উভয়ের মিশ্রণে জগতের ঘটনা সকল ঘটে। মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে যাহা সত্য ও পুণ্য তাহা ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত হয়, যাহা পাপ ও ভ্রম তাহা মনুষ্য হইতে উৎপন্ন হয়। জগতীয় ঘটনা-রূপ জটিল বয়নে পাপের অংশ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা সম্ভূত ও পুণ্যের অংশ ঈশ্বর-প্রেরিত এরূপ মনে করিলে ঈশ্বরের আদেশ মানা যাইতে পারে ও সত্যও রক্ষিত হইতে পারে।

* "The path from enthusiasm to imposture is slippery." Gibbon

ন্যায় ও দয়া বিষয়ক বিচার।

৪৯। কাজেই ঈশ্বর ভয়ানক ন্যায়বান হইতেছেন। অতএব অনন্যগতিক হইয়া মানব কাতর বচনে খৃষ্টের যোগে দয়া ভিক্ষা করিবেন। খৃষ্টকে আশ্রয় না করিয়া একাগ্রক জগদীশ্বরের নিকট রোদন করায় কোন ফল নাই। *

* যদিও খৃষ্ট দয়ার অবতার কিন্তু তাঁহার দয়ার সীমা আছে। যাহাদের অল্প পাপ তাহারাই ইহজীবন খৃষ্টের শরণাপন্ন হইলে বিশুদ্ধ হইয়া অনন্ত স্বর্গলাভ করে। কিন্তু যাহারা মহাপাপী এবং সেই মহাপাপের প্রভাবে সমুচিতরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে নাই তাহারা পরলোকে গিয়া খৃষ্টের বা ঈশ্বরের সম্মুখে কাঁদিয়া ধরণী প্লাবিত করিলেও তাহাদের যাতনাপ্রদ নরকাগ্নি অনন্তকালেও নির্ব্বাপিত হইবে না। অতএব প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের মতে উক্ত দণ্ডের উদ্দেশে ঈশ্বরের কোন মঙ্গলাভিপ্রায় বা অনুগ্রহ নাই। আমরা যে ভাবে তাঁহাকে ও তাঁহার দয়ার অবতারকে দেখিলে ঈশ্বর স্বরূপের বর্ণনে বাইবেলকে অক্ষম বলিয়া মনে করিতে হয়। ফলে ঈশ্বর বাইবেলের ত্রুটিতে লিপ্ত নহেন। তিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে করুণাময়। কেবল বাইবেল প্রকাশকগণের বুদ্ধিরূপ আধারই তাঁহার নির্ম্মল জ্যোতিকে ঐ রূপ ক্ষীণাকারে দেখাইতেছে। এতাদৃশ প্রত্যাদেশ অথবা তদনুযায়ী ব্যাখ্যাসূত্রে ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাতে যতই কলঙ্ক পড়ুক কিন্তু তদ্দ্বারা বাইবেলের প্রকাশকগণের একটি মহৎগুণ আবিষ্কৃত হইতেছে। তাঁহারা স্বভাবতঃ এক নিষ্ঠা বুদ্ধিতে পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন অথবা পৌর ও জানপদবর্গের ঘোরতর পাপাচারে পাপের প্রতি যে অত্যন্ত কোপপরায়ণ ছিলেন বাইবেল হইতে প্রকারান্তরে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের একনিষ্ঠা বুদ্ধিতে ঈশ্বর পাপীর প্রতি অনন্ত নরকের ব্যবস্থাপক স্বরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিলেন। এই তাৎপর্য্যটি অবলম্বন করিয়া আমরা বাইবেলের অনন্ত নরক বিষয়ক দোষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতে পারি। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের নিগ্রহকে যেরূপ দণ্ডরূপ অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করেন বাইবেলের কেহ কেহ যে সেরূপ অনুভব না করিতে পারিয়াছিলেন এমত নহে। যথা, Proverbs III. 12:

৫০। এতাবতা ঈশ্বরেতে যে আদৌ দয়া ছিল না বা নাই খৃষ্টানগণ তাহা বলেন না। বরং ইহাই বলেন যে তাঁহার দয়ার ভাগ খৃষ্টরূপে আবির্ভূত ও অবতীর্ণ হইয়া পাপী মানবকে অভয়-বর-দানে প্রস্তুত রহিয়াছে।

৫১। ঈশ্বরীয় গুণের এ প্রকার বিভাগ এবং তদনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা কল্পনা হিন্দুদিগেরও শাস্ত্রে প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে তাদৃশ বিভাগ ও কল্পনা গৌণ-উপাসনা-কাণ্ডে স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মে খৃষ্টের অবতারত্ব মুখ্য উপাসনার অন্তর্গত। বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম্মে খৃষ্ট দয়ার অবতার হইয়াও ঈশ্বর এবং নরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারস্বরূপ; কিন্তু হিন্দুদিগের দেবগণ একই ঈশ্বরপ্রতিপাদক। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার নানাত্ব মিথ্যা, একত্বই সত্য।

৫২। হিন্দুদিগের মধ্যে কোন দেবতা ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্ত্তীরূপে স্বীকৃত হন না। মুক্তিপক্ষে সকলেই ঈশ্বর-প্রতিপাদক। সকলেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মরূপে পূজিত হন। তাহাতে একই ঈশ্বরের পূজা সিদ্ধ হয়। অধিকারানুসারে এতাদৃশ উপাসনার ব্যবহারিক ভাগ গৌণ কিন্তু সূক্ষ্ম ও সার ভাগ মুখ্যরূপে কথিত হয়।

৫৩। যদিও খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর এবং খৃষ্ট স্থানে স্থানে একই বলিয়া কথিত হন, কিন্তু উপাসনা-কালে খৃষ্ট কেবল মধ্যবর্ত্তী, নেতা, দ্বার, অথবা ঈশ্বর-নিকেতনের দ্বার-কুঞ্চিকা স্বরূপে গৃহীত ও পূজিত হইয়া থাকেন।

৫৪। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের দেবগণ অসংখ্য হইয়াও সকলেই ব্রহ্মপর। কেহই মধ্যবর্ত্তী বা নেতা নহেন। বৈদিক সময়ে অগ্নি কিয়ৎ পরিমাণ মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় ছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসদেব স্বীয় ব্রহ্মমীমাংসায় সকল দেবতাকেই ব্রহ্মপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

৫৫। অতএব ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও গুণের অসংখ্য বিভাগ সত্ত্বেও হিন্দুদিগের উপাসনা অবিভক্ত, কিন্তু খৃষ্টানদিগের দয়ার অবতার খৃষ্ট ঈশ্বরেরই অংশমাত্র হইলেও উপাসনা-পদ্ধতিতে তিনি স্বতন্ত্র গণ্য হইয়া থাকেন।

৫৬। ঐরূপ ভেদ-বুদ্ধিই ন্যায় হইতে দয়ার স্বাতন্ত্র্য অবধারণ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুগণের অভেদ বুদ্ধি অসংখ্য দেবতা ভেদ করত অদ্বৈতনিষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছে। গৌণ উপাসনায় ঐ অদ্বৈতনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু উহা থাকে। মুখ্য উপাসনায় উহাই ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয়।

৫৭। অতএব হিন্দুশাস্ত্রানুসারে গুণ কল্পনা স্থায়ী নহে। জ্ঞানোদয়ে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা, পুরন্দর, দিনকর, রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত নাম রূপ প্রলয় প্রাপ্ত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের একতিলও ক্ষতি হয় না; কিন্তু খৃষ্ট নষ্ট হইলেই খৃষ্টধর্ম্ম রূপ উপাধি আর থাকে না। খৃষ্টরূপ কল্পিত আধারকে ধ্বংস করিয়া দিলে ঈশ্বরের দয়া ঈশ্বরেতেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু বাইবলে তাহার ব্যবস্থা নাই।

৫৮। সুতরাং বাইবল অনুসারে ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রকার গুণের সামঞ্জস্যই উদ্দেশ্য। শাস্ত্রসকল বহু যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে

For whom the Lord loveth he correcteth—Also Deuteronomy VIII. 5. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son so the Lord thy God chasteneth thee—See also Hebreu XII-6. ফলতঃ বাইবলের এ সকল প্রত্যাদেশ কেবল ঐহিক দণ্ডের প্রতি প্রয়োগ হয়। পারত্রিক নরকের প্রতি প্রয়োগ করিলে মহাবিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইবেক।

ঈশ্বরেতে নানাত্ব নাই এবং তিনি অখণ্ডৈক-রসস্বরূপ।

৫৯। মানব সেই অখণ্ডৈকরসস্বরূপেতে স্বীয় মনোবৃত্তি সমূহের আদর্শে যে সকল পৃথক পৃথক গুণ কল্পনা করেন তাহা শূন্যের উত্তর দক্ষিণাদির ন্যায় অথবা কালের ভূত ভবিষ্যতাদির ন্যায় ব্যবহারিক বিভাগ মাত্র।

৬০। ব্যবহারের অনুরোধে অথবা দুর্ব্বলাধিকার বশত আমরা ঈশ্বরের কোন কোন ভাবের, শক্তির, গুণের অথবা লক্ষণের পৃথক নাম দিয়াছি বলিয়া যে তাহা আদৌ পৃথক্ আছে, পৃথক্ হইয়াছে, বা পৃথক্ হইতে পারে এমত ভ্রম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, "ঘটাকাশ," "মঠাকাশ" শব্দ ব্যবহৃত হইলেও আকাশ একই।

৬১। অতএব ন্যায় ও দয়ার স্বরূপতঃ পৃথকত্ব দূরে থাকুক, তাদৃশ দ্বৈতভাব আমাদের মন হইতে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে এক মাত্র মঙ্গলানন্দ-স্বরূপ ইহাই হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য। ‡

৬২। খৃষ্টধর্ম্মের আগমনে ঈশ্বরীয় ন্যায় ও দয়ার এই রূপ দ্বন্দ্বভাব এদেশীয় অনেক ব্যক্তির মনে প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে অনেকে আবার খৃষ্টের উপাসক না হইয়াও ঈশ্বরকে শুষ্ক ন্যায়ের দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মদিগেরও কাহারো কাহারো মত এই রূপ প্রকাশ পাইতেছে যে, ঈশ্বর যখন স্বকীয় ন্যায়-নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন না তখন তাঁহার উপাসনা কি নিমিত্তে?

৬৩। অতএব আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ঐরূপ খৃষ্টানি ও ইংরাজি বুদ্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানী হউন এবং অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মারাধনা করুন।

---

† The Veda ascribing to God attributes of eternity, wisdom, truth &. shows that it can explain him only by ascribing those attributes and applying those epithets *that are* held by man in the highest estimation without intending to assert the adequacy of such description --(Ed. Defence of Vedas by Rammohun Roy)

‡ * * but above all that *one* GREAT ATTRIBUTE which is our Principal concern is his goodness--Here lies the essence of Theism--its practical difference from every other creed in the world.--(F. P. Cobbe.)

The very identity of God requires the coexistence of the most perfect attributes] p: 9. Vedantic Doctrines Vindicated.

He extends the permanent benefits of his justice and of his love through his infinite goodness—ibid p. 10

অশোক চরিত*।

আমরা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত রাজার নাম শ্রুত হই, যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ এখনও লোকসমাজে উজ্জ্বল রহিয়াছে তন্মধ্যে রাজা অশোক সর্ব্বপ্রধান। এক সময় ইহাঁর শাসন কপর্দ্দিগিরি হইতে উৎকল এবং ত্রিহুত হইতে গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রজাদিগের হিতজনক কার্য্য সর্ব্বদাই ইহাঁর মনে জাগরূক ছিল। ইনি একজন বৌদ্ধ প্রচারক, তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা ইহাঁর বিদ্বেষ্টা ছিলেন এবং স্বপ্রণীত গ্রন্থাদিতে ইহাঁর বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা ইহাঁর চরিত্র গ্রন্থবদ্ধ করিয়া যান। অবধান শতক, দিব্য অবধান, এবং অশোক অবধান এই কএকখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে অশোকের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এই শেষের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া অশোক-চরিত্রের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত হইল।

পাটলীপুত্র নগরে বিন্দুসার নামে এক

---

* আসিয়াটিক জর্ণাল হইতে সঙ্কলিত

রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুসীম। বিন্দুসার যখন পাটলীপুত্রে রাজ্য শাসন করিতেন তৎকালে চম্পাপুরী হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে আপনার এক কন্যা উপহার দেন। ঐ কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না। কোন এক সময়ে দৈবজ্ঞেরা ঐ কন্যা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিয়াছিল, তোমার কন্যার অঙ্গে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি, ইনি নিশ্চয়ই রাজমহিষী হইবেন এবং ইহাঁর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞগণের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাস-বলে উপহার-স্বরূপ আপন কন্যারত্ন বিন্দুসারকে অর্পণ করিলেন।

সুভদ্রাঙ্গী রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টে রাজমহিষীগণের অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল এবং উহাঁরা সামান্য কিঙ্করীর ন্যায় তাঁহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি যে সমস্ত কার্য্য-ভার অর্পিত হইল তন্মধ্যে ক্ষৌরকার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। মহিষীরা কহিলেন যদি তুমি এই কর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিতে পার তবে মহারাজ তোমার প্রতি যার পর নাই প্রসন্ন হইবেন।

সুভদ্রাঙ্গী ক্রমশঃ ক্ষৌরকর্ম্মে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। তখন একদা মহিষীরা কহিলেন, তুমি গিয়া মহারাজের ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া আইস। সুভদ্রাঙ্গী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং নৈপুণ্যের সহিত রাজার ক্ষৌর কর্ম্ম করিলেন। তখন রাজা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া পুরস্কার দিবার সংকল্পে কহিলেন, বল তোমার কি অভিলাষ। সুভদ্রাঙ্গী তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাজা কহিলেন, দেখ তুমি জাত্যংশে নিকৃষ্ট, সুতরাং আমি তোমার পাণিগ্রহণে কিরূপে সম্মত হইব। সুভদ্রাঙ্গী কহিলেন, মহারাজ! আমি জাতিতে নিকৃষ্ট নহি; রাজমহিষীগণের আদেশেই এইরূপ নীচ কার্য্য স্বীকার করিয়াছি। বস্তুত আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, রাজরাণী হইব বলিয়াই পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া যান।

তখন রাজা বিন্দুসারের সমস্তই মনে পড়িল। তিনি সুভদ্রাঙ্গীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং উহাঁকে মহিষীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান করিয়া রাখিলেন। এই সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে অশোকের জন্ম হয়। পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিয়া জননীর সকল শোক দূর হইয়াছিল তন্নিমিত্ত উহাঁর নাম অশোক। দ্বিতীয় পুত্রের নাম বীতশোক হইল। অশোক কুরূপ কদাকার ছিলেন, তজ্জন্য বিন্দুসার তাঁহাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন না। অশোকের স্বভাবও অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। ফলত তিনি এইরূপ বামশীল বলিয়া তাঁহার অপর নাম চণ্ড। রাজা বিন্দুসার তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য পিঙ্গলবৎস নামা কোন এক জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে অর্পণ করেন। এই জ্যোতিষিক তাঁহার নানারূপ সৌভাগ্য-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া কহেন, এই বালকই পিতৃসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবেন।

রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তাহা পূর্ব্ববৎ উগ্র ও রুক্ষ। তখন বিন্দুসার ভাবিলেন এক্ষণে অশোককে কার্য্যান্তর ব্যপদেশে স্থানান্তর করাই কর্ত্তব্য। তৎকালে তক্ষশিলায় একটী ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই স্থান রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে বহুদূর। অশোক এই বিদ্রোহশান্তির জন্য তথায় প্রেরিত হইলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, যখন অশোক তক্ষশিলায় যাত্রা করেন তখন নানারূপ অনুকূল দৈববাণী হইয়াছিল এবং তাঁহার যুদ্ধসাহায্যের জন্য আকাশ

হইতে দিব্যাস্ত্র পতিত হইয়াছিল। তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্রোহশান্ত করিলেন এবং তথায় পরম সমাদরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুসীম। তিনি পাটলীপুত্রে অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করেন। তন্নিবন্ধন প্রধান রাজমন্ত্রী তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কৌশল ক্রমে সুসীমকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ও অশোককে পাটলীপুত্রে আনয়ন করেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুকাল উপস্থিত। যদিও অশোককে রাজ্যভার অর্পণ করিতে তাঁহার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মন্ত্রীর অনুরোধে অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন। এক্ষণে অশোক পাটলীপুত্রের রাজা। এদিকে বিন্দুসারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সুসীম তক্ষশিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পৈতৃক রাজ্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন। রাধাগুপ্ত নামে অশোকের এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। অশোক তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যে সুসীমকে পরাজয় করিলেন এবং ভাবী অনিষ্ট নিবারণের জন্য মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, তোমরা এখনই রাজোদ্যানের সমস্ত বৃক্ষ ফল পুষ্পের সহিত ছেদন কর। কিন্তু মন্ত্রিগণ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন না। তখন অশোক স্বহস্তেই সকলের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং রাজমহিষীগণের সহিত উপবনে প্রবেশ করিয়া নিষ্কণ্টকে সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

তিনি একদা শুনিলেন অন্তঃপুরের কতকগুলি স্ত্রীলোক একটী অশোক বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং ঐ সমস্ত শত্রু-রমণীকে ভস্মসাৎ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামা কোন ঘাতককে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হইল এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে তন্মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

পূর্ব্বে অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের একজন বিদ্বেষ্টা ছিলেন এবং ঐ চণ্ডগিরিককেই বৌদ্ধসন্ন্যাসী বিনাশে নিয়োগ করেন। এই সময় একটী বিস্ময়কর ঘটনা উপস্থিত হয়। সার্থবাহ নামে কোন এক ধনবান বণিক ছিল। সে অন্যান্য বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সপরিবারে সমুদ্রযাত্রা করে। পথিমধ্যে তাহার একটী পুত্র হয়। সমুদ্রে জন্ম বলিয়া উহার নাম সমুদ্র। যখন বণিক সার্থবাহ বার বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিল তৎকালে সামুদ্রিক দস্যুর হস্তে পতিত হয় এবং ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে কেবল বণিকপুত্র সমুদ্রই অনেক কষ্টে রক্ষা পান। সমুদ্র হৃতসর্ব্বস্ব; তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুক হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ঐ চণ্ডগিরিকের গৃহে উপস্থিত হন। চণ্ডগিরিক ও তৎক্ষণাৎ উঁহাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হয়, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন সে অতিমাত্র বিস্মিত হইল এবং রাজা অশোককে শীঘ্র এই সংবাদ দিল। অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষু দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভিক্ষুকের বাক্যে বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদন করিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই অলৌকিক কার্য্য রাজা অশোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিল এবং তদবধি তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান হইলেন। পরে তিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ ক্রমে কুক্কুটোদ্যান নামক স্থানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় বুদ্ধ দেবের অঙ্গবিশেষ স্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রযত্নে রামগ্রামে বৌদ্ধমন্দির প্রতি-

ষ্ঠিত হইল। তিনি রাম গ্রাম হইতে গঙ্গা-তটে উপস্থিত হন। তথায় বহুসংখ্য নাগা বাস করিত। তিনি উহাদিগের অনুরোধে উহাদিগের গ্রামে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ক্রমশঃ।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্ত ও দিগ্বিজয়।

জীবন চরিত পাঠ করিতে সকলেই ভাল বাসেন। ইহার হেতু এই যে জীবন চরিত দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। যাঁহার জীবনী লিখিত হয় তিনি কিরূপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কিরূপে সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সমাজের কোন উন্নতি বা পরি-বর্ত্তন সাধন (যদি করিয়া থাকেন) করিয়া-ছিলেন, কিরূপে বিবিধ মতাবলম্বী লোকদি-গের সহিত ব্যবহার করিতেন, কিরূপেই বা সংসারের নানা প্রলোভন হইতে আত্ম-রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সাধারণ জনগণের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতূ-হল উপস্থিত হয় এবং আগ্রহ জন্মে। জীবনবৃত্ত পাঠে অনেকে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন, কারণ তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজের দোষ প্রভৃতি সংশোধন পূর্ব্বক স্ব স্ব উন্নতি বিধান করিয়াছেন এবং সমাজে প্রশংসনীয় এবং গণনীয় হইয়াছেন। অতএব জীবন চরিতের উপকারিত্ব প্রভূত। আবার যদি এই জীবন চরিত কোন মহাপুরুষের জীবন চরিত হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বাংশেই ঔৎসুক্য জনক হয়। মহাপুরুষের নাম শ্রবণে হৃদয়ে একটী ভয়-ভক্তি-সম্বলিত প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপুরু-ষদিগের সম্মান, আদর এবং পূজা দৃষ্ট হয়। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে এটি মহাজন-গৃহীত বাক্য, ইটি মহাজনের উক্তি, এটি মহাপুরুষের কথা, ইটি মহাপুরুষের আচার—এই কথা বলিলে লোকের মনে অতিশয় সম্মান ভাবের উদয় হয়। অতএব মহাপুরুষের জীবন-চরিত আরও অধিক প্রীতিকর ও রুচিকর। যখনই কোন সমাজের অবস্থা ঘটনাচক্রের পরিভ্রমণে এরূপ হইয়া উঠে যে যদি কোন মহাপুরুষ সে সময় আবির্ভূত না হয়েন এবং সমাজের অবনতির প্রতিরোধ না করেন তবে সমাজ বিচ্ছিন্ন এবং শিথিলবন্ধন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা; তখনই সেই সমাজের রক্ষার নিমিত্ত কোন মহাপুরুষ উদিত হয়েন। যৎকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের অন্যায়রূপে ব্যবহৃত প্রভাব দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তৎকালে কপিল-বাস্তু নগরে সমাজ-সংস্কারার্থে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজপুত্র হইয়াও সংসারের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাজ-সংস্কার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রথম বুদ্ধি-বিপ্লবের উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং সমাজের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনীশক্তি পুনঃপ্রদান করি-য়াছিলেন। যৎকালে জেরুজেলাম নগরে ফারিসি (Pharisees) এবং সাডিউসি (Saducees) নামে দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কৌটি-ল্য, অন্তরে বাহিরে দ্বিভাব, এবং লাম্পট্য প্রভৃতি দোষে সমাজ অধঃপাতে যাইতে-ছিল এবং যৎকালে আন্তরিক হৃদয়ের কিছুই না থাকিয়া কেবল মাত্র বাহ্য আড়ম্বরের ঘোর ঘটা সমাজকে রসাতলে দিতেছিল তৎকালে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব। খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে যখন খ্রীষ্টান সম্প্র-দায় মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা, অন্যায় আধি-পত্য ও বলপ্রয়োগ, রোমনগরস্থ পোপ, নামা ধর্ম্মাধ্যক্ষের অসহ্য অত্যাচার, এবং

অন্যান্য গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টান সমাজের অধোগতির সূত্রপাত করিতেছিল, তখন মার্টিন লুথার নির্ভীক চিত্তে সমস্ত কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে সজীব করিলেন এবং বিবেক শক্তির সুচালনার ঐকান্তিক ঔচিত্য প্রচার করিলেন। লুথার যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে খ্রীষ্টান সমাজের সৎপরোনাস্তি অমঙ্গল ঘটিত। তিনি সম্রাট্-সমূহ-সেবিত সভামধ্যে স্বমত বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে ভীতিরহিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, "এই আমি কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলাম; আমি নিজ বিবেকের উপদেশ অবহেলন করিতে পারিব না। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।" ইহা কি সামান্য মনের কথা।

এই প্রকার যখন যখন সমাজের রক্ষার নিমিত্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে, তখন তখনই আমরা দেখিয়াছি যে একজন না একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন। অধ্যবসায়, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, মনস্বিতা, সম্পূর্ণ নির্ভীকতা প্রভৃতি মহাপুরুষের লক্ষণ। স্কটলণ্ড দেশীয় বিখ্যাত সংস্কারক জন নক্সের সমাধিকালে আরল্ অব মর্টন বলিয়াছিলেন "এ ব্যক্তি কখন মনুষ্যের মুখকে ভয় করে নাই।" হিউ ল্যাটিমার টমাস্ ক্রণ্মার, জন কাল্‌বিন্, ইগনেটিয়স লয়োলা প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কারকগণের আবির্ভাব ঠিক উপযুক্ত কালেই হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও রামানুজ, কবীর, দাদূ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি কত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ উদিত হইয়াছেন। সে দিনও বঙ্গীয় সমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নির্জীবতা দূর করিবার নিমিত্ত রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অতএব প্রদর্শিত হইল যে যৎকালেই সমাজের রক্ষার্থে মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হয়, তৎকালেই কোন না কোন মহাপুরুষ তথায় আবির্ভূত হইয়া সমাজকে অব্যাহত অবস্থায় রক্ষা করেন।

ভারতবর্ষের দুইটি বিশেষ গৌরবের সময়। প্রথমটি যখন বুদ্ধদেব প্রথম বুদ্ধিবিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি যখন শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতের প্রচার করিয়া সমাজের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই নাস্তিকত্রাস প্রাতঃস্মরণীয় পূজনীয় শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত লিখিবার জন্যই আমরা এত কথা বলিলাম। ইনি অদ্বৈত মতের প্রচারক। ইনি মঠাশ্রমের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেবতা বলিয়া মান্য, গণ্য এবং আদরণীয়। ইনি ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইনি বহুসংখ্যক অদ্বৈতমতবিরোধি মত নিরাকরণ পূর্ব্বক "সত্যং অদ্বৈতং" মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র ইহাঁকে শৈব বলিয়া লোকে পূজা করে কিন্তু ইনি শৈব মত খণ্ডন পূর্ব্বক অদ্বৈত মত প্রচার করেন। ইহাঁর প্রধান শিষ্য দশজন হইতেই ইহাঁর অদ্বৈত মতের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়ে। আমরা এই সমস্ত যথাস্থানে সবিশেষ বর্ণনা করিব।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্ত লিখিতে হইলে তদ্বিষয়ক গ্রন্থনিচয়ের আশ্রয় লইতে হয়। এরূপ প্রবাদ যে তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়াছেন কিন্তু তৎসমস্ত এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকাকার প্রথিতনামা আনন্দগিরি স্বীয় আচার্য্যের জীবনী এবং দিগ্বিজয় (অর্থাৎ বিরুদ্ধ মত নিরাকরণ) স্বকৃত শঙ্কর-বিজয় নামক গ্রন্থে বহুলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং ইহা

প্রামাণিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, যেহেতু আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং তৎসাময়িক লোক। আর ধর্ম্মভয়ে আনন্দ নিজ গুরুর জীবন-চরিত মিথ্যা-কল্পনা-দোষাক্রান্ত করেন নাই, তবে তাঁহার বিশ্বাস এবং তাৎকালিক আচারের অনুরোধে কতকগুলি আতিশয্যদ্যোতক বর্ণনা করিয়াছেন। গুরুপরম্পরাশ্রুত প্রবাদ অনুসারে ইহা দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহা গদ্যেই বিবৃত,

চতুঃসপ্ততি প্রকরণে সম্পূর্ণ। আচার্য্যের জীবন চরিত বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ মাধবাচার্য্য-প্রণীত শঙ্কর-দিগ্বিজয় মহাকাব্য, ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। মাধবাচার্য্য পাঁচ শত বৎসরের লোক। ইনি বিজয় নগরের বুক্কভূপের সচিব সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা। ইহাঁরা দুই ভাইই অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে স্বশিষ্যদিগের সাহায্যে বেদ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের টীকা করিয়া গিয়াছেন। মাধবাচার্য্য সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে দর্শন সমূহের সারাদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শঙ্করদিগ্বিজয়ের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে আমি শঙ্করবিজয়ের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। তিনি আর লিখিয়াছেন যে পুরাণ কবিরা শঙ্করাচার্য্যের বিষয় অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারাও প্রতীতি হইতেছে যে শঙ্করাচার্য্য মাধবাচার্য্যের বহুকাল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনী বিষয়ক তৃতীয় গ্রন্থ কেরলোৎপত্তি। ইহা তেলুগু ভাষায় রচিত। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের বাল্যকালের বৃত্তান্ত আছে। এতদ্ভিন্ন বেঙ্কটরাম স্বামী দক্ষিণ দেশীয় কবিদিগের যে জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত আছে। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে এবং আচার্য্য-প্রণীত শারীরক ভাষ্য প্রভৃতি হইতে আমরা আচার্য্যের যে জীবন-চরিত সংগ্রহ করিতে পারি তাহা ক্রমশঃ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

৩১৫ সংখ্যক পত্রিকার ২১৬ পৃষ্ঠার পর।

(৭১)

ঈশ্বর আপনি আপনার কারণ তিনি আপনা হইতে আপনি। এবং আপনার জন্যে আপনি।

প্লোটাইনস।

(৭২)

এই তিনি যিনি আপনাকে আপনি করিয়াছেন এবং যিনি আপনি আপনার প্রভু। অন্য এক জন তাঁহাকে আপনার ইচ্ছা অনুসারে করে নাই কিন্তু তিনি আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই।

ঐ।

(৭৩)

ঈশ্বরের স্বরূপ তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করে না। তাঁহার ইচ্ছা ও স্বরূপ একই। ঈশ্বর যাহা আছেন তাহা না হইয়া অন্য প্রকার হইতে কিরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন?

ঐ।

(৭৪)

ঈশ্বর ইচ্ছাময়; তাঁহাতে এমন কিছু নাই যাহা তিনি ইচ্ছা করেন না, তাঁহার ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি হন নাই কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাই তিনি আপনি।

(৭৫)

সূর্য্য যেমন কেবল বস্তু সকলকে দর্শনীয় করে এমত নহে তাহাদিগকে উৎপাদনও করে। সেইরূপ সেই মঙ্গলতম পদার্থ

কেবল বস্তুর জ্ঞেয়ত্বের কারণ নহে; তাহাদিগের অস্তিত্বেরও কারণ।

প্লেটো।

(৭৬)

ঈশ্বর কেবল সার বস্তু নহেন, কিন্তু উভয় মর্য্যাদা ও ক্ষমতাতে সার হইতেও সার।

ঐ।

(৭৭)

ঈশ্বর সকল বস্তুর রাজা, সকল বস্তুর মধ্যবর্ত্তী, তাঁহার নিমিত্ত সকল বস্তু, তিনি সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুর কারণ।

ঐ।

(৭৮)

ঈশ্বর সকল বস্তু চালিত করেন তিনি এই জগৎরূপ কৌশল সংস্থাপন করেন কিন্তু যদিও তাঁহার শক্তি ও মহত্ত্ব স্বপ্রকাশ তাঁহার স্বরূপ অপ্রকাশ।

জেনোফন্।

(৭৯)

কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পশু ও মনুষ্য উভয়েরই সমান কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তি থাকাতে মনুষ্য পশু হইতে ভিন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট হইতে তিনি যত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে এই অধিকার শ্রেষ্ঠ।

এরিস্টটেল।

(৮০)

যদি জগতে ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ ব্যতীত আর কিছু না থাকে তাহা হইলে জগতের আদিও নাই ও ব্যবস্থাও নাই। কারণের কারণ তাহার কারণ এইরূপ করিয়া কারণের অনন্ত শ্রেণী চলিয়া যায়।

ঐ।

(৮১)

যেমন সৈন্যদলের সুশৃঙ্খলা সুব্যবস্থা রাজার জন্য, রাজা তজ্জন্য নহে তেমনি জগতের সুব্যবস্থা ঈশ্বরের জন্য, ঈশ্বর তজ্জন্য নহে।

ঐ।

(৮২)

সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু ঈশ্বরের, তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

ঐ।

(৮৩)

ঈশ্বর ও মঙ্গল প্রশংসার অতীত। ইহাদিগের জন্য সকল বস্তু।

ঐ।

(৮৪)

যদ্যপি এই জগৎ অপেক্ষা আর অধিক জগৎ থাকে তাহা হইলেও এক ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক ঈশ্বর থাকিবার কি প্রয়োজন আছে? যিনি এই জগতের ঈশ্বর এবং যাঁহাকে আমরা সকলের পিতা ও প্রভু বলি তিনি কি অন্য সকল জগতের রাজা ও নিয়ন্তা হইতে পারেন না?

প্লুটার্ক।

(৮৫)

প্রত্যেক কার্য্যে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা কর।

এণ্টোনাইনস।

(৮৬)

আমি কবিতা কিম্বা অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হই নাই; কারণ ইহাতে আসক্ত হইলে বোধ হয় শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান লাভার্থে অসমর্থ হইতাম।

ঐ।

(৮৭)

কেবল অসুখী হইবার জন্য কি ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন?

এপিক্‌টিটস।

(৮৮)

তুমি কি কাম ক্রোধাদি রিপু পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছ? যদি হইয়া থাক তাহা হইলে শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্তিরূপ

উপলক্ষ অপেক্ষা দেবসমীপে আনন্দসূচক বলিদানের ইহা কি শ্রেষ্ঠতর উপলক্ষ নহে?

ঐ।

ক্রমশঃ

রিপুদমন ও পরোপকার।

লোকে প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক কি না তাহা তাহার ব্যবহার ও আচরণ দেখিয়া অনুভব করা যায়। যে ব্যক্তি প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক তিনি সংযতচিত্ত ও পরোপকার-নিরত। ব্রহ্মচিন্তা ও ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ অতীব কর্ত্তব্য ও অত্যন্ত সুখদায়ক। কিন্তু যদি তাহা চরিত্রে ও ব্যবহারের প্রতি কার্য্য না করে তবে তাহা এক প্রকার আধ্যাত্মিক বিলাস মাত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রিপুদমনে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত হয় নাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার অধিকারই জন্মিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্রাহ্মের আচরণ ও ব্যবহার দেখিলে বোধ হয় যে সামান্য ভদ্রোচিত ব্যবহারেও তাঁহারা অভ্যস্ত হয়েন নাই। অধিকাংশ ব্রাহ্ম এরূপ কোমল-স্বভাব যে একটি কটু কথা শুনিলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পড়েন, এমন কি, প্রকাশ্য রাজপথে প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমরা যদি একটী কটু কথা সহ্য করিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারি? এক্ষণকার অধিকাংশ ব্রাহ্মেরা ধর্ম্ম-বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে প্রতিপক্ষের প্রতি কটু কাটব্য বর্ষণে যেমন পারগ, প্রতিপক্ষের কটু কাটব্য সহ্য করিতে তেমনি অপারগ। এক্ষণে "ব্রাহ্ম" এই শব্দ এবং "উগ্র-প্রকৃতি ব্যক্তি" এই বাক্য উভয় পরস্পরের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি শোচনীয় বিষয়! ইহাঁদিগের ব্যবহারে ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে সাধারণ-সমীপে হতগৌরব হইতেছে। আবার কোন কোন ব্রাহ্ম এতদ্রূপ লোভ-পরবশ যে তাঁহারা অন্যের একটুমাত্র পদস্খলন সহ্য করিতে না পারিলেও নিজের ধন মান উচ্চপদ প্রাপ্তির পথে যদি ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে তাহাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। এই সকল ব্যাপার প্রাচীন ঋষিদিগের প্রথাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। তাঁহারা প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিতেন।

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"

"জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক শান্ত শমান্বিতচিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষয় সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।" অশান্তচিত্ত ও অশমান্বিত ব্যক্তির হস্তে ব্রহ্মজ্ঞান পড়িলে তাহার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না।

এক্ষণকার অধিকাংশ ব্রাহ্ম যেমন রিপুদমনে পরাঙ্মুখ তেমনি পরোপকার সাধনে পরাঙ্মুখ। কৈ কয় জন ব্রাহ্মকে দরিদ্রের বাটী গিয়া তাহার সম্বাদ লইতে এবং তাহার সাহায্য করিতে দৃষ্ট হয়? অনেককে ধর্ম্মোৎসবে ধর্ম্ম-সঙ্গীতে মাতিতে দৃষ্ট হয় কিন্তু এপ্রকার কষ্টকর কার্য্যে যত্নবান হইতে দৃষ্ট হয় না। তাঁদের জানা কর্ত্তব্য যে, কষ্টই ধর্ম্ম। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে ও পরস্পরের দুঃখ মোচনে দুই এক পুরুষ পূর্ব্বের পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-স্থল হইতে পারেন।

এক্ষণে কার্য্য অপেক্ষা জল্পনাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিক প্রবল। এক্ষণে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে জল্পনাপ্রধান সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে এক জন সামান্য ব্রাহ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ে এরূপ উচ্চ ভাবের কথা

বলিবেন যে তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হইবে। কিন্তু কার্য্যের বেলা দেখিতে গেলে অধিকাংশ ব্রাহ্মের বাক্য ও কার্য্য মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উচ্চ উপদেশ অপেক্ষা নীতি বিষয়ে সামান্য উপদেশ অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

অনুষ্ঠান।

২৮ ফাল্গুন শ্রী দ্বিপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা ও শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মার উপনয়ন হয়। ২৭ ফাল্গুন ইহাঁদের সমাবর্ত্তন হয়। এই সমাবর্ত্তন উপলক্ষে ঐ দুই দিব্যরূপধারী ব্রহ্মচারী ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান ও স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে পূজ্যপাদ প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মন্ তথা শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মন্! তোমরা এই মাত্র বলিলে 'তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি'। সেই ব্রতরূপ সমৃদ্ধি দ্বারা অনৃত হইতে সত্যে উপনীত হইলাছি। তোমরা যে সত্যে উপনীত হইলে, তাহাতে অনন্তকাল তোমারদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই গায়ত্রী-মন্ত্র তোমারদের চির জীবনের অবলম্বন এবং পরলোকের সম্বল। ইহার দ্বারা চির জীবন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইয়া ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে— তবে কালে তোমারদের আত্মা প্রস্ফুটিত হইয়া তাহা হইতে যে পবিত্রতা প্রবাহিত হইবে, তাহা দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয় হইবে। ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি রাখিবে, এখান হইতেই পরলোকের উপযুক্ত হইবে। শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ধ্যানযুক্ত হইয়া গায়ত্রীর অবলম্বনে তাঁহার সমীপস্থ হইতে থাকিবে। ওঁ এই শব্দ আমারদের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম দান, তাঁহারও এই প্রথম নাম। "প্রথম নাম ওঁকার।" এই সহজ শব্দ ওঁ শিশুর মুখ হইতে প্রথম বহির্গত হয়। 'ওমিতি ব্রহ্ম' এই ওঁ শব্দ ব্রহ্মের প্রতিবোধক। 'সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি'। সকল দেবতারা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ।" জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁকার সাধনার দ্বারা সেই শান্ত অজর অমর অভয় নিরতিশয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ওঁকারকে প্রণব বলে এবং ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাহৃতি। ওঁকার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হইতে ভূলোক ভুবলোক স্বর্গলোক প্রকাশিত হইয়াছে। আমারদের বাক্য যেমন সহজেই নিশ্বসিত হয়, সেইরূপ সহজেই তাঁহার ইচ্ছাতে এই ভূর্ভুবঃ স্বর্গলোক প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ' ভূ এই পৃথিবী লোক। 'ভুব ইত্যন্তরিক্ষং' ভুব অন্তরীক্ষ লোক। 'সুবরিত্যসৌ লোকঃ'। সুব ঐ স্বর্গ লোক। যে অগণ্য নক্ষত্র-সকল ঐ আকাশে জলদক্ষররূপে দীপ্তি পাইতেছে, তাহাই দেবতাদিগের আবাসস্থান, তাহাই স্বর্গ লোক। উপযুক্ত হইলে তোমরাও দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল লোকে অনন্ত কাল আনন্দ ভোগ করিতে করিতে সঞ্চরণ করিবে। গায়ত্রীকে সহায় কর, তিনি তোমারদিগকে স্বর্গ লোক হইতে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবেন। প্রমাদশূন্য হইয়া ভূর্ভুবঃ স্বর্গলোক-ব্যাপীকে ধ্যান কর। আমারদের আত্মার আয়তন এই শরীর। পরমাত্মার আয়তন ভূর্ভুবঃস্বঃ। পরমাত্মার আয়তন অসীম আকাশ, যে আকাশ দূর হইতে দূরস্থ অগণ্য নক্ষত্র দ্বারা খচিত রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা অদ্যাপি তাঁহার অন্ত করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের মন্দির এই জগন্মন্দির, অনন্তের আবাস স্থান অনন্ত লোক। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং 'ভূর্ভুবঃস্বঃ বলিয়া এই

ভূমিতে অন্তরীক্ষে এবং স্বর্গেতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিবে। এই ভূর্ভুবঃস্বর্গব্যাপী পরম দেবতা সবিতা। এই সমুদায় জগৎ যিনি প্রসব করিয়াছেন, তিনি প্রসবিতা, জগৎ-পিতা, অখিল-মাতা। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদয় জগৎ তাঁহারি গর্ভে ছিল। যেমন অণুপ্রমাণ বীজের মধ্যে বৃহৎ বট-বৃক্ষ অব্যক্ত রূপে থাকে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ তাঁরি মধ্যে সেই রূপ ছিল। পরে তাঁহার ইচ্ছা হইল, আর এই সমুদায় জগৎ প্রসূত হইল। সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান-শক্তি ধ্যান কর। এই বিশ্ব-সংসারের রচনাই তাঁর জ্ঞান শক্তির নিদর্শন। "সর্ব্বেনিমেষা-জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি"। নিমেষে নিমেষে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সমুদয়ই সেই বিদ্যুৎ-সমান দীপ্তিমান্ পুরুষ হইতেই ঘটিতেছে। তিনি এই বিশ্ব-সংসার রচনা করিয়া আমারদের কাহারও নিকট হইতে দূরে নাই, তিনি আমারদের অন্তরে থাকিয়া আমারদের প্রত্যেককে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই শুভ বুদ্ধির অনুগত হইয়া চলে, তাহার মঙ্গল হয়; আর যে তাহা না শুনিয়া তাহার বিপরীত পথে চলে, সে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এই প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, যে পরব্রহ্মেতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

প্রথমে আরোহ-প্রণালী দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের কত দূর নিরাকরণ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক, তাহার পরে অবরোহ-প্রণালী ধরা যাইবে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা হইতে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিলেই আরোহ-প্রণালীর কার্য্যসিদ্ধি হয়। কোন কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিবামাত্র আমাদের মনে হয় যে, ইহা অবশ্য কোন না কোন নিয়মের অধীন। এখানে এইটি জানা আবশ্যক যে, কোন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি সমর্থন করিতে পারিলেই যে নিয়মের নিয়মত্ব হয়, তাহা নহে; ঐ জাতীয় অভিব্যক্তি যেখানে যত আছে সর্ব্বত্রই তাহার বল পৌঁছান চাই তবেই তাহা নিয়ম নামের যোগ্য হয়। একটি ফল-পতনের নিয়ম শুদ্ধ কেবল সেই ফল-পতনেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু অসীম জগতের গতিবিধি সেই একই নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়মিত ঘটনা অপেক্ষা নিয়ম ব্যাপক। এই জন্য নিয়মিত ঘটনা হইতে নিয়মে উপনীত করা আর সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত হইতে ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একই কথা।

বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির নিয়ম, সাধারণ হইতে সাধারণ সৃষ্টিতে, কিরূপে ব্যাপ্তি লাভ করে, ইহা দেখিয়া সর্ব্ব-সাধারণ সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ করা আরোহ-প্রণালীর কার্য্য। মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম নির্ণয় কর, পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া জীব-সৃষ্টির নিয়ম নিরূপণ কর; উদ্ভিদগণের জীবন আছে, এজন্য তাহাদিগকেও জীব-শ্রেণীর মধ্যে ধর। হইল। জীব-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া সূর্য্য-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, সর্ব্বশেষে সাধারণতঃ সমুদায় সৃষ্টির নিয়ম কি তাহা অবধারণ কর, তাহা হইলে বলিব যে, তুমি আরোহ-প্রণালী অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছ।

মনুষ্য জরায়ুর অভ্যন্তরে জন্মে এই একটি নিয়ম পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া গেল; ইহা দেখিয়া পশুরাজ্যে সে নিয়মের ব্যাপ্তি আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা উদয় হইল; তাহার পর পরীক্ষা দ্বারা পশুরাজ্যেও উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু পক্ষীরা অণ্ডজ। তবে ত উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি পক্ষীতে সম্ভব হইতেছে না। প্রকারান্তরে হইতেছে। জরায়ু এবং অণ্ড একই, প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে

শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া জীব প্রসব করে; অণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব প্রসব করে। এইরূপ জানা গেল যে জরায়ুও অণ্ড-বিশেষ। সুতরাং মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেই অণ্ডজ। এইরূপে ঐ বিশেষ নিয়মটিকে সাধারণ করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুরা যেন অণ্ডজ হইল। কিন্তু সমুদ্রতলে যে সকল আদিম জীব আছে, যাহারা জড় হইতে কেবল এক ধাপ উচ্চ বই নয়, তাহারা স্বেদজ। তবে কি এই খানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইল? না তাহা নহে। অণ্ডের অভ্যন্তরে প্রথমে কেবল স্বেদই বর্ত্তমান থাকে। পরে তাহা দ্বিভাগ, চতুর্ভাগ, ষোড়শ ভাগ, এইরূপ অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমশই সংহত হইতে সংহত ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ আর সমুদ্রতলস্থিত জীবোৎপাদক স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ, উভয়ের মধ্যে জাতিগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। আরো আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্বেদও যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া এক হইতে অনেক অঙ্গে পরিণত হয় সেইরূপ শেষোক্ত স্বেদও খণ্ড খণ্ড হইয়া এক জীব হইতে অনেক জীবে পরিণত হয়। এক স্বেদজ জীব দ্বিখণ্ড হইয়া দুই জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া চারি জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ষোলো জীবে পরিণত হয়, এমনি করিয়া এক একটি স্বেদজ জীব অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদের ন্যায় অনেক সংখ্যায় পরিণত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জরায়ু যেমন অণ্ড-বিশেষ অণ্ড তেমনি স্বেদ-বিশেষ। অতএব মনুষ্য-হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলই স্বেদজ. এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি আর এক ধাপ উচ্চে উঠিল। অতীব নিকৃষ্ট জীব এবং অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, অনেক সময়ে জীবকে উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ্‌কে জীব বলিয়া ভ্রম হয়, এবং অনেক স্থলে কোন্‌টি জীব কোন্‌টি উদ্ভিদ্, উভয়ই বা জীব, উভয়ই বা উদ্ভিদ্ ইহার কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না। অতীব নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌ও স্বেদজ, এবং উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌কে এক প্রকার অণ্ডজ বলিলেও বলা যায়। কেন না বিজ্ঞানের চক্ষে বীজ এবং অণ্ডের মধ্যে জাতি-সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। বীজের আদিম উপকরণ অণ্ডের আদিম উপকরণ, এবং জীবোৎপাদক স্বেদের উপকরণ সকলই একজাতীয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জীব-রাজ্য এবং উদ্ভিদ্-রাজ্য সমস্ত ব্যাপিয়া এই এক নিয়ম বর্ত্তমান আছে যে, এক স্বেদ-পদার্থ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া হয় অনেক জীব অথবা অনেক উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, নয় উহা ঐরূপ বিভক্ত হইয়া এক-একটি জীব কিংবা উদ্ভিদের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়; আর অমনি সেই জীবস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি রূপে জীব-একটি বা উদ্ভিদ্-একটি উৎপন্ন হয়। মনে করিও না যে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত ঐ নিয়মের ব্যাপ্তি হইলেই যথেষ্ট হইল; সমস্ত জীবজন্তুর আধার যে পৃথিবী তাহার উৎপত্তিও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রথমে এক সূর্য্য ছিল, তাহা হইতে তাহার কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী-রূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী দ্রবীভূত অবস্থায় সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ইহা একটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। যেমন অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদ বিভক্ত হইয়া-হইয়া জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়, সেইরূপ সূর্য্য এবং তাহার ছিন্নাংশ-সকল বিভক্ত হইয়া-হইয়া সৌর জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই একটি ব্যাপক মূল নিয়ম পাওয়া যায় যে, এক হইতে অনেকে পরিণতি, একাকার হইতে বিভিন্নাকারে পরিণতি, এইরূপ নিয়মে সৃষ্টির মূল হইতে তাহার শাখা প্রশাখা উদ্ভূত হইয়া থাকে।

উপরে পাওয়া গেল এই যে, মনুষ্য সৃষ্টির নিয়ম মনুষ্যেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু যখন মনুষ্য আদৌ জন্মে নাই সে সময়ে তাহা অপরাপর জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্‌রাজ্যে প্রকারান্তরে বলবৎ ছিল। এবং তাহারাও যখন জন্মে নাই তখন তাহা প্রকারান্তরে সৌর জগতে বলবৎ ছিল। যখন সৌর জগৎও জন্মে নাই, যখন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আদি-ভূত সমস্ত-আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল, তখনও উক্ত নিয়ম প্রকারান্তরে বলবৎ ছিল। উপরে যেমন দেখা গেল যে, কোন বিশেষ সৃষ্টির নিয়ম সেই বিশেষ সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক, সেইরূপ নির্ব্বিশেষে বলা যাইতে

পারে যে, সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক। প্রামাণিক পণ্ডিত বলেন যে, শুদ্ধ কেবল জগতের নিয়ম আবিষ্কার করিতে যত্নশীল হও। জগতের কারণ অন্বেষণ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জগতের নিয়ম যাহা তুমি মান তাহা তোমার মনোরাজ্যে, না তোমার মনের বাহিরে কোথায় অবস্থিতি করিতেছে? যখন দেখা যাইতেছে যে, জগতের নিয়ম তোমার থাকা-না-থাকার উপর নির্ভর করে না, তুমি না থাকিলেও জগতের নিয়ম যেমন তেমনি থাকিবে; এবং যখন বাহ্যবস্তু সকলের পরীক্ষা হইতেই সে নিয়ম আবিষ্কার করিয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে মন হইতে উদ্ভাবন করিয়া পাওয়া যায় না, তখন সে নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, কার্য্যের অভিব্যক্তি অগ্রে না তাহার নিয়ম অগ্রে? যখন কোন কার্য্য অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা কোন না কোন নিয়মানুসারেই অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তাহার নিয়ম সুস্থির থাকা চাই। অতএব দুইটী কথা সুনিশ্চিত, প্রথম জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; দ্বিতীয়, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্যের অভিব্যক্তি। নিয়ম সম্বন্ধে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, নিয়মের কোন বল আছে কি না? যদি বল, বল নাই, তবে তাহার আছে কি? নিয়ম দ্বারা কার্য্য হয় অথচ তাহার বল নাই, এ কথাই বা কিরূপ। যে রাজার কোন বল নাই, সে রাজার নিয়মে কি কোন কার্য্য হয়? অতএব নিয়মের সঙ্গে বলেরও যোগ আছে। নিয়মের সঙ্গে যদি বলের যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবে কারণ-শব্দের অর্থ, এবং নিয়ম-শব্দের অর্থ একই হইয়া দাঁড়ায়। যদি বল যে, নিয়মের বল আছে ইহাই আমি নিশ্চিত বলিয়া মানি, কিন্তু কারণের অস্তিত্বের কিছুই নিশ্চয়তা নাই; তবে তুমি একটা আতা ফল হস্তে করিয়া ইহাও বলিতে পার যে, দেখ আমি একটা আম্রফল পাইয়াছি; ইহার গা দাগরা দাগরা; ইহার সাদা শাঁস এবং অনেক গুলি কালো কালো বীজ ইত্যাদি। এরূপ আম্রফলকে আতা ফল বলিলেই ত ভাল হয়।

জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে; তাহা সাক্ষী-গোপালের ন্যায় নিষ্কর্ম্মাও নহে; তাহার বলে জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; এইরূপ, কারণের যত গুলি উপাধি আছে, সকল গুলিই নিয়মেতে আরোপিত হইল, আতা ফলের যত-গুলি উপাধি আছে সকল-গুলিই আম্রফলে আরোপিত হইল, অথচ আমি এক একটি কোট ধরিয়া বসিলাম যে, আমি নিয়মই বলিব, কারণ শব্দ মুখে উচ্চারণ করিব না, আম্রফলই বলিব আতাফল কোন মতেই বলিব না; এরূপ করিলে কারণেরও গৌরব-হানি হইবে না, নিয়মেরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে না; আতাফলেরও গৌরব হানি হইবে না, আম্রফলেরও গৌরববৃদ্ধি হইবে না; হইবে কেবল একটা শব্দের পরিবর্ত্তন, আর কিছুই নহে। এরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তনের না আছে অর্থ, না আছে হেতু, না আছে ফল, কেবল অনর্থক একটা গণ্ডগোল মাত্রই সার। অতএব "কারণ মানিব না," এ প্রতিজ্ঞা কোন কার্য্যের নহে। যদি তুমি নিয়মের বল মানিলে তবে আর কারণ মানিবার বাকি কি রহিল? যাহার বলে কার্য্য হয় তাহার নামই কারণ। "কারণ মানিব না" তোমার এ প্রতিজ্ঞা একত রক্ষা পাইল না, তাহাতে আবার নিয়মকে বল-বিশিষ্ট একটা বস্তুর ন্যায় করিয়া গড়িয়া তোলা হইল; একি সৃষ্টিছাড়া অসঙ্গত ব্যাপার! নিয়ম শূন্যে আছে এবং তাহার বল আছে এই রূপ একটা অদ্ভুত প্রকারের কারণ খাড়া করিতেছ অথচ শক্তি-বিশিষ্ট বস্তু যাহা সম্ভবপর কারণ, তাহা মানিতে ভার বোধ করিতেছ। শূন্যের উপরে গন্ধর্ব্ব-নগর স্থাপন করিতেছ, অথচ পৃথিবীর কোন প্রদেশে যে নগর স্থাপন হইতে পারে ইহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছ না।

সে যাহা হউক্ আমরা নিয়মকে কারণ বলিতেও প্রস্তুত নহি, আর নিয়ম কোন বস্তুর অবলম্বন ছাড়িয়া শূন্যে শূন্যে ফিরে, ইহা বলিতেও প্রস্তুত নহি; শক্তিমান বস্তুকেই আমরা কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকি। এরূপ মূলতত্ত্ব-সকল সহজ বুঝিলে অতি সহজ, নচেৎ কেবল শব্দের দ্বন্দ্ব-কোলাহলই যথাসর্ব্বস্ব।

ক্রমশঃ

AHMEDABAD PRARTHANA SAMAJ.

The sixth anniversary of the Samaj was celebrated on the 16th and 17th December, 1877. The gate of the Samaj mandir was decorated with a beautiful arch, bearing the inscription সত্যমেব জয়তে and surrounded with plantain and other leaves. The compound [illegible]namented with gay-looking flags. On the doors and galleries were hung garlands of sweet-scented flowers, and fragrant incense was burnt outside and perfumed the breeze inside the temple where the devout worshippers were offering prayers to the All-Merciful Creator of the Universe and the Beloved Heavenly Father of mankind. Appropriate music both outside the mandir and inside at intervals added its charms to the festive occasion.

On the morning of the 16th the Samajists and their friends assembled at 8 o'clock when the Secretary read the annual report of the Samaj and offered thanks on behalf of the Samajists to the Almighty Disposer of events for the success vouchsafed to the Samaj during the year under report. He then delivered a sermon on the duties of the Samajists and exhorted them to endeavour to impart the truth to their less enlightened countrymen. Then commenced the divine service by the chanting of a hymn by the songsters, followed by prayers in prose and verse by the congregation and the singing of hymns by the singers and concluded with Arti or choral hymn in chanting which all joined. On the evening of the same day the service was conducted by Rao Bahadur Chintamani S. Chitnis, the worthy President of the Kaira Samaj. The mandir was beautifully lighted. The number of the people who attended the service was so large that many had to stand at the windows and doors. The subject of the sermon, "বৈরাগ্য" was illustrated by the Rao Bahadur with fitting Puranic stories, which, being national, were quite pleasing to the orthodox of whom many influential persons were present. The sermon and service lasted for two hours.

For the morning and evening services of the next day, special hymns were composed by Rao Bahadur Bholanath Sarabhai, the learned President of the Samaj. The morning service was conducted by himself. He taught very ably in his sermon that piety to God should always be combined with virtuous conduct in life in the intercourse between man and man. He had trained a number of children, including his own, to sing a hymn. They were tastefully dressed and placed on a line on a front bench. After the sermon, they sang a hymn so harmoniously and sweetly as to charm all. The members then unitedly sang the praises of God and prayed. The singing of holy songs by professional singers increased the effect of united prayer. In the evening Babu Satyendranath Tagore conducted the divine service. The gathering was so great that not an inch was left occupied. Those who came a little late could find no room either to sit or to stand inside or outside the temple, and had actually to return disappointed. The worthy son of the great man, who reared the tender plant sown by Rammohan Rai, the founder of the Brahmo Samaj in Calcutta, delivered an excellent and a very learned sermon. Babu Satyendra lucidly explained the great fundamental principles of the Brahma Dharma, quoting authorities for our doctrines from the Veds, the Upanishads, and the Gita. He also tried to awaken the Samajists to a sense of their duty to themselves, to their country and to God. He called upon the sympathizers and all who can reason rightly to declare themselves and join the Samaj openly and advised the Samajists to instruct the truth to their families and bring them to the mandir so that they may join in public worship. The sermon alone lasted more than an hour. Though the doctrines, that inculcate the Fatherhood of God and the Brotherhood of man, were not quite palatable to the orthodox portion of the audience, they joined us heartily in worshipping God, the Omnipotent Creator and Ruler of the universe. The divine service, that had commenced at 6 P. M. ended at about 8-30. On both days morning and evening, all the proceedings were satisfactorly conducted.

The Samaj is making slow but steady progress notwithstanding the many and serious obstacles in its way. During the sixth year of its existence, it worked as satisfactorily as during the previous years. The erection of a mandir during the preceding year at a cost of Rs 12000, has given a permanent footing to the Samaj and facilitated its operations. Nearly Rs 5600,

were contributed, to the Building Fund by our fellow-citizen, Rao Bahadur Beheehurdas Ambaidas, C. S. I. For this munificent help we again express our hearty thanks. Rao Bahudur Bholanath Sarabhoy, who had lent without interest. Rs. 1100 to the building fund, has generously intimated that the sum may be considered a present to the Samaj, and has thereby conferred a fresh obligation upon us. Several other male and female members have sent in to the Samaj presents in various shapes and the managing committee feel obliged to them for thus assisting the good cause.

Many interesting questions, that engage the attention of the Hindoo religious world, were discoursed upon and discussed in the Samaj mandir and out of it. The fictions about the intercalary month, called Adhik or Purshotum Mas of which so much is made by the interested Brahmins and which happened to fall within this year, were taken up in a series of discourses; the Ekadashi, the Ram nowmi and other holidays on which people observe fasts and vigils, were also made the subjects of lectures delivered on those days in the Mandir. The Samaj is indebted to Babu Pratap Chunder Muzumdar who kindly visited Ahmedabad and gave edifying sermons and conducted religious worship both public and private. We feel grateful to Babu Satyendranath Tagore, Rao Bahadurs Bholanath and Gopal Rao, Messrs Waman Abaji Moduc, Runchorlal Chotalal, Dhirupram V. Kyas B A Harilal Naransi, Bulakhidas Gongadas Chotalal M. Baxi, Revashunker Amba Ram Pragovind Rajaram, Govindlal Balaji and others for the instructive sermons they deliverd on God, Salvation, Relation between God and Man, Charity, Piety, Practical Virtue, Idol Worship, Superstition, Duties of Man, Human Nature, &c. &c.

The promotion of Rao Bahadur Gopal Rao Huri to the joint judgeship at Tana, though a happy event in itself, deprived the Samaj of the services of an active and influential member.

At the weekly prayer meetings the hall of the Mandir was generally crowded. More than twenty five members have signed a pledge to banish idolatry and nature-worship from their daily devotions. Others who, while they accept the principles of the Samaj theoretically, are unable from worldly opposition to take the pledge, have agreed to offer daily prayers.

A branch Samaj has been opened at Kaira and its first anniversary was celebrated in September last. An attempt, made to establish a Samaj at Broach, was defeated by the advocates of idolatry and pantheism. who converted it into an organ of their own. We must try again. We are endeavouring to preach our principles to our country-men in other places also, and pray for God's grace without which such an undertaking cannot succeed. The extensive sale of our prayer-books is gratifying. The income of the Samaj during this year was encouraging. Instead of the varying and uncertain monthly and yearly contributions, upon which we have to depend at present, we ought to have a permanent fund, the interest of which can afford us a steady and certain annual income besides the voluntary gifts, subscriptions and donations of zealous members and earnest friends. May it please the Almighty to fulfil our wishes in this respect and to make our Samaj stronger and more useful in propagating the true principles of religion, and pure piety.

Mahipat Ram R. Nilkanth
Secretary, Ahmedabad
Prarthana Samaj

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২ বৈশাখ রবিবার ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক সমাজ হইবে এবং শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদি গ্রহণ করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদিগের অগ্রিম মুল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৮০০ শকের অগ্রিম মুল্য প্রেরণ করিবেন।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত মতে কার্য্য হইবে, অতএব ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথাসময়ে শ্যামবাজার নন্দন বাগানস্থিত মৃত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উপকৃত ও উৎসাহিত করেন।

২ রা বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার

সময় আলোচনা সভায় শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।

১৯ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময়ে নিয়মিত মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং তৎসমাজের নিয়মানুসারে ১৭ সোমবার, ১৮ মঙ্গলবার এবং ১৯ বৈশাখ বুধবার সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময়ে নিয়মিত উপাসনা হইবে, ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে সাম্বৎসরিক উপাসনা হইবে।

১ বৈশাখ ১৮০০
নন্দন বাগান
শ্যামবাজার
ব্রাহ্ম সমাজ

শ্রী কেদার নাথ মিত্র
সহঃ সম্পাদক।

JUST PUBLISHED

Science of Religion by Rajnarain Bose. To be had at the Adi Brahmo Samaj Library and the Canning Library. Price 4 annas. Postage ½ anna.

আয় ব্যয়।

পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৭৯৯ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১০৩৪
পূর্ব্বকার স্থিত	১৬৮ ॥০
সমষ্টি	১২০২ ॥০
ব্যয়	১০২০ ।৶১৫
স্থিত	১৮২ ।৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৯১ ৸০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯১ ৷০
পুস্তকালয়	১৩৯ ॥৶১৫
যন্ত্রালয়	১৭০ ৸৶১০
গচ্ছিত	১৪০ ।১৫
সমষ্টি	১০৩৪

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	২৫৩ ॥৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৯ ৸৶৫
পুস্তকালয়	১০১ ৶১০
যন্ত্রালয়	৩২৮ ৶৫
গচ্ছিত	১৩৪ ।৶১০
সমষ্টি	১০২০ ।৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীমত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২৫
" কোন শ্রদ্ধাবান মহাশয়ের দান	১০০
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৫
" রাখালচন্দ্র সেন	১২
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
" হরিমোহন নন্দী	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭
" শিবচন্দ্র দেব	৫
" মথুরানাথ গুহ ...	৫
" আশুতোষ ধর	৫
" কালীনাথ দত্ত	৪
" মনিলাল মল্লিক	৪
" শ্রীনাথ মিত্র	৩
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ...	২
" ভুমেশচন্দ্র বসু	২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২
" প্যারিচাঁদ মিত্র	২
" রাজনারায়ণ ধর ...	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" যদুনাথ মিত্র	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" জয়গোপাল সেন	১
" কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৷৶০
" কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	॥০
	৩৫১৶০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুত রাজারাম মুখোপাধ্যায় ...	১৬
" দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
	২৪
দানাধারে প্রাপ্ত ...	১৫৸৶১০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	॥৶১০
	৩৯১৸০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd No 52.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা
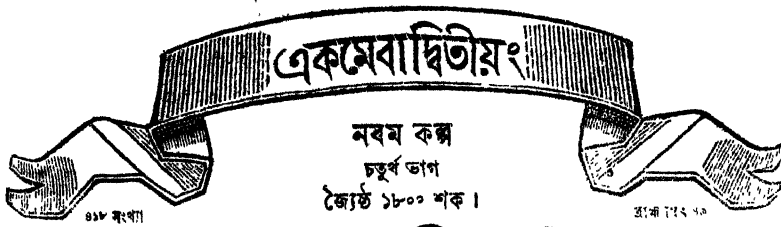
ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষশেষ দিবসের ব্রাহ্ম-সমাজ।

৩১ চৈত্র শুক্রবার, ১৭৯৯ শক।

দেখিতে দেখিতে সংসার-চক্র ঘূর্ণিত হইয়া আমারদিগকে এক সংসরের পথ অগ্রসর করিয়া দিল! এখন প্রকৃত পক্ষে আমরা মৃত্যু কি অমৃতের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি সত্য হইতে ধর্ম্ম হইতে—ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল অচির অস্থায়ী বিষয়-সুখে, ইন্দ্রিয়-সুখে, স্বার্থসাধনে অনুরক্ত থাকিয়া সম্বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া থাকি; তবে মৃত্যুরই নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। যদি, শিক্ষা সাধনে—ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে বিমুখ হইয়া কেবল ধন-সম্পদ উপার্জ্জনে কালক্ষেপ করিয়া থাকি, তবে এই বর্ষশেষ দিবস সম্মুখে দেখিয়া আমারদিগকে ব্যথিত ও সন্তপ্ত হইতেই হইবে; অমৃতধামের অগ্রপদ যাত্রীদিগকে সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইতে হইবে—তাঁহারদের আনন্দ কলরবে আমারদের নিদ্রিত আত্মা জাগ্রত হইয়া, বিচেতন ছিন্ন চৈতন্য লাভ করিয়া মৃত্যুরই করাল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবে। দুর্ল্লভ জীবন কাল বিফলে অতিবাহিত হইয়াছে জানিয়া নিদারুণ আত্মগ্লানিতে হৃদয় বিদগ্ধ হইতে থাকিবে। নবতর সুখ, কল্যাণতর আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অভিনব শোক সন্তাপ, নবতর দুঃখ বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া আত্মা মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইবে, মৃত্যুকে অভিমুখীন দেখিয়া আত্মা ভয় বিভীষিকায় অচেতন হইয়া পড়িবে।

যদি অমৃতের অভিমুখীন হইয়া থাকি, তবে এই বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ আমারদের সন্নিধানে এক অপূর্ব্ব সুখের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে। সত্যের উচ্চতর উৎস, মঙ্গলের মহত্তর প্রস্রবণ-পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া ঈশ্বরের নবতর স্নেহপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া আমারদিগকে আরো তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিবে। তাঁহার ধর্ম্ম পালনে—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমারদিগকে অপরাজিত উৎসাহ, অটল অনুরাগ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য প্রদান করিবে। আমরা জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক-পূর্ণ মর্ত্ত্যলোকবাসী হইলেও সেই অমৃতধামের সঙ্গে—সেই অমৃত পুরুষের সঙ্গে আমারদের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়া

আমারদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আশা আনন্দ প্রদীপ্ত করিয়া দিবে।

বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা অমৃতের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারদের ত কথাই নাই। তাঁহারা যথার্থই ঈশ্বরের সেবক উপাসক। তাঁহারদের জীবন-কাল প্রকৃত প্রস্তাবেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহারা শিক্ষা সাধনের উপযুক্ত পুরস্কারই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ মৃত্যুর অভিমুখীন হইয়াছেন, তাঁহারা কি কেবল শোক-সন্তাপ-অনলে দগ্ধ হইতেই থাকিবেন? তাঁহারদের কি আর উদ্ধারের আশা নাই, মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই? ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা মাতা নন যে তিনি তাঁহার কোন পুত্র কন্যাকে এককালে পরিত্যাগ করিবেন, তিনি আমারদের এমন গুরু—এমন শিক্ষক নন যে তিনি তাঁহার কোন শিষ্যকে শিক্ষা শোধনের অনুপযুক্ত দেখিয়া ছাড়িয়া যাইবেন। যে কোন রূপেই হউক, তিনি তাঁহার পথহারা সন্তান, জীবাত্মাকে শিক্ষিত শোধিত করিয়া আপনার সহচর অনুচর করত ধ্রুবধাম অমৃতধামে লইয়া যাইবেন। তিনি পাপীকে দণ্ড দিয়া, পুণ্যাত্মাকে আপনার প্রসন্নমুখ দেখাইয়া সর্ব্বদাই কল্যাণ-পথে লইয়া যাইতেছেন। পিতামাতা যেমন রুগ্ন সন্তানকে ঔষধ পথ্য এবং সুস্থ প্রকৃতিস্থ পুত্র কন্যাকে বলপুষ্টিকর অন্নপান প্রদান করিয়া উভয়েরই বল-বর্দ্ধন ও স্বাস্থ্য সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরও তেমনি পাপী পুণ্যাত্মা, যাহার যাহাতে শিক্ষা শোধন ও উন্নতি হয়, তিনি তাহাকে তাহাই বিধান করিয়া আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। রোগীর পক্ষে যেমন তিক্ত কষায় ঔষধাদি তাহার আরোগ্য লাভের হেতু, পাপীর পক্ষে তেমনি তীব্রতর আত্মগ্লানি তাহার আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিবার একমাত্র কারণ। অতএব অদ্য এই বর্ষশেষ উপলক্ষে একবার আলোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা দ্বারা সকলে সম্বৎসরের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া দেখ, যে এই সুদীর্ঘ কাল ধর্ম্মের আদেশে—ঈশ্বর উদ্দেশে অতিবাহিত হইয়াছে কি না। যদি হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মের জয় ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া আনন্দে অগ্রসর হও। যদি ধর্ম্মসাধনে আত্মোন্নতি সম্পাদনে ত্রুটি নিবন্ধন, হৃদয় উদ্বেলিত ও আকুলিত হইয়া উঠে, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা-জনিত আত্মগ্লানিতে অন্তর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তবে এখনও আত্মার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই—এখনও সংস্কৃত ও শোধিত হইবার আশা আছে, এই প্রত্যাশাতে উত্তেজিত হইয়া বিনীত ভাবে অমৃতসাগর-সন্নিধানে উপনীত হও। এখন অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই আত্মার অদ্বিতীয় চিকিৎসক ঈশ্বর সন্নিধানে হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করিয়া দাও আত্মার গূঢ় বেদনা আভ্যন্তরিক যন্ত্রণা সকল তাঁহাকে প্রদর্শন কর, তিনিও সঙ্গোপনে অমৃতবিন্দু বর্ষণ করিয়া আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিবেন। তিনি শোক সন্তাপাশ্রু মোচন করিয়া অনুপম শান্তি বিধান দ্বারা উৎসাহ আনন্দে উত্তেজিত করিয়া তুলিবেন। তিনি সস্নেহে হস্ত ধারণ করিয়া অমৃত-পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন।

তাঁহার জ্ঞানশক্তি মহিমা আমারদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার এই অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব আমারদের চিত্তক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত করিয়া দেওয়াই তাঁহার অতুলন স্নেহ প্রেম ও শান্তিবর্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমারদের আত্মাকে তাঁহাতে চিরানুরক্ত করিয়া রাখাই, তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম পরিবেশনের একমাত্র তাৎপর্য্য। পিতা মাতা যেমন সুন্দর সুচিত্র পদার্থ সকল

দেখাইয়া সন্তানকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন, ঈশ্বর তেমনি সম্বৎসর কাল সময়ভেদ ঋতুভেদে তাঁহার এই বসুন্ধরাকে দিব্যসাজে সজ্জিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার বিচিত্র রচনা বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই। তিনি ঋতুভেদে বিবিধ ফলমূল শস্য, বিভিন্ন সুখ সামগ্রী প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা তাহা উপভোগ করিয়া সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার প্রেমে অনুরক্ত হই। কালভেদে অবস্থাভেদে অকৃত্রিম স্নেহ প্রেম প্রকাশ করিয়া আমারদিগকে কতশত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, যে আমরা তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত ও পদানত হই। তিনি পর্য্যায়ক্রমে কত জ্ঞান ধর্ম্ম, শান্তি মঙ্গল বিতরণ করিয়াছেন, যে আমরা তাহা সম্ভোগ করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তমনা যুক্তআত্মা হইয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হই। কতবার মোহ-কোলাহলে অজ্ঞান-তিমিরে আমারদিগকে দিশাহারা দেখিয়া তিনি হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছেন, যে আমরা তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্মপথে ধাবিত হই। তিনি যখন বিনা প্রার্থনায় প্রতিনিয়তই আমারদিগকে তাঁহার সহচর অনুচর হইবার জন্য এত স্নেহ প্রেম, করুণা কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি কি আমারদিগকে উদ্ধার করিবেন না? ক্ষুধাতুর হইয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে তিনি কি আমারদের প্রেমক্ষুধা শান্তি করিবেন না? গ্লানিদগ্ধ আত্মা লইয়া তাঁহার সন্নিধানে ক্রন্দন করিলে তিনি কি একবিন্দু অমৃত বর্ষণ করিয়া আত্মার জীবনদান করিবেন না? সেই দীন-বৎসল পতিতপাবন এক ব্রহ্ম, পাপীকে পাপমুক্ত করিবার জন্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত তাঁহার শান্তিপ্রদ শীতল ক্রোড় সর্ব্বদাই প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

তাঁহার সংসারের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখ, যে তাঁহার জীবরাজ্য পালন ও রক্ষণের জন্য সর্ব্বদাই তুল্য বিধান বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য যেমন সর্ব্বত্রই অন্নপান রক্ষিত হইয়াছে তেমনি ভোজন পানের ব্যভিচার নিবন্ধন রোগ নিবারণ ও স্বাস্থ্য সাধনের নিমিত্ত সকল স্থানেই অসংখ্য ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋতুভেদে স্থানভেদে যেমন নানা ফল শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বত্র ভৈষজ্য তরুলতা-গুল্ম জন্ম গ্রহণ করিয়া আমারদের প্রাণরক্ষা করিতেছে। জড়জগৎ ও উদ্ভিদরাজ্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন আহার্য্য দ্রব্যাপেক্ষা ভৈষজ্য দ্রব্যের সংখ্যা অধিকতর। যেমন তিনি এই অচির অস্থায়ী জীব-শরীর রক্ষার জন্য অনুপম কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন তেমনি তিনি তাঁহার স্নেহের ধন জীবাত্মার পালন ও রক্ষণের নিমিত্ত অনির্ব্বচনীয় স্নেহ করুণা শান্তি মঙ্গল প্রতিনিয়তই বর্ষণ করিতেছেন। অতএব হে ভয়চকিত দুর্ব্বল মানব সকল! আইস আমরা সকলে তাঁর করুণা প্রতীতি করিয়া—তাঁর প্রেম নিরীক্ষণ করিয়া সন্তাপাক্ত মোচন করি! তাঁহার রক্ষণ ও পালন-শক্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হই। ঋতুভেদে যেমন তাঁহার স্নেহ প্রেম নবতর বেশ ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তেমনি অবস্থাভেদে, ঘটনাভেদে তাঁহার প্রীতি কল্যাণতর রূপে অবতীর্ণ হইয়া আমারদের আত্মাকে তাঁহার প্রতি অগ্রসর করিয়া দেয়। আমারদের ভগ্ন বিষণ্ণ আত্মাতে আশা আনন্দের সঞ্চার করে। আজ এই বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার আ-

বির্ভাব জাজ্বল্যতর রূপে সকলে সন্দর্শন কর, আজ তাঁহার অভয় মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সকলে ভয়তাপ হইতে বিমুক্ত হও। তাঁহার সস্নেহ মধুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া সাধু অসাধু সকলে তাঁহার প্রতি অগ্রসর হও। তিনি পুণ্যাত্মাকে আপনার শান্তিপ্রদ শীতল ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া—আপনার প্রেমমুখ দেখাইয়া পুরস্কৃত করিবেন, পাপীতাপীর সন্তাপাশ্রু মোচন করিয়া এখনই তাহাকে শান্তিবিধান করিবেন। মঙ্গল মুহূর্ত্ত চলিয়া যায়! সুন্দর অবসর তিরোহিত হয়! আইস সকলে বিনীত ভাবে তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করি।

মঙ্গলময় অখিল বিধাতঃ! আমরা সকলে তোমার স্নেহ-প্রেমের এমনি অপব্যবহার করিয়াছি—তোমার অমৃতময় আদেশ উপদেশ সকলের প্রতি এমনি অবহেলা করিয়াছি, যে তোমার প্রতি অগ্রসর হইতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে—শোক তাপে আত্মা বিকল হইয়া পড়িতেছে! কিন্তু ঘোর মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে যেমন এক একবার বিদ্যুৎ বিকাসিত হইয়া পথহারা পথিককে গম্যপথ প্রদর্শন করে; তেমনি আমারদের মোহমেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে তোমার করুণা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া আত্মাকে তোমার অমৃত ক্রোড় দেখাইয়া দিতেছে! আমরা সেই জন্যই তোমার সন্নিহিত হইতে সাহসী হইতেছি। নাথ! রাজা ভিন্ন বিদ্রোহি প্রজাকে আর কে অভয় দান করিতে পারে, মাতা ভিন্ন কে আর রুগ্ন ভগ্ন সন্তানকে সস্নেহে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তুমি ভিন্ন পাপা তাপীকে কে আর মুক্তিদান করিতে পারে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের বিকৃত আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর। তুমি আমারদিগকে হৃদয়গ্রন্থি ও সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার চিরসেবায় নিযুক্ত কর। হে দুর্ব্বলের বল অগতির গতি! আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না—আমারদিগকে বিনাশ করিও না। যদ্ভদ্রম্ তন্ন আসুব যাহা ভদ্র যাহা কল্যাণ, তাহাই আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসনায় বিবৃত)

১ বৈশাখ, ১৮০০ শক।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ঊষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসর অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইল; এক্ষণে নূতন বৎসর সমাগত। বৎসরের বিবর্ত্তন আমাদিগকে কালের আশ্চর্য্য প্রভাব ও ধর্ম্মসাধনের কর্ত্তব্যতা স্মরণ করিয়া দিতেছে।

কালপ্রভাবে জগতে যে সকল বিশাল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিতে গেলে মন বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হয়। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দ্যুলোকের মানচিত্রে নক্ষত্র ও গ্রহগণের যেরূপ সংস্থিতি ছিল এক্ষণে ঠিক সেরূপ নাই। পুরাতন নক্ষত্র সকল বিলুপ্ত হইয়াছে ও নূতন নক্ষত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য সৌর জগতের গ্রহ সকলের পিতা স্বরূপ। জ্যোতির্বেত্তারা নিরূপণ করিয়াছেন সৌরজগতের এক একটি গ্রহ সূর্যবক্ষে উৎপন্ন হইয়া—তাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে এবং প্রচ্যুত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর উপরে সংঘটিত বিশাল পরিবর্ত্তনের কথা বলেন। পৃথিবী যে সকল স্তরে বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এক একটী স্তর পড়িবার সময় বিশাল পরিবর্ত্তন সকল ঘটিয়া গিয়াছে। সে সময়ে মহাপ্লাবন

ঘটিয়া অসংখ্য জীবশ্রেণী নষ্ট করিয়াছিল ও পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে পর্ব্বত হইয়াছে, যেখানে পর্ব্বত ছিল সেখানে সমুদ্র হইয়াছে। যে কালের হস্তে গ্রহ নক্ষত্র সকল ক্রীড়াবর্ত্তুল সে কালের নিকট মনুষ্য কোথায় আছে? পূর্ব্বকালে কত রাজ্য সাম্রাজ্য পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। এসিরিয়া, বেবিলন, রূম কোথায়? "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ কগতোত্তরকোশলা।" যদুপতির মথুরাপুরী কোথায়, আর্য্য-কুল-সূর্য্য রামের অযোধ্যাই বা কোথায়? পূর্ব্বকালে কত গৌরবশালী ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা ধন মান যশে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে তখনকার শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তখনকার লোকে মনে কখিত যে ইহাঁদিগের যশ কি কখন বিলুপ্ত হইবে? কিন্তু তাঁহাদিগের যশও বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়াছে। আমাদিগের জীবদ্দশাতেই কতলোককে কাল-কবলে পতিত হইতে দেখিলাম। তাঁহাদিগের মুখশ্রী এক্ষণে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় স্মৃতিক্ষেত্রে অনুভূত হইতেছে। তাঁহাদিগের জীবদ্দশাতে তাঁহাদিগের বন্ধুগণ মনে করিতেন যে ইহাঁদিগের মৃত্যুর পর লোকে ইহাঁদিগকে কখন ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে শীঘ্রই ভুলিয়া গেল। "শব হবে সব যাবে কিছু দিন নাম রবে।" কোন ব্যক্তির মৃত্যু জগতের আনন্দের ব্যাঘাত দেয় না। তাঁহার জীবদ্দশাতে সূর্য্য যেমন প্রতিদিন প্রফুল্লরূপে উদিত হইত, বিহঙ্গগণ যেরূপ প্রফুল্ল চিত্তে গান করিত ও মনুষ্যগণ আহ্লাদ আমোদে যেরূপ উৎসাহের সহিত নিমগ্ন হইত, তাঁহার মৃত্যুর পরেও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদিগের জীবদ্দশায় সূর্য্য যেরূপ প্রফুল্লরূপে উদিত হইতেছে, বিহঙ্গগণ যেরূপ প্রফুল্ল চিত্তে গান করিতেছে, এবং মনুষ্যগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত আহ্লাদ আমোদে নিমগ্ন হইতেছে, আমাদিগের মৃত্যুর পরেও সেইরূপ হইবে। মনুষ্য কাল-সমুদ্র হইতে বুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইতেছে ও বুদ্বুদের ন্যায় তাহাতে বিলীন হইতেছে। যে কালের হস্তে গ্রহ নক্ষত্র সকল ক্রীড়াবর্ত্তুল, মনুষ্য কে যে সে তাহাকে সম্মান করিবে? আমরা কাল-সমুদ্রকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করি কিন্তু সে আমাদিগকে আদৌরেই মানে না, তৃণের ন্যায় আমাদিগকে তাহার অনন্ত বক্ষে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

সকলেই কালের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন কিন্তু একজন কেবল তাহার অধীন নহেন। তিনি অকাল পুরুষ, কাল তাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে তিনি বিরাজমান ছিলেন; সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সদাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তথাপি তিনি বিরাজমান থাকিবেন। তাঁহার শরীরের উপর বলিপলিত পতিত হয় না, তাঁহার কেশ শুক্ল হয় না, তিনি চিরযৌবনান্বিত। তিনি যেমন যৌবনান্বিত তেমনি প্রাচীন। তিনি পুরাণ। "বিচিত্রশক্তিং পুরুষং পুরাণং।" তিনি "অতি প্রবীণ, সারবান।" তিনি কাল-সমুদ্রের তটে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, কাল-সমুদ্র তাঁহার পদের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সে তাহা স্পর্শ করিতে সাহস করে না। এক্ষণে তোমরা সেই অকাল পুরুষের জয় উচ্চারণ কর।

বৎসরের বিবর্ত্তন আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতার বিষয় স্মরণ করিয়া দিতেছে। আমরা কবে মৃত্যুজন্য প্রস্তুত হইব?

আজ নয় কাল, এইরূপ করিয়া আমরা আত্ম বঞ্চনা করিতেছি। সাবধান সংসাররূপ পান্থ-নিবাসে নিদ্রিত হইও না তাহা হইলে দুর্গতিরূপ তস্কর তোমাকে আক্রমণ করিবে। যাঁহার অমূল্য জীবনের চল্লিশ বৎসর গত হইয়াছে এখনও তাঁহার বালস্বভাব অপগত হয় নাই। যাঁহার পঞ্চাশ বৎসর গত হইয়াছে, তিনি অদ্যাপি নিদ্রিত, যদি অবশিষ্ট পাঁচটা দিন উত্তমরূপে যাপন করেন তাহা হইলেও অনেক হইতে পারে। বৎসরের বিবর্ত্তন যেন আমাদিগের ধর্ম্মোন্নতি দর্শন করে। যদি বৎসর বৎসর আমরা ধর্ম্মপথে আরও অগ্রসর না হই তবে আর কি হইল?

হে পরমাত্মন্! বৎসরের প্রারম্ভে তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি, আমাদিগের প্রণাম গ্রহণ কর। পুত্র যেমন ভক্তিভাজন বৃদ্ধ পিতাকে প্রণাম করিয়া কোন বৃহৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, আমরা তেমনি তোমাকে প্রণাম করিয়া নূতন বৎসরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। নূতন বৎসরের ঘটনা সকল ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। আমরা কম্পিত চিত্তে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। হে করুণাময়! যদ্যপি মঙ্গল ঘটনা সকল ঘটে তাহা হইলে তোমার গুণ গান করিব; যদ্যপি অমঙ্গল ঘটনা সকল ঘটে তথাপি তোমার গুণ গান করিব। কেবল তোমার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা যে অমঙ্গল ঘটনা সকল সহ্য করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মবল আমাদিগের মনে প্রেরণ কর। হে পিতঃ! দুর্ভাগা ভারত দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, অন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছে, তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে আর্ত্তনাদ গগনে উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহার অনন্ত দুরবস্থা তাহাকে উদ্ধার কর। যে সকল নরনারী অদ্য তোমার গুণগান শ্রবণ করিলেন তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর কর। এই সাধু পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তি বিস্তার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নির্ব্বাণ।*

সম্প্রতি বিলাতের "Society for the Promotion and Diffusion of christian Knowledge." নামক ধর্ম্ম-সমাজ হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম-বিষয়ে বহু সম্বাদ-পূর্ণ পাণ্ডিত্যসূচক তিন খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদিগের এই প্রস্তাবের সমালোচ্য বিষয় ডবলিউ, রিস্ ডেবিড্স্ প্রণীত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ। ডেবিড্স্ সাহেব অনেক দিন অবধি সিংহল-দ্বীপে বারিষ্টারি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় তথাকার যাত্রাগ্নল্লে উন্নান্সে নামক সুপণ্ডিত ও মহানুভাব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট শিক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের জানিবার বিষয় এমন কিছুই নাই যাহা ডেবিড্স্ সাহেবের গ্রন্থে সংক্ষেপরূপে বিবৃত না হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের মত বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় সচরাচর ঐ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ সকলে দেখা যায় তাহা হইতে ডেবিড্স্ সাহেব কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল স্থলে তিনি ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "নির্ব্বাণ" একটি। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই মূল মতে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। পাঠকবর্গ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন যে ডেবিড্স্ সাহেব দ্বারা উদ্ধৃত বৌদ্ধ

* Buddhism by T. W. Rhys Davids Barrister at Law, London. 1878.

ধর্ম্মের গ্রন্থ সমূহে নির্ব্বাণের যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের মুক্তি বিষয়ে বিশেষতঃ জীবন্মুক্তি বিষয়ে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। এইরূপ সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে হেতু বৌদ্ধ ধর্ম্মের দর্শনভাগ আমাদিগের বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্র হইতে নীত। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নির্ব্বাণ বলিলে আত্মার বিনাশ বুঝায় না। এই তত্ত্বের আভাস পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমুলর প্রথমে প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু ডেবিড্স সাহেব ঐ তত্ত্বের যেরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন তাহা ভট্ট মোক্ষমুলরের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

নির্ব্বাণ বৌদ্ধ-জীবনের চরম লক্ষ্য; নির্ব্বাণ বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বোন্নত অবস্থা। সাধারণতঃ লোকে নির্ব্বাণ শব্দ শরীর ও আত্মার বিনাশ এই অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে নির্ব্বাণ শব্দের এই অর্থ তাহার প্রকৃত অর্থ নহে। নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ মনুষ্যের অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলের ও পাপ-প্রকৃতির বিনাশ। পাপশূন্য অতএব দুঃখ শোক তাপশূন্য মনের শান্তির অবস্থাই নির্ব্বাণের অবস্থা। যাঁহার মন পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া শোক দুঃখ পরিতাপশূন্য হইয়াছে এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছে তাঁহারই মন নির্ব্বাণের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পাপ-জীবন অর্থাৎ দুঃখক্লেশময় জীবনের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-জীবন অর্থাৎ আনন্দময় জীবনের প্রাপ্তি, ইহাই নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলীর মধ্যে এমন অনেক স্থলে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যেখানে উহার শরীর ও আত্মার বিনাশ এই অর্থ হইতে পারে না। "বুদ্ধবংশ" নামক পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে নির্ব্বাণের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, "নির্ব্বাণ কাম, মায়া ও ঘৃণা এই তিনের বিপরীত বস্তু।" বর্নুফ (Burnouf) বলেন যে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহে নির্ব্বাণ শব্দ "শোক হইতে পূর্ণ-নিষ্কৃতি" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিল (Beal) তাঁহার প্রণীত "চীন দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে চীন দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা নির্ব্বাণের অর্থ এইরূপ করিয়া থাকেন, "নির্ব্বাণ শোক দুঃখ হইতে মুক্তির অবস্থা। নির্ব্বাণ-অবস্থা কোন শোক দুঃখের মধ্যে থাকিতে পারে না এবং শোক দুঃখের মধ্যে নির্ব্বাণ অবস্থা হইতে পারে না।" "ললিত বিস্তর" নামক বুদ্ধ দেবের জীবন-বৃত্তান্তে এমন অনেক স্থলে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, সেই সেই স্থলে শরীর ও আত্মার বিনাশ এই অর্থ করিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। পালি-ভাষায় লিখিত "ধম্মপদ" নামক বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থে যে যে স্থলে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সেই সেই স্থলে যদ্যপি আমরা ঐ শব্দের বিনাশ অর্থ করি তাহা হইলে সেই সেই স্থল প্রকৃতরূপে বোধগম্য হয় না। "নির্ব্বাণ" বিষয়ে উক্ত "ধম্মপদ" নামক গ্রন্থ হইতে আমরা কতকগুলি শ্লোক নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ঐ গুলি পাঠ করিলে পাঠকবর্গের প্রতীতি হইবে যে নির্ব্বাণের অর্থ শরীর ও আত্মার বিনাশ নহে, কিন্তু উহা পাপ-জীবনের বিনাশ ও ধর্ম্ম-জীবন লাভ।

"যখন তুমি তোমার রিপু সকলকে তোমা হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিবে তখন তুমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।"

"যদ্যপি তুমি অন্যের, পদতলে দলিত

হইয়া বিরক্তি-প্রকাশক সামান্য শব্দটি পর্য্যন্ত না করিয়া থাক, যদি তুমি ক্রোধ রিপুকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছ।”

“জ্ঞানীগণ এবং চিন্তাশীল, যোগী, সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বোচ্চ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।”

“যে সন্ন্যাসী পরিশ্রমে আনন্দিত থাকেন এবং আলস্যের প্রতি সতত ভয়ের সহিত দৃষ্টিপাত করেন তাঁহার কখন পতন হয় না। তিনি নির্ব্বাণ অবস্থার সম্মুখে দণ্ডায়মান।”

“কামের ন্যায় অগ্নি নাই। ঘৃণার ন্যায় পাপ নাই, স্কন্ধসমূহের* ন্যায় কষ্ট নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই। তৃষ্ণাই সকল রোগের পরাকাষ্ঠা ও স্কন্ধসমূহ সকল কষ্টের পরাকাষ্ঠা। সকল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি জানাই নির্ব্বাণরূপ উচ্চ অবস্থা।”

“হে সন্ন্যাসি! এই জীবন রূপ দুর্ব্বল তরণীর জল (রিপুচয়) ছেঁচিয়া ফেল, তাহা হইলে ইহা শীঘ্র উদ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে সক্ষম হইবে। যখন তুমি কামাদি রিপু সকলের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে তখন তুমি নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বোচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।”

“জ্ঞান ব্যতিরেকে ধ্যান হইতে পারে না, এবং ধ্যান ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধ্যানপরায়ণ, তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

(ধর্ম্মপদ)

“পরিমিতাচারী ও পবিত্র হওয়া, সকল সত্যের জ্ঞান লাভ করা এবং নির্ব্বাণ উপভোগ করাই সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ।”

(মঙ্গল সুত্ত, ১১ শ্লোক)

“দয়াদাক্ষিণ্য এবং জিতেন্দ্রিয়তা দ্বারা সকল পার্থিব গৌরব, সকল স্বর্গীয় আনন্দ এবং নির্ব্বাণরূপ সুখের অবস্থা লাভ করা যায়।”

(নিধিকাণ্ড সুত্ত, ১১ শ্লোক)

নিষেধবাদ।

আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব সংখ্যায় ঈশ্বরের আদেশের বিষয় বলিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার নিষেধের বিষয় বলিব। ব্রাহ্মেরা কেবল ঈশ্বরের আদেশ লইয়া আন্দোলন করেন কিন্তু তাঁহারা প্রণিধান করেন না যে ঈশ্বর যেমন আদেশ করেন, তেমনি নিষেধও করেন।

যখন মনুষ্য কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত হয় তখন তাঁহার হৃদয়স্থিত সেই পুণ্যপাপেক্ষিতা পুরুষ তাঁহাকে সেই কুকর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন। যে সে নিষেধবাক্য শ্রবণ না করে সে দুর্গতির পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। সে সেই মহদ্ভয় উদ্যত-বজ্র পুরুষের বজ্র দ্বারা আহত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হয়। যাহারা কুকর্ম্মে অভ্যস্ত হয় নাই তাহারা এই নিষেধবাণী স্পষ্টরূপে শুনিতে সক্ষম হয়। কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার বাল্যাবস্থায় যখন তিনি একটী পল্বলতীরে শয়ান রৌদ্রসেবনকারী বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত একটী কচ্ছপের প্রতি বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতা বশত প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন কে যেন তাঁহার পশ্চাৎ ভাগ হইতে বলিল “কচ্ছপকে মারিও না।” কে এ কথা বলিল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি পশ্চাদ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি মাতৃসমীপে এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

---

* বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে স্কন্ধ শব্দের অর্থ ভয়, লজ্জা, নির্লজ্জতা, সন্দেহ, ঘৃণা, অজ্ঞান, হিংসা, মায়া, বিলাসপরায়ণতা, অহংকার, গৌরব, স্বার্থপরতা, পরের আনন্দে শোক প্রকাশ ও পরের শোকে আনন্দ প্রকাশ প্রভৃতি মনুষ্যের দোষ ও পাপ সকল।

করিলেন যে কে তাঁহাকে নিষেধ করিল? তাঁহার মাতা তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "যিনি তোমাকে নিষেধ করিয়াছেন তাঁহার কথা যাবজ্জীবন পালন করিবে তাহা হইলে তোমাকে কখন ক্লেশ পাইতে হইবে না, লোকে ঐ নিষেধকারীকে বিবেক বলে কিন্তু আমি বলি তাহা ঈশ্বর।" মনুষ্য যত কুকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকে ততই ঈশ্বরের নিষেধবাণী অস্পষ্টরূপে শুনিতে পায়। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে এই বাণী ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আইসে। মনুষ্য কুকর্ম্মে অভ্যস্ত হইলেও ঈশ্বর তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। সে তাহার সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ-কোলাহলে নিমগ্ন হইয়াও হঠাৎ এক এক বার সেই বাণী শুনিয়া চমকিত

ঈশ্বর মনুষ্যের গুরু ও পথ-প্রদর্শক। যে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে সে রিপু ও মোহ নিবারণ পূর্ব্বক মনকে প্রশান্ত করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলে তাহা শুনিতে সক্ষম হয়। প্রধান প্রধান ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা হৃদয়স্থিত সেই পুণ্যপাপেক্ষিতা পুরুষের বাক্য দ্বারা আপনাদিগের জীবন নিয়মিত করেন। সঙ্কট কালে কিরূপে চলিতে হইবে তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নিকট হইতে উত্তর প্রাপ্ত হয়েন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেই স্থান হইতে যাহা শুনিতে পান তাহা তাঁহার পথের প্রদীপ-স্বরূপ হয়; সহস্র বিপদ তাঁহাকে সেই আলোক-প্রদর্শিত পথে গমনে বিরত করিতে পারে না। ভৌতিক জগতের তত্ত্ব সকল যেমন পরীক্ষা-সিদ্ধ আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব সকল তেমনি পরীক্ষা-সিদ্ধ। সকল দেশে সকল কালে ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা নিজ নিজ পরীক্ষা দ্বারা অনুভব করিয়াছেন যে, ঈশ্বর আদেশ ও নিষেধ করেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে ভ্রান্তি বশত কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি যাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মনে করিতেছেন বস্তুত তাহা আদেশ নহে, তাহা তাঁহার নিষেধ। হয় ত রিপুগণ আদেশ করিতেছে, তিনি মনে করিতেছেন ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন। হয় ত অসুরেরা আদেশ করিতেছে, তিনি মনে করিতেছেন দেবতারা আদেশ করিতেছেন। মোহাক্রান্ত হইয়া ক্রোধ লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির এইরূপ আদেশ শুনিয়া কার্য্য করিলে তাঁহাকে পশ্চাৎ আত্মগ্লানি ও লোকাপবাদ ভোগ করিতে হয়।

আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব-সংখ্যায় রিপুদমন ও পরোপকার বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহাতে এই কথা লিখিত আছে যে এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে রিপুদমনের প্রতি মনোযোগের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ঈশ্বরের নিষেধ বাক্যের প্রতি ব্রাহ্মদিগের অধিকতর মনোযোগ হওয়া উচিত। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের "আদেশ, আদেশ" করিয়া ব্যস্ত না হইয়া "নিষেধ, নিষেধ" করিয়া ব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশীয় অথবা বিজাতীয় ধর্ম্ম নহে। "ব্রাহ্ম" শব্দটিই প্রমাণ করিতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশীয় অথবা বিজাতীয় ধর্ম্ম নহে। ঋগ্বেদের কাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে। কোন কোন ঋকে বরুণ কিম্বা ইন্দ্র কিম্বা অগ্নিকে যে সকল লক্ষণ অর্পিত হইয়াছে তাহা কেবল সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত

হইতে পারে; অপর দেবতার প্রতি কখনই প্রযুজ্য হইতে পারে না। ঋগ্বেদের অনেক স্থল পাঠ করিলে এইরূপ বোধ হয় যে ঋষিরা সেই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব করিয়াছেন। ঋগ্বেদে এমন সকল শ্লোক আছে যাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা এক পদার্থকেই অগ্নি, যম, বায়ু প্রভৃতি বিবিধ দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" একটী ঋক্। কিন্তু গড়ে ধরিতে গেলে উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের ভাব উজ্জ্বল পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত আছে তেমন ঋগ্বেদে প্রকাশিত নাই। উপনিষদের কালের পর ব্রহ্মের এক একটি লক্ষণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতারূপে কল্পিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে আবার ঈশ্বর রূপে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষের উপাসনা সম্মিলিত হইল। কিন্তু যাহারা বিষ্ণু, শিব, শক্তি, রাম, কৃষ্ণকে উপাসনা করে তাহারা ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি পরব্রহ্ম নাম অর্পণ করে এবং পরব্রহ্ম রূপেই উপাসনা করিয়া থাকে। শঙ্কর, কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি ভারতবর্ষের ধর্ম্মসংস্কারকেরা অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষে চিরকাল বিদ্যমান আছে; বর্ত্তমান সময়ে কেবল উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতভূমির স্বভাবজাত বৃক্ষ। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কিয়ৎ পরিমাণে বিদেশীয় সার তাহার মূলে নিয়োজিত হইয়াছে, তথাপি উহা বহুল পরিমাণে ভারতীয় উপাদান-পুঞ্জে বিনির্ম্মিত তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। ঈশ্বরের নিরাকারত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের মত যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ তাহা আমরা কোরাণ কিম্বা বাইবেল হইতে লাভ করি নাই, তাহা আমাদিগের মূলশাস্ত্র উপনিষদ হইতেই লাভ করিয়াছি। যোগের ভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটি প্রধান উপাদান, তাহা আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতেই আহরণ করিয়াছি। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম-পুস্তক হিন্দুশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। আমাদিগের উপাসনা-প্রকরণ হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকে পরিপূর্ণ। আমাদিগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দেশের প্রাচীন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি হইতে আহৃত। এই সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার মাত্র। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিদেশীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিপন্ন করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশীয় ধর্ম্মের প্রতি অকৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় যেন কখন আচরণ না করি।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ এই প্রভাব ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রচার আরম্ভ হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব-ক্ষীণতার কারণ এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম বেদ এবং ঈশ্বর মানিত না। ভারতের সর্ব্বত্রই বেদের এতদূর সম্মান এবং এতদূর আদর, যে সাংখ্যদর্শনকার কপিলঋষি বেদের নিত্যতা এবং প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যদি বেদের দোহাই দিয়া নিজ মত প্রচার করিতেন এবং ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম কখন ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইত না। কেবল ঈশ্বর এবং বেদের নাম করিয়া তিনি অক্লেশেই স্বমত প্রচার করিতে পারিতেন

আর বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসকদিগের নিয়ম-সকল অতিশয় কঠোর ছিল বলিয়া সকলে তদনুসারে চলিতে পারিত না। আর বৌদ্ধধর্ম্মের জাঁকজমক এবং লোকচিত্তাকর্ষক আড়ম্বর কিছুই ছিল না। আর বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, ভ্রষ্টচরিত এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ইত্যাদি নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইলে পর ব্রাহ্মণেরা পুরাণ প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কথকতা দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম সমাজে বোধগম্য করাইতে লাগিল এবং সকলেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। কথকেরা নিজ বাগ্মিতার দ্বারা লোকের মনোহরণ করিতে লাগিলেন। লোকে বুঝিতে পারিল যে, যে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বকার্য্যেই ঈশ্বরের নাম করা হয়, যথা—

"ঔষধে চিন্তয়েৎবিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনং। শয়নে পদ্মনাভং চ বিবাহে চ প্রজাপতিং। যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং। নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং। কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং জলমধ্যে বরাহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥"

সে হিন্দুধর্ম্ম অবশ্য শ্রেষ্ঠ এবং গ্রহণীয়। এবম্প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার প্রচার হইল তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিকৃত ভাব, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। বেদবোধিত, সত্যজ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা পরস্পর রাগাদিগ্রস্থ এবং সত্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বৈদিকাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মার্গগামী হইল। সুতরাং সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। এই সামাজিক অবস্থা আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে দ্বিতীয় প্রকরণে উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত আছে, আমরা সেই কবিতাগুলির পদ্যে অনুবাদ নিম্নে নিবেশিত করিতেছি। যাঁহারা মূল সংস্কৃত দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১৭৮৯ শকের আসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত শঙ্করবিজয়ের ৩ ও ৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পারেন।

কেহ পূজা করে শম্ভু, কেহ পূজে হরি।
কেহ অর্চ্চে বাণী, কেহ নানাচিহ্নধারী।
কোন জন পূজে বহ্নি, কেহ দিবাকর।
কেহ বা গণেশদেব, কেহ শক্তিপর।
কেহ বা ভৈরব সেবে, কেহ বিশ্বক্সেন।
মল্লারি কেহবা পূজে, কেহ বা মদন।
কেহ ইন্দ্র, কেহ যম, কেহ সরিৎপতি।
উদক, অম্বর, বায়ু, মহী আদিমূর্ত্তি।
কেহ পূজে অর্থপতি, কেহ বা ব্রহ্মারে।
যথেচ্ছায় গুণত্রয় অর্চ্চনা বা করে।
সাংখ্যমতে কেহ বা প্রকৃতিপরায়ণ।
কর্ম্মশীল অণু মান্য করে কোন জন।
কেহ সোম, কেহ কুজ, কেহ সোমসুত।
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নানা মতযুত।
কেহ সেবে কালদেব, কেহ পিতৃগণ।
অনন্ত, গরুড়, কেহ সিদ্ধ অগণন।
কেহ বা গন্ধর্ব্ব ভজে, কেহ সাধ্যগণ।
পূজে ভূত, কিম্বা করে বেতাল অর্চ্চন।

এইরূপ নানাবিধ লোকেরা যথেচ্ছাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ নিজের বৃত্তিকে বেদার্থ-প্রতিপাদ্য বলিত, কেহ বা ধর্ম্মের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় এই জল্পনা করিত। এতদ্ব্যতীত তাহারা মৎসরতা, জয়েচ্ছা, এবং নিজেচ্ছাকৃত লিঙ্গ, ত্রিশূল, ডমরু, শঙ্খ প্রভৃতি বিবিধ চিহ্নধারণ অবশ্য, কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। আর তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্রের উক্তি সকল অগ্রাহ্য করিত। বস্তুতঃ, সমাজের ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এবম্বিধ সমাজ-বিপ্লবের সময় এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক। এ

বিপ্লব দমন না করিলে সমাজ একবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং শিথিল-বন্ধন হইয়া যাইবে। ভারতের এবম্বিধ অবস্থায় শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই আনন্দ-গিরি তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আনন্দগিরি-লিখিত আচার্য্যের অবতার প্রয়োজন এই;—নরাধম মনুষ্য-দিগকে সদাচার ভ্রষ্ট দেখিয়া নারদ ঋষি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করি-লেন হে তাত! জগতের এই শোচনীয় অবস্থা কি আপনি দেখিতেছেন না, জগতের যাহাতে বিনাশ না হয় তাহার উপায় বিধান করুন। ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া স্বগণ সমভি-ব্যাহারে শিবলোকে প্রবেশ করিলেন এবং মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে ভূ-লোকে ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, লোকে বৈদিক আচার ত্যাগ করিয়া মিথ্যা-চার আশ্রয় করিয়াছে, বিপ্রপ্রভৃতিরা বিচিত্র চিহ্ন দ্বারা দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে, যথা-কালে অগ্নিতে হোম করে না, পর্ব্বতিথিতে পিত্রাদির তৃপ্তির নিমিত্ত কব্য প্রদান করে না, সত্য লোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদপাঠ করে না, ইত্যাদি প্রকারে সর্ব্বসৎকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কা-পালিকাচারী, কেহ বা মদ্যমাংসাশী হই-য়াছে। সকলেই সত্যশৌচাদি ধর্ম্ম্য-কর্ম্ম-স্নান-রহিত পশুর ন্যায় কুপথে গমন করি-তেছে এবং কুমত অবলম্বন করিতেছে। অতএব আপনি বেদমার্গ উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা করুন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই প্র-কারে সম্বোধিত হইয়া শিব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বলোকে প্রতি-প্রয়াণ করুন, আমি জগতের রক্ষার নিমিত্ত এবং বেদমার্গ উদ্ধার করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য নামে অবতীর্ণ হইব।

অনন্তর চিদম্বরপুরে আকাশলিঙ্গ নামে এক শিব আবির্ভূত হইলেন। সেই স্থানের মহেন্দ্র বংশে উৎপন্ন সর্ব্বজ্ঞ নামে জনৈক দ্বিজ চিদম্বরেশ্বরের ভক্ত উপাসক হইলেন। সর্ব্বজ্ঞের সুলক্ষণবিশিষ্ট কামাক্ষী নামে পত্নী ছিল। চিদম্বরেশ্বরের প্রসাদে এই দ্বিজদম্পতী বিশিষ্টা নামে গুণবতী কন্যা লাভ করিলেন। আশ্চর্য্যকর্ম্মা শান্তশীল বিশ্বজিৎ নামে বিপ্র বিশিষ্টার পাণি গ্রহণ করিলেন। বিশিষ্টা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে শিবের আরাধনা করিতেন, কিন্তু তত্রাপি তাঁহার পতি বিশ্বজিৎ অরণ্যে তপস্যা করি-বার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তদবধি সেই পতিব্রতা কামিনী এক মনে চিদম্বর মহেশ্বরের পূজন, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। একদা চিদম্বরেশ্বর স্বমন্দিরে সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে বিশিষ্টার বদন-সরোজে জ্যোতিরাকারে প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা সন্দ-র্শনে সমবেত জনবর্গ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। মহোগ্রতেজঃ প্রবেশ হেতু বিশিষ্টার গর্ভ অনুদিন উপচিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্বিজগণ তৃতীয়াদি মাসে বেদোক্ত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিলেন। এই প্রকারে দশমাশ অতীত হইলে পর যথাসময়ে বিশিষ্টার গোলাকার গর্ভ হইতে শঙ্করাচার্য্য নামে মহাদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার জন্ম-ক্ষণে স্বর্গ হইতে আনন্দ-সূচক পুষ্প-বৃষ্টি পতিত এবং দেবদুন্দুভি-নিনাদ সমুত্থিত হইল! এস্থলে বলা আবশ্যক যে শঙ্ক-রাচার্য্যের জন্ম বিষয়ে একটি আশ্চর্য্য প্র-বাদ চলিত আছে। শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিধবা ছিলেন। তিনি শিবের মন্দিরে সর্ব্বদা পূজা করিতে যাইতেন। সেই শিবের নিকট তৎস্থানীয় সধবা স্ত্রীলো-কেরা পুত্রকামনা করিয়া ঈপ্সিত ফল লাভ করিত। একদা শঙ্করাচার্য্যের জননী অহ-

স্বার করিয়া বলিলেন, যে মহাদেব কেবল সধবাদিগেরই পুত্র প্রদান করেন, কিন্তু যদি তিনি আমার ন্যায় বিধবার সন্তান প্রদান করিতে পারেন তবে তাঁহার মহত্ত্ব মহত্ত্ব-নামের যোগ্য। এই কথা বলিয়া তিনি স্বালয়ে প্রতিগমন করিলেন। কিছু দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গর্ভ হইয়াছে। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো দুর্দৈব, আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না তথাপি আমার এ কি হইল? আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী আছেন আমি কখন কোন দোস করি নাই, তথাচ আমার কপালে এ কি ঘটিল? * যাহাই হউক এ কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। অতএব আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলে পর তাঁহার পিতা রাত্রিতে আদেশ পাইলেন যে মহাদেব তাঁহার কন্যার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যেন কোন প্রকারে গর্ভ নষ্ট না হয়। তাঁহার পিতা প্রাতঃকালে যথাদেশ কার্য্য করিলেন, এবং কন্যাকে প্রাণ-পরিত্যাগ-বাসনা হইতে বিরত করিলেন। এই গর্ভে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং লোকে তাঁহাকে শিবের অবতার কহে।

তপস্যা ও পুণ্যসঞ্চয়।

শরীর যেমন অন্ন পানে পুষ্ট হয় আত্মা সেইরূপ পুণ্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে, যেমন অন্নপান ব্যতীত শরীর মলিন ও শ্রীহীন হয় সেইরূপ পুণ্য ব্যতীতও আত্মা মলিন ও শ্রীহীন হইয়া থাকে। ঈশ্বর যেমন ভৌতিক রাজ্যকে নিয়মে চালাইতেছেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যকেও সেইরূপ নিয়মে চালাইতেছেন। ফলত পুণ্যই সুখ, কিন্তু অনেকে তাহা বুঝেন না। যিনি কোন রূপ উপাধি-স্পৃহায় লক্ষ লক্ষ লোকের কণ্ঠ-নিঃসৃত রক্তে তরবারি ধৌত করিয়াছেন, যাঁহার প্রত্যেক মুদ্রা অনাথ দীন দরিদ্রের অশ্রুজলে সিক্ত, তাহা অপেক্ষা এক জন কুটীরবাসী পুণ্যবান ব্যক্তির সুখ যে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ অনেকে তাহা বুঝেন না। যে নেপোলিয়ান অলোকসামান্য বীর্য্যে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াছিলেন, যিনি অবিচারে পূর্ব্বরাজবংশীয় এক যুবাপুরুষের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন তাঁহা অপেক্ষা নিস্পৃহ যুধিষ্ঠির হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, অজ্ঞাতবাসে অতি ক্লেশে কাল হরণ করিয়া, যে প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছিলেন অনেকে তাহা বুঝেন না। ফলত পুণ্যই সুখ।

অতি প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষে পুণ্য লাভ জন্য কেহ ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরা হইয়া বৃক্ষে লম্বমান ধূমপান করিত; কেহ একপদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে, তাহার মস্তকের উপর দিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত হইতেছে, তথাচ তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই; কেহ চিরমৌনী; কেহ হুরন্ত শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া আছে; কেহ প্রখর গ্রীষ্মে চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া স্থিরনেত্রে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতেছে; কেহ নিরাহারে বহুকাল বৃক্ষমূলে নিমগ্ন, বল্মীক মৃত্তিকায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অদৃশ্য হইয়াছে, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ধ্যানে নিমগ্ন, হরিণশিশু তাঁহার অঙ্কে উত্থিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আনন্দাশ্রু পান করিতেছে; কেহ পত্রমাত্র ভক্ষণ কেহ বা বায়ু ভক্ষণ করিয়া আছে; কেহ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বাররোধ এবং কেহ বা ইন্দ্রিয়ের মূলোৎপাটন করিয়াছে। এই সকল কার্য্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গুলি কুসংস্কার,

দূষিত। যাঁহারা এই সমস্ত কঠোরতা সাধন করিতেন ঈশ্বরের তৃপ্তিকামনাই যে তাঁহাদের লক্ষ্য তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা সংসারকে অসার জানিয়া পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভের জন্য এইরূপ কষ্টস্বীকার করিতেন ইহা চিন্তা করিলে মন আনন্দে দ্রবীভূত হয়।

ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে জ্ঞানের অবস্থাভেদে তপস্যার ব্যবস্থাভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন মায়াবাদ উত্থিত হইয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল তখন জড়পিণ্ডের অস্তিত্ব জ্ঞানের চক্ষে বিলুপ্ত হয়, তখন আত্মাই সৎ, তদিতর সমস্তই অসৎ। সুতরাং অসৎ দেহে বিশেষ যত্ন আস্থা থাকিবার বিষয় কি? ফলত আদৌ সুখদুঃখের সহিত দেহের কোন সম্বন্ধবোধ ছিল না। লোকে এই মায়া-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া দুর্ব্বিসহ কঠোরতা সহজেই স্বীকার করিত, কিন্তু এখন মায়াবাদ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিয়া একপ্রকার উপেক্ষিত এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ এই যে ঈশ্বরদত্ত সমস্ত ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিবে কিন্তু ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া উপভোগ করিবে। এখন জড়দেহে আর অসৎ বুদ্ধি নাই, সুখ দুঃখে তাহার যে প্রসক্তি আছে তাহাও অনুভূত হইতেছে। ঈশ্বর করুণা করিয়া আমাদিগের হস্তে যে দেহ দিয়াছেন ইহা যত দিন থাকিবে সাবধানে পোষণ করিতে হইবে এখনকার এই বিশ্বাস। সুতরাং তপস্যার পূর্ব্বতন প্রণালী এখন পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

এই পৃথিবী ধর্ম্ম কর্ম্মের ক্ষেত্র, তদ্ব্যতীত পুণ্যের প্রত্যাশা থাকে না। ধর্ম্মের যাবদীয় ব্যবস্থা কেবল পুণ্যেরই জন্য, ভৌতিক নিয়ম যেমন ভূতরাজ্যের নিমিত্ত ধর্ম্মের নিয়মও সেইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যের নিমিত্ত। শরীর যেমন ভূতরাজ্যের প্রজা হইয়া তন্নিষ্ঠ নিয়ম সকল স্বীকার করিতেছে আত্মারও সেইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যের প্রজা হইয়া তন্নিষ্ঠ নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্য অবিবেকী, সে আত্মার অন্তরে ঈশ্বরের স্বহস্ত-লিখিত নিয়ম সকল পাঠ করিতেছে তথাচ তাহা প্রতিপালন করিবার যত্ন ও চেষ্টা করে না, এই জন্য অসুখী হয় এবং আপনাতে মলিনতা সঞ্চয় করে। নিকৃষ্ট সুখের কামনা আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রতিপালনের বিরোধী, ঈশ্বরের সাহায্য ও নিজের পৌরুষ প্রভাবে ঐরূপ দুরপনেয় প্রতিবন্ধক দূর করিয়া তপস্যার পথ পরিস্কার করা অগ্রে কর্ত্তব্য। পুণ্যপথের যাত্রী হইবার জন্য আত্মজয় অগ্রে আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ের দ্বারনিরোধ তপস্যা নয়, কিন্তু ধর্ম্মের অবিরোধে তাহার ভোগই তপস্যা। অনাহারে শরীরশোষণ বা স্বপাকভোজন তপস্যা নয়, অবস্থানুসারে দীন দুঃখীর সহিত শাকান্ন বিভাগ করিয়া আহার করা তপস্যা। ভৌতিক নিয়ম তুচ্ছ করিয়া শীতে জলমজ্জন, গ্রীষ্মে উত্তাপ সেবন তপস্যা নহে, মনোমধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মবিরোধী অসঙ্গত ইচ্ছার উদয় হয় তাহার উচ্ছেদসাধনই তপস্যা। অনাবৃত পদে দীনভাবে ভ্রমণ তপস্যা নয়, কিন্তু অন্যের পদ মান মর্য্যাদায় ক্ষুব্ধ না হওয়াই তপস্যা। এখনও সমাজে নানারূপ কুসংস্কার আছে; একটী স্বামীর মৃত্যু বহুসংখ্য স্ত্রীকে অনাথা করিতেছে, ঘরে ঘরে বাল্য বিবাহ-রোগ লোকের দেহ জীর্ণ শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট করিতেছে, অজ্ঞাত-পতি-মর্য্যাদা বালিকার বৈধব্য হৃদয়বান পিতামাতার মর্ম্মে মর্ম্মে নিরন্তর সূচিবিদ্ধ করিতেছে, এই সমস্ত কুসংস্কারের উপর বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করাই তপস্যা। অসত্যের বিপক্ষে কলুষিত

দেশাচারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করাই তপস্যা। যিনি এই প্রণালীতে তপস্যা করেন তাঁহারই পুণ্যসঞ্চয় হয়।

অর্থ ও যশোলাভের নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা এই পুণ্যসঞ্চয়ের বিরোধী। যিনি অর্থলোভী জগতে তাঁহার অকার্য্য কিছুই নাই, তিনি মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি কতকগুলি অসদ্গুণকে অঙ্গের ভূষণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম তাঁহার বাহ্য আবরণ মাত্র, বিবেক তাঁহার পরম শত্রু; তিনি সময়ে সময়ে এই বিবেকের মস্তক পদতলে দলিত করিয়া অর্থস্পৃহা চরিতার্থ করেন। দ্বিতীয় যশ, যিনি ইহার উপাসক তাঁহার কার্য্য অতি কৌতুকাবহ। তিনি কোন একটী কর্ম্ম করিয়া প্রত্যেকের মুখপানে চাহিয়া আছেন যে কখন তিনি তাহার কার্য্যের প্রশংসাবাদ শুনিতে পাইবেন। তিনি ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতিকূলে নানারূপ কার্য্য করেন কিন্তু তৎসমুদায় একটী অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত রাখিয়া জনসমাজে কোন না কোন সৎকার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হন। মনুষ্য এই অর্থ ও যশের উপাসনাতে আয়ুঃক্ষয় করিতেছে তপস্যা ও পুণ্যসঞ্চয় তাহার কিরূপে হইবে।

জ্ঞানোপদেশ।

(মহাভারত হইতে সংগ্রহ)

জ্ঞানসাধন দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিলে মোক্ষলাভ হয়। তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। প্রমাণের বিষয় সৎ বস্তু ও নিষেধের বিষয় অসৎ বস্তু, তিনি এ উভয়ের অতিরিক্ত। তাঁহার হস্ত চরণ চক্ষু কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের বিষয় সকলের প্রকাশক কিন্তু স্বয়ং সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত। তিনি সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার। তিনি সত্ত্বাদি-গুণ-রহিত অথচ তাহাদিগের উপলব্ধা। তিনি স্বকৃত চরাচর জগতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করেন। তাঁহার রূপাদি না থাকাতে সূক্ষ্মত্ত্ব হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানের দূরস্থ ও জ্ঞানীর নিত্য-সন্নিহিত। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। তিনি অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত এবং তিনিই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত হয়েন।

যাঁহারা বিশ্ববন্দ্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সেই পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা, তন্নিষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারাই যুক্ততম ও ব্রহ্মজ্ঞানী। যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক নিখিল বিশ্বের অধিষ্ঠাতা অচিন্তনীয় সর্ব্বব্যাপী সেই অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর পরমাত্মাকে আত্মা দ্বারা দর্শন করেন তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু দেহাভিমানীদিগের সেই অব্যক্তে নিষ্ঠা হওয়া দুষ্কর আলোচনার কর্ম্ম। অনেক বিষয় ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সহিষ্ণুতা দ্বারা অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। ঈদৃশ ত্যাগ স্বীকারে সক্ষম হইলে অনেক অবসর আয়ত্তাধীন হয়। ব্রহ্মেতে চিত্তনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং ত্যাগজনিত অবসর এই দুই একত্র হইলেই অনায়াসে জ্ঞানালোচনা আরম্ভ হয়। তখন শাস্ত্রপাঠে, জগতের মধ্যে ঈশ্বরীয় মহিমা আলোচনায়, প্রকৃতির অতীত পুরুষের ধ্যানে, ও আত্মস্বরূপের ও পরমাত্মস্বরূপের জ্ঞানসাধনে মতি জন্মে, তখন সদুপদেশ শ্রবণে ও সদুপদেশ দানে ইচ্ছা

হয়, তখন বহিঃপ্রয়োজনের স্বল্পতা নিবন্ধন সংসার, প্রকৃতি, কাল, ও কোলাহল বাধা দিতে পারে না। তখনই প্রকৃত তপস্যা হয়, তাদৃশ অবস্থাই যোগের অবস্থা। সেই অবস্থায় মানবের মনকে মুক্তিপ্রদ দেবভাব আশ্রয় করে। যাঁহাদের আত্মা বিষয়-কোলাহলে নিমগ্ন ও অসুরভাবে প্রতিপালিত, তাঁহারা দেবদুর্লভ ত্যাগস্বীকারে ও বৈরাগ্য-আশ্রয়ে অসক্ত। তাঁহাদের আসুরী প্রকৃতি যত কোলাহল, স্বার্থসাধন ও কামোপভোগ প্রার্থনা করে তত সাত্ত্বিকী সম্পদ চাহে না। সাত্ত্বিকী সম্পদ সাধনার্থে তাঁহাদের অবসর হয় না। কিন্তু দেবভাবসম্পন্ন মানবগণ চিত্তপ্রসন্নতা ও ভক্তি-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে অতিপূজ্য বলিয়া অভিমান করেন না। কিন্তু অসুর ভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বভাব তাহার বিপরীত। দেবভাবাশ্রিত সাধুগণ বাহ্য কার্য্য ও বহিশ্চিন্তাকে সংক্ষেপ করিয়া আত্মার সাধনে তৎপর হন। ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার প্রচুর সময় করিয়া লন কিন্তু অসুরভাবাশ্রিত লোকেরা নানা আড়ম্বর নানাবিধ মিথ্যা জল্পন ও নানা আশাকর কার্য্য দ্বারা একেবারে সময়কে ভারাক্রান্ত করেন।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

তাদৃশ বহুব্যাপার-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মোহজালে সমাবৃত, এবং কামভোগে প্রসক্ত জনেরা অশুচি নরকে পতিত হয়েন।

অতএব জ্ঞানধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ সর্ব্ব প্রকারে আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকী সম্পৎসাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। আসুরিক ভাবপরিত্যাগ করিলেই বহু অবসর আয়ত্তাধীন হইবেক। তাদৃশ শান্তিপ্রদ অবসর, চিত্তের ব্রহ্মনিষ্ঠতা পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। যাঁহার চিত্ত উক্তপ্রকার শান্তির আশ্রিত তিনিই সেই সনাতন পুরুষের সহবাস লাভ করেন। তিনিই সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মার্পণমস্তু বলিয়া ব্রহ্মেতে অর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্যভোগ ব্রহ্মের উদ্দেশে, দানীতাও ব্রহ্মের উদ্দেশে, তাঁহার জ্ঞানসাধন ব্রহ্মের উদ্দেশে, চিন্তা ও আলোচনা ব্রহ্মের উদ্দেশে, সংক্ষেপত সর্ব্বকর্ম্মই তিনি ব্রহ্মের কর্ম্মজ্ঞানে করিয়া থাকেন।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

১১৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৬ পৃষ্ঠার পর।

(৮৯)

ঈশ্বর জগতের অন্তর্গামী জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ। তিনি নিত্যকাল নির্দ্দিষ্ট কাল বিভাগানুসারে সকল বস্তুর সুব্যবস্থা ও সুবিধান করেন।

এণ্টোনাইনস।

(৯০)

যেমন সৎ পৌরজনেরা আপনার ইচ্ছাকে নগরের নিয়মের অধীন করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তি আপনার ইচ্ছাকে জগৎ-নিয়ন্তার ইচ্ছার অধীন করেন।

এপিকটিটস্।

(৯১)

বস্তু সকল যেমন সৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপই সৃষ্ট হওয়াতে ভাল হইয়াছে এইরূপ মনে করার নাম জ্ঞান। অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা ও যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই ভাল এইরূপ মনে করা প্রকৃত জ্ঞান।

ঐ।

(৯২)

যেমন আমাদিগের শরীর নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা সকল স্থানব্যাপী বায়ু হইতে প্রাণ আহরণ করিতেছে সেইরূপ যে বৃহৎ জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ এই জগৎকে ধারণ করিতেছেন

তাঁহা হইতে প্রাণ আহরণ ও চুষণ করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন হওয়া আমাদিগের আত্মার কর্ত্তব্য।

এণ্টোনাইনস্।

(৯৩)

ঈশ্বর জগতের আত্মা এবং সকল বস্তুর জ্ঞানময় প্রস্রবণ।

ঐ।

ক্রমশঃ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভাবতী হইতে উদ্ধৃত)

অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্য-অভিব্যক্তি ইহা, বুঝিলে সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু না বুঝিলে বুঝান সহজ নহে। মনে কর আমি কোন চিকিৎসকের নিকট শুনিলাম যে, প্রত্যূষে পদচারণা করিয়া বেড়াইলে শরীর খুব ভাল থাকে। তদবধি এইরূপ নিয়ম করিলাম যে, কল্য হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইব। তাহার পর নিয়মিত রূপে সেইরূপ কার্য্য করিতে লাগিলাম। সহস্র প্রামাণিক পণ্ডিত হইলেও এখানে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্যঅভিব্যক্তি। এক জন ফরাসিস্ তত্ত্বজ্ঞানী নিজের সম্বন্ধে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যদি নিয়ম করা যায় যে, আমি অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব তাহা হইলে ঠিক সেই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইবে। এইরূপ স্থলবিশেষে আমাদের অজ্ঞাতসারেও আমাদের কৃত নিয়ম সকল কার্য্যকারী হয়। পুনশ্চ "প্রত্যহ অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব" এই নিয়মটি যদি কিছুদিন পালন করি, তাহা হইলে ইচ্ছা-পূর্ব্বক সে নিয়ম পুনর্ব্বার স্থিরীকৃত না হইলেও অভ্যাস বশতঃ তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, মানসিক নিয়ম অগ্রে, এবং সে নিয়মানুযায়ী যে কার্য্য হয় তাহা তাহার পরে। সে কার্য্য ঘটিবার পূর্ব্ব হইতেই সে নিয়ম বর্ত্তমান; কোথায় বর্ত্তমান? না সে কার্য্যের কারণ যে আমাদের মন সেই মনেতে। প্রামাণিক পণ্ডিত এখন বলিবেন যে, মানসিক নিয়ম ঐরূপ বটে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম আর প্রাকৃতিক ঘটনা এ দুয়ের মধ্যে ওরূপ অগ্রপশ্চাদ্ভাব না থাকিতে পারে। তাঁহার এ কথা তাঁহার আর আর অনেক কথার ন্যায় কেবল একটা বল-প্রকাশ মাত্র, যুক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এই একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প দুয়ের বিধিমত যোগ হইলে জল উৎপন্ন হয়। জলোৎপত্তি-রূপ যে একটি কার্য্য তাহা ঐ নিয়ম-সাপেক্ষ। জল যখন উৎপন্ন হয় নাই তখন সে নিয়ম ছিল, জল যখন উৎপন্ন হয় তখন সেই নিয়মানুসারেই উৎপন্ন হয়। জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প, দুয়ের সংযোগে একটা হাতিও হইতে পারিত, ঘোড়াও হইতে পারিত, তাহা না হইয়া কেবল যে জলই উৎপন্ন হইবে, এ নিয়ম কোথা হইতে আইল? অবশ্য জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প, উভয়ের প্রকৃতি হইতে। জলের কারণ যে অম্লজনন এবং জল-জনন বাষ্প, উভয়ের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ঐ নিয়ম বর্ত্তিতেছে। ইহা যদি না মানো তবে ও নিয়ম কোথায় বর্ত্তিয়াছে? শূন্য আকাশে? জড় বস্তু যেমন আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করে, নিয়মও কি সেইরূপ? নিয়ম কি জড় পিণ্ডবৎ একটা সামগ্রী? অতএব জলোৎপত্তি বা অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তদীয় নিয়ম, তাহার কারণাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

সহজে এটি সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে যে, যে কোন কার্য্য হউক না, তাহার অভিব্যক্তির নিয়ম তাহা অপেক্ষা ব্যাপক, এই হেতু কোন কার্য্য বিশেষ অবলম্বন করিয়া নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, কার্য্যের যে কারণ তাহাকেই অবলম্বন করিয়াই নিয়ম স্থিতি করে। মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যসৃষ্টির নিয়ম বর্ত্তমান ছিল। কোথায় বর্ত্তমান ছিল? কারণেতে। যখন মনুষ্য সৃষ্টি হইল, তখন সে নিয়ম কার্য্যেতে প্রতিভাত হইল। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়ম কেবল যে কার্য্যের পরিসরের মধ্যেই বদ্ধ থাকে এমন নহে; কার্য্যকারণ উভয় ব্যাপিয়া নিয়ম অবস্থিতি করে। কারণেরও কারণ আছে; যে যুক্তিতে কার্য্য হইতে কারণে নিয়মের

মানিতে হইতেছে সেই যুক্তিতে কারণ হইতে তাহারও কারণে নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। সুতরাং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। অতএব সেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আদিভূত, সাংখ্যদর্শন যাহাকে ভূতাদি বলিয়াছেন, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে ঈথর বলিয়াছেন, বেদান্ত যাহাকে আকাশ বলিয়াছেন, সৃষ্টির নিয়ম সেই আদিভূত হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবজন্তু উদ্ভিদ সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বে, সূর্য্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে অসীম আকাশ-ব্যাপী যে ভূতাদি তাহার সহিত সৃষ্টির নিয়ম বর্ত্তমান ছিল। এই খানে আরোহ-প্রণালী চরম-সীমায় উপনীত হইল, আরোহপ্রণালী ইহা অপেক্ষা আর উচ্চে উঠিতে পারে না। যেমন চক্রের অন্তর্ভূত ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদি ফলকের কোণসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই তাহা চক্রের নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু উক্তরূপ কোণ বৃদ্ধি প্রণালীর দ্বারা উহা কোন কালেই চক্রের সহিত একীভূত হইতে পারে না। সেইরূপ আরোহ প্রণালী দ্বারা স্থূল সৃষ্টি হইতে সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে যতই আরোহণ করা যায়, ততই সৃষ্টির আদি কারণের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় বটে কিন্তু সে প্রণালীতে কোনকালেই সেখানে পৌঁছিতে পারা যায় না, এই জন্যই অবরোহ প্রণালীর প্রয়োজন। আদিভূত যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, কিন্তু আত্মা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। যদি বল যে তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মা আপনি আপনার প্রমাণ। বলিয়াছি এই যে, বহির্জগতে সত্য বহুধা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে এজন্য তথাকার কোন একটি সত্যের প্রমাণ দিতে হইলে অন্য আর একটি বা ততোধিক সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। পৃথিবী [illegible] টির প্রমাণ দিতে হইলে জাহাজের মা[illegible] রেখায় ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এই [illegible] একটি সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। কিন্তু আত্মাতে সত্য এমনি প্রগাঢ়রূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, তাহা সহজ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। বহির্জগতে সত্য বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তথায় একাধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাতে সত্য প্রগাঢ় ভাবে রহিয়াছে বলিয়া, একমাত্র স্বানুভূতি ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। * * স্বানুভূতিকে আমরা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করি। যেখানে স্বানুভূতি সম্ভবে না সেই খানেই অন্য প্রকার প্রমাণ দর্শান আবশ্যক হয়। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয় প্রদীপ আবশ্যক হয় না, তেমনি আত্মাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না; আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ।

THE FAITHS OF INDIA; HINDOOISM. BRAHMOISM &c.

(EXTRACTED FROM J. ROUTLEDGE'S "ENGLISH RULE AND NATIVE OPINION IN INDIA," 1878)

"IN September 1872, the walls of Calcutta were placarded with an advertisement of a lecture to be given by the Minister of the elder body of the Brahmists (termed the "Adi Somaj"— Adi Church) on "the Superiority of Hindooism to all other religions." Reference has been made in an earlier chapter to one essential and vital difference between the two Brahmist Churches, both professing to follow the great first Brahmist, Rajah Ram Mohun Roy. The younger body, the Church of Baboo Keshub Chunder Sen, may be said to be very nearly akin to Unitarian Christianity, the elder believe that Hindooism, although overgrown with excrescences, has, for its germ and origin, the worship and unity of the One True God, and that a return to the teaching of the Vedas would be a return to a pure, though a poetical, deism. I had at this time been in India about two years, and had sent home what I must term strictly and rigorously accurate, though not unquestioned, pictures of what may be seen at festivals of Doorga and Juggernauth; I had also in those two years formed an impression that Englishmen do not rightly comprehend the faiths, or the men influenced by the faiths of India. This advertisement, however was a startling one. Did the Minister of the Adi Somaj (a scholar and a gentleman I afterwards found) actually mean to assert, in the face of the missionary and educated English Christianity? I found he did, and before

the controversy which his lecture caused had ended, I had come to the conclusion that the Hindoos may, in God's good providence, and without an absolute adherence to Christian channels of faith or form, find their way backward to the key to all truth, the Oneness of the Most High God. I did not think, and do not now think, of defending Hindooism. I did, and do, desire to show somewhat of the character of many Hindoo scholars and thinkers who still claim to be actuated and guided by Hindooism.

"Since that time I have endeavoured in different ways to draw attention to the literature of those two Brahmist bodies—a literature so marvellously devotional, and so inspired with a spirit of love to God and men, that one might seek far for a parallel to it, save in the most devotional works of the old Catholic divines. I find such passages as these; "Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians also? Was it not a great transition from the Elohim of Moses to the God of the New Testament? 'A change passes over the Jewish religion from fear to love, from power to wisdom, from the justice of God to the mercy of God, from the nation to the individual, from this world to another, from the visitation of the sins of the father upon the children, to every soul shall bear its own iniquity; from the fire, the earth-quake, and the storm to the 'still small voice.' ...... Let us be pure and holy in our lives. Let us make sacrifices for our religion ...... Lord God, Our Father, our Saviour, our Redeemer! to Thee we look up for succour, for we are weak. Always grant the light of Thy countenance, for that light alone is our only consolation amid the darkness and dangers of our situation." Forsake us not, but infuse patience, firmness and fortitude into our souls, so that we may stand as witnesses of Thy glory to generations to come(1)."

"In the same spirit a writer of the same body claims for Brahmoism the words of Abou Ben Adhem's Dream—"Write me as one who loves his fellow-men (2)." This literature is ever growing, and its spirit pertains to both the Brahmo bodies. Each has its pamphlets, its newspapers, its societies for moral and social, as well as religious, progress. Both alike disown Christianity, save as one of the good systems of religion which "the education of the world" has produced from age to age.

"The minister of the Adi Somaj undertook to prove, in the face of the younger Brahmo body, as well as as of Christian Missionaries;

'That Hindooism is superior to all other religions, because it owes its name to no man, because it acknowledges no mediator between God and man; because the Hindoo worships God as the soul of the soul, and can worship in every act of life—in business, in pleasure, and in social intercourse: because, while other scriptures inculcate worship for the rewards it may bring, or the punishment it may avert, the Hindoo is taught to worship God and practise virtue alone, because being unsectarian, and believing in the good of all religions, Hindooism is non-proselytising and tolerant, as it also is devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense and possesses an antiquity which carries it back to the fountain-head of all thought.'

"These are some of the points which the lecturer endeavoured to illustrate from history and by well-put references to existing facts.

"His position was disputed by a genial and accomplished Missionary, the Rev Dr. Murray Mitchell and by several members of the younger Brahmo body. Dr. Mitchell claimed to include the Tantras among the sacred books of the Hindoos, and adduced from them immoral passages which the minister of the Adi Somaj, Babu Rajnarain Bose, promptly disowned "I am not," he said "a Tantrist, and therefore decline to enter into a discussion on the merits and demerits of any of the Tantras. The position which I took up in my lecture on the Superiority of Hindooism was this, that even the lowest Shastras, the Tantras, not to mention the Vedas, the Upanishads, the Smritis, and the Puranas, contain monotheistic sentiments of the most exalted description." The younger Brahmo body maintained that the Church represented by Babu Rajnarain Bose had

(1) These passages Mr. Routledge extracts from Babu Rajnarain Bose's pamphlet titled "Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj." Ed. T. P.

(2) The writer here alludes to a passage in Babu Rajnarain Bose's. "What is Brahmoism?" Ed. T. P.

drifted from the teachings of Rajah Ram Mohun Roy, and his successor Debendra Nath Tagore, neither of whom confined his search for truth to any one system, and the latter of whom claimed all great and good men as teachers, all "nature as revelation," and "pure reason as minister(3)." Babu Jotendro Nath Tagore (4) (a notable Calcutta Zemindar, kinsman and successor of Rajah Ram Mohun Roy's distinguished disciple. Dwarka Nath Tagore) maintained that Hindooism is an illimitable fount of truth, and, in confirmation of this view, produced many beautiful passages from the Shasters.

This controversy produced little effect in India, so far as making known the tenets of the two Brahmist Churches was concerned but it was valuable to me, and it may be so to the reader in two ways. First, it shows that, while the Church of Babu Keshub Chunder Sen is drifting further from Hindooism, the older body is coming nearer to Hinduism while, at the same time endeavouring to raise it from an idolatry to a philosophy and a monotheistic faith. Secondly, that the younger body in drifting from Hindooism is not drifting any the nearer to Christianity. The forms of worship of both Churches are thoroughly, and at festive times markedly, Hindoo in the apparent intensity of the devotion, and in the appeals to the senses by music and flowers. An "Inquirer from the Outside" during this controversy having asked some questions indicating his view of the greater simplicity, solemnity, devotion, charity, and purity of the Gospel of Christ, the *National* (Adi Somaj) *Paper*(5) replied with some fine instances of Hindoo charity, of honor paid to parents and much besides; facts which may be freely admitted while at the same time, a glimpse into these ancient writings, as into the Koran, is sufficient to show what a marked contrast they present to the New Testament. I can not see whither the spirit of inquiry now abroad in India is tending, but I venture to ask the reader to view it in a generous and kindly spirit.

It is now little more than a century since Ram Mohun Roy (created Rajah by the King of Delhi) was born of a high caste and powerful family in Burdwan. Instructed in all the learning of his caste, he nevertheless began to doubt, as Sakya Muni ages before had doubted. He studied, travelled, sought communion with men of intelligence wherever he could find them. Finally he began to teach, and in one tract, "Against the Idolatry of all Religions" made himself a host of enemies and opponents, including many missionaries. He certainly held that the Vedas, so far from inculcating idolatry, established the worship of the One God. He selected portions of the words of Christ and wrote of them with enthusiasm. His purity never was disputed. He died in Bristol in 1833; and a little later his disciple and friend, Dwarka Nath Tagore, marked by a monument the grave of one of the true teachers of men. After some years the mantle of the great leader fell upon Debender Nath Tagore. About twenty years later still, suspicions began to creep into the body, chiefly through the appeals of Keshub Chunder Sen, that the Vedas were not sure ground (6). In 1866 the Progressive Somaj became an independent Church."

(3) Babu Debendra Nath Tagore, while doing so, is more national in his views and predilections than Mr. Routledge imagines. He is of opinion that we need not resort to the scriptures of other nations for religious instruction and that the ocean of the Hindu Shastras is quite sufficient for the purpose. He presided at the lecture of Babu Rajnarain Bose on the superiority of Hinduism and expressed high approbation of the same. Ed. T. P.

(4) The gentleman here alluded to by Mr. Routledge is Babu Jyotirindra Nath Tagore, the Secretary of the Adi Brahmo Samaj. He is a son of Babu Debendra Nath Tagore and a grandson of the late Babu Dwarka Nath Tagore. His letters to the "Friend of India" on the subject of Hindooism alluded to by Mr. Routledge are given towards the end of Babu Rajnarain Bose's "Superiority of Hindooism." Ed. T. P.

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের পুস্তক যাঁহারা পাঠের জন্য লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তাহা প্রতিপ্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

(5) The "National Paper" is not the organ of the Adi Brahmo Somaj. It is a journal quite independent of that institution. Ed. T. P.

(6) These suspicions were not caused by the appeals of Keshub Chunder Sen who joined the Brahmo Somaj some seven years after the public declaration by that body that the Vedas are not revealed books in the sense in which that phrase is usually taken. Ed. T. P.

Registered No 53.

প্রথম কল্প
চতুর্থ ভাগ
আষাঢ় ১৮০০ শক।
৪১৯ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মার স্বাভাবিক লক্ষণে প্রত্যা-বর্ত্তনই মুক্তি।

আত্মার স্বাভাবিক লক্ষণ পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ। পাপ আত্মার এমনি ঘৃণাকর পদার্থ যে যাহারা অবিরত পাপাচরণ করি-তেছে তাহারাও ধার্ম্মিককে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। পবিত্রতা যে আত্মার কত অনুরাগের বিষয় তাহা ইহা দ্বারা বিল-ক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মা স্বভাবতঃ শান্তির অত্যন্ত অনুরাগী। যাঁহারা বিষয় কর্ম্মে অহর্নিশি ব্যস্ত রহিয়াছেন তাঁহারা সেই দিন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করেন যখন যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ নি-রুদ্বেগ অবস্থাতে অতিবাহন করিবেন। এ প্রকার অবসর সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া না উঠুক, কিন্তু [illegible] প্রমাণিত হইতেছে যে [illegible] অনুরাগী। আত্মা [illegible]লাষী। যে সকল পদার্থ [illegible] আত্মাকে তাহার [illegible] বটে কিন্তু [illegible] অনুরাগী [illegible] তাহার সন্দেহ নাই। গর্হিত ইন্দ্রিয়-সুখ প্রকৃত সুখ নহে, পরিণামে দুঃখদায়ক, কিন্তু মনুষ্য এই মনে করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হয় যে তাহা প্রকৃত সুখজনক, অতএব প্রমা-ণিত হইতেছে যে পবিত্রতা, শান্তি ও আন-ন্দের প্রতি আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে এবং সে সকল আত্মার স্বাভাবিক লক্ষণ, কিন্তু অন্য কোন কারণে তাহা সে সকল লক্ষণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। এক্ষণে জি-জ্ঞাস্য এই যে সে কারণ কি? বাহ্য বিষ-য়ই সেই কারণ। বাহ্য পদার্থ ও ঘটনা সকল আত্মাকে পাপে নিমগ্ন করে, বাহ্য পদার্থ ও ঘটনা সকল আত্মাকে শান্তি হইতে প্রচ্যুত করে, বাহ্য পদার্থ ও ঘটনা সকল আত্মাকে নিরানন্দ অবস্থাতে নিক্ষিপ্ত করে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আত্মার যে ক্রমশঃ উন্নতির কথা বলেন সে ক্রমশঃ উন্নতি আর কিছুই নহে, বাহ্য বিষয়ের প্রতি আত্মার নির্ভর-ভাবের ক্রমশঃ হ্রাস। বাহ্য পদার্থের প্রতি আত্মার নির্ভরের কারণ শরীর; পারলৌকিক অব-স্থাতে আত্মা যেমন এক লোক হইতে উচ্চ-তর লোকে উত্থিত হইবে ততই শরীর ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া এমন এক অবস্থা আ-

সিরে যখন শরীর আর থাকিবে না, সেই অবস্থায় স্বভাবতঃ বাহ্য পদার্থের প্রতি আত্মার নির্ভর একেবারে রহিত হইবে। সেই অবস্থাতে নির্ম্মল শান্তি ও সুখ লাভ হইবে ও সেই শান্তি ও সুখের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকিবে। পরকালে এমন এক অবস্থা অবশ্য আসিবে যাহাতে আত্মা বিষয়-পাশ ও দুঃখ হইতে একেবারে বিনির্মুক্ত হইয়া অক্ষুন্ন পবিত্রতা শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবে ও সেই সকল গুণের ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে। এ অবস্থাতে আত্মা বাহ্য জগত অনুভব করিবে মাত্র কিন্তু তাহার প্রতি তাহার কিছু মাত্র নির্ভর থাকিবে না। কিন্তু যত দিন বাহ্য জগতের উপর নির্ভর আছে তত দিন অক্ষুন্ন পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ আত্মার লভনীয় নহে। তথাচ বর্ত্তমান অবস্থাতে আমরা সাধন দ্বারা বাহ্য বিষয়ের প্রতি নির্ভরের ভাব যতই হ্রাস করিব ততই আমরা পবিত্রতা, শান্তি, ও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব। যে আত্মা আপনার প্রতি নির্ভর করে সেই প্রকৃত রূপে সুখী; যে আত্মা বাহ্য পদার্থের প্রতি নির্ভর করে সেই প্রকৃত দুঃখী। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" বাহ্য বিষয় আমাদিগের পর, আত্মাই আমাদিগের এক মাত্র আত্মীয়। কোন বিদেশীয় কবি বলিয়াছেন "বস্তুতঃ পদার্থ ভালমন্দ নাই, ভাল ভাবিলেই ভাল, মন্দ ভাবিলেই মন্দ।" আর এক কবি বলিয়াছেন "মন স্বস্থানে থাকিয়া স্বর্গকে নরকে অথবা নরককে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে।" বৈদান্তিকেরা বলেন জ্ঞানী ব্যক্তি "মৃতবচ্চেতা" হয়েন; তাহার অর্থ এই যে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তিনি মৃত হয়েন এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়েন। এই অবস্থা আপাততঃ কাল্পনিক বোধ হয় কিন্তু অভ্যাস দ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে আয়ত্তীকৃত হয়। কেহ কেহ এমন আছেন যে বাহ্য সুখসচ্ছন্দতার কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটি হইলে তাহা তাঁহাদিগের একেবারে অসহ্য হয়, আবার কেহ কেহ এমন আছেন যে বাহ্যাবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইলেও ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক সর্ব্বদা সন্তোষ ও প্রফুল্লচিত্ত থাকেন। শেষোক্ত সাধুলোকদিগের দৃষ্টান্ত আমাদিগের অনুকরণীয়। যিনি এইরূপ ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক সর্ব্বদা সন্তোষ ও প্রফুল্ল চিত্ত থাকেন তিনি আপনার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে হিন্দু মত প্রচার।

কোন কোন পুরাবৃত্ত-লেখক বলেন যে অতি পুরাকালে ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকেরা ইউরোপে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করিতেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের সংকল্প সাধনে কৃতকার্য্যও হইতেন। সেই ইতিহাস-বহির্ভূত পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে ইউরোপে অসংখ্য রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ও ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ইউরোপবাসীদিগের মনকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছে। তখন ইউরোপীয় মনের যাহা উপযোগী ছিল এখন তাহা নাই। তখন যে প্রকার ধর্ম্ম, যে প্রকার রাজ্য-শাসন-প্রণালী এবং যে সামাজিক আচার ব্যবহার ইউরোপীয় মনের উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ ছিল এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে প্রকার ধর্ম্ম, রাজ্য-শাসন-প্রণালী বা আচার ব্যবহার তাহার উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ নহে। সেই [illegible]

ষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহা [illegible] হইয়াছে তাহাতে এমন [illegible] আশা করা যাইতে পারে না যে [illegible] সময়ে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু মত ইউরোপীয় মনে স্থান পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্তঃপাতী জর্ম্মেনি রাজ্যে আর্থর শোপেনহাউএর (Arthur Schopenhauer) নামক একজন অসাধারণ মেধাশক্তিসম্পন্ন দার্শনিক উদিত হইয়া স্ব-প্রণীত দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত মত সকল প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

শোপেনহাউএর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্ম্মেনির ড্রুষ্টীম নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকাল হইতে দর্শনশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিয়া পরিশেষে উহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীঃঅব্দে তিনি কার্য্য কারণ সম্বন্ধে একখানি গভীর চিন্তাপূর্ণ অভিনব দার্শনিক প্রসঙ্গের প্রবর্ত্তন করেন। ১৮২৯ খ্রীঃঅব্দে তিনি মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা বিষয়ে একখানি গভীর দার্শনিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। দর্শন সম্বন্ধে এমন অল্প বিষয় আছে যাহা তিনি স্বীয় প্রতিভা দ্বারা বিশেষরূপে বিচার না করিয়াছেন। জর্ম্মেনির সুবিখ্যাত দার্শনিক ফাইক্‌ট (Fichte) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু তিনি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার অতুল বুদ্ধিমত্তা ও গভীর দার্শনিক মেধা স্বীকার করিয়াছেন।

শোপেনহাউএরের দর্শনের সহিত কোন কোন হিন্দু দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শোপেনহাউএর "মায়া" "সর্ব্বভূতে দয়া" "সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন" প্রভৃতি হিন্দু মত সকল হিন্দু দার্শনিকের ন্যায় বিচার করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল মতের যথার্থতা ও যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। [illegible] শোপেনহাউএর বলিতেন যে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণরূপে অসত্য; দেশ, কাল, কার্য্য কারণ কেবল মনের ভ্রম মাত্র, কিছুই যথার্থ নহে; সমস্ত জগৎ মায়াময়। শোপেনহাউএর বলিতেন যে, খ্রীষ্টীয়ান বা ইহুদি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত ধর্ম্মের বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের ন্যায় সর্ব্বভূতে দয়া সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়াছিলেন এবং জীবহিংসা অতি ভয়ানক পাপ ও অপরিমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। যে ব্যক্তির মন সমস্ত প্রাণীর হিতচিন্তায় নিরত থাকিত, যাহার অন্তঃকরণ সকল প্রাণীর প্রতি মমতা প্রকাশ করিতে পারিত, যে ব্যক্তি প্রতিবাসী বন্ধু হইতে আকাশবিহারী বিহঙ্গম পর্য্যন্ত ভাল বাসিতে জানিত, জ্ঞানী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সেই ব্যক্তিকে শোপেনহাউএর প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পুরাকালীন হিন্দুদিগের ন্যায় শোপেনহাউএর সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, সন্ন্যাস জীবন তিনি মনুষ্যের পূর্ণ উন্নতির অবস্থা বিবেচনা করিতেন। যে ব্যক্তি এই মায়াময় সংসারের অসারত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাকে তিনি ধার্ম্মিক মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন।

এই সকল হিন্দু মত প্রচার করিয়া শোপেনহাউএর জর্ম্মেনির দার্শনিক রাজ্যে একটি বিপ্লব উপস্থিত করেন। যদিও কোন বিজ্ঞ লোক শোপেনহাউএরের মত গ্রহণ করেন নাই কিন্তু অনেক দর্শনশাস্ত্রানুরাগী ছাত্রেরা তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ঐ সকল শিষ্যেরা অদ্যাবধি শোপেনহাউএরের ঐ সকল হিন্দু-ভাব-প্রধান মতের অবলম্বী হইয়া আছেন, কিনা আমরা

জানি না। যাহা হউক, অতি পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সকল মত ঋষিরা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সেই সকল মত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে সভ্য ইউরোপের মধ্যে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক কর্ত্তৃক পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইবে ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই ঘটনা ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটি অত্যাশ্চর্য্য, অসামান্য ও বিস্ময়কর ঘটনা বলিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত।

শঙ্করাচার্য্যকে যে কেন শিবের অবতার বলে তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে বিজয়লেখক আনন্দগিরির মত ও প্রচলিত প্রবাদ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব যে আবশ্যক হইয়াছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এত দিন হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নও থাকিত কি না তাহা সন্দেহস্থল। তিনি ভারতবর্ষের তাৎকালিক সমাজবিপ্লব নিবারণ করিয়া আর্য্যগণের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দৃঢ় করেন। যত কাল ভারতে হিন্দুধর্ম্মের গন্ধ পর্য্যন্ত থাকিবে ততকাল শঙ্করাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে নাম্বুরিব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কোন কোন মতে কর্ণাটদেশান্তর্গত তুঙ্গভদ্রা-নদী-তীর-স্থিত শৃঙ্গপুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তৃতীয় বর্ষে তাঁহার চৌড়কর্ম্ম, পঞ্চমে মৌঞ্জীবন্ধন এবং অষ্টমে উপনয়ন হইলে তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে আচার্য্যের ললাটদেশ অর্দ্ধেন্দুশোভিত, বদন পূর্ণেন্দুশোভন, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, উরু এবং গুল্ফ স্থূল, পদ স্বল্প, নখ শোণবর্ণ, কর-পাদ-মধ্যস্থল শঙ্খচক্র প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত, মস্তকের বাম ভাগে ত্রিশূল চিহ্ন এবং দক্ষিণ ভাগে অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন; ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা তিনি সাক্ষাৎ চিদম্বরেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং মুঞ্জময়ী মেখলা, দণ্ড, অজিন, তিলকধারণ, ও ভিক্ষাশন প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্রবিধি এই রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয় ইহাই যেন সকলকে শিক্ষা দিতেন। চমৎকারিণী মেধাশক্তি, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের প্রভাবে তিনি অল্পকাল মধ্যেই অশেষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আনন্দগিরি বলেন যে,বিদ্যা গুরুর সমীপে একবার শ্রবণ মাত্রেই আচার্য্য সর্ব্ববিদ্যাপ্রপঞ্চ অবগত হইয়াছিলেন। আনন্দ আচার্য্যকে কল্পবৃক্ষ কল্পনা করিয়া ষড়্‌দর্শনকে তাহার মূল, ইতিহাসকে স্থাণু, নিগমকে শাখা, বেদের ষড়ঙ্গকে পল্লব, শ্রৌতাদি সূত্রকে পুষ্প, বেদমন্ত্রকে শলাটু (অপক্ব ফল) এবং জ্ঞানকে পক্বফল—নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দ আর লিখিয়াছেন যে, আমার গুরু শঙ্করাচার্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের কল্পতরু, সুরগণের এবং ভূদেবগণের কামপ্রদ, বেদে ব্রহ্মসমান, ষড়ঙ্গে গার্গ্যের ন্যায়, বেদবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বিবেচনে বৃহস্পতির তুল্য, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসায় জৈমিনিসম এবং জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাসের সদৃশ। আচার্য্য অনেক বিঘ্নে পতিত হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় বিরত হয়েন নাই। এই রূপে অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তিনি বহুসংখ্যক শিষ্যদিগকে নিগমাদি শাস্ত্র সমূহের সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

এস্থলে আমরা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ— মাধবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তিনি [illegible] প্রাচীন

বলিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ৫০০ বৎসরের লোক। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণবদিগের চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত শ্রীসম্প্রদায়ের সংস্থাপক রামানুজ আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের মত নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের [illegible] দ্ধির সূত্রপাত করিলেন। সুতরাং রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক। স্মৃতি-কাল-তরঙ্গের মধ্যে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বকানান্ সাহেব-কৃত মাইসোরগ্রন্থে (Buchanan's Mysore vol II. p424) উল্লিখিত শিলালিপির প্রমাণে রামানুজ ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব রামানুজ যে একাদশ শত শকাব্দার লোক তাহা নিশ্চিত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ—তৈলঙ্গভাষা-রচিত কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের কৈশোর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুসারে যৎকালে মলয়বর প্রদেশের রাজা শিওরাম কৃষ্ণরাও নামক কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, তৎকালে শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে বর্ত্তমান ছিলেন। এই ঘটনা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য সহস্র বৎসরের লোক।

চতুর্থতঃ—শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিতে মলয়বর দেশের লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত বপ্রবাদ আছে যে তিনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে গুরু-পরম্পরা-শ্রুত মত এই যে তিনি বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে সময়নিরূপণ করিতে [illegible], কিম্বদন্তী বা দেশের প্রচলিত মত [illegible] উপযোগী। সুতরাং আচার্য্য সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে অবশ্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ—শঙ্করবিজয়ের মতে শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীর দেশে গমন করিয়া সরস্বতী-পীঠে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি তত্রত্য স্বমতবিরোধিদিগকে পরাজিত করেন। রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে লিখিত আছে যে, ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষকালে গৌড়দেশীয় কতকগুলি পণ্ডিত কাশ্মীরস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের সহিত কাশ্মীরস্থ লোকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কারণবশত ঘোর বিবাদ হইয়াছিল। কাশ্মীরে সরস্বতী-পীঠে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনৈক্য-হেতুক বিবাদ উভয় গ্রন্থেরই বিষয়। সুতরাং গৌড়দেশী পণ্ডিতেরা বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্য সকল। গৌড়দেশ দ্বারা এস্থলে বঙ্গদেশ বুঝিতে হইবে না; সারস্বত, কান্যকুব্জ প্রভৃতিও পঞ্চ-গৌড় প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। অতএব ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর যে শঙ্করাচার্য্যই এই ঘোর বিবাদ ঘটাইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৩০ বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল। আচার্য্য তৎকালের লোক। এই কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা সহজেই বিনিগমনা করা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৭০০ হইতে ৮০০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে যখন সাক্ষাৎ কোন আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন কেবল প্রতিফলিত আলোক এবং অন্যান্য কালনিরূপণোপায় দ্বারা যতদূর পারা যায় ততদূর আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল স্থির করিতে চেষ্টা করা গেল। অষ্টম শতাব্দী যে আচার্য্যের প্রাদুর্ভাব-কাল তদ্বিষয়ে অনুকূল যুক্তি ভিন্ন প্রতিকূল কোন যুক্তি বা তর্ক দেখা যায় না।

শঙ্করাচার্য্য অল্পকালের মধ্যে নানাশাস্ত্র-

বিশারদ হইয়া উঠিলেন। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে আচার্য্য চতুঃষষ্টিকলারূপ পরাগ-রঞ্জিত,চতুর্দ্দশবিদ্যারূপ মণি-বিরাজিত, সহস্র-বেদ-প্রভা-দীপিত, সূত্রও ইতিহাসরূপ তন্তু-ভূষিত এবং তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি পরিশোভিত ব্রহ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন। তৎসময়ে তাঁহাকে উদয়াচলে বালভানুর ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ড-গোল-কীলে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়; জনক-নৃপতি-কৃত দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, পরীক্ষিৎ রাজার জ্ঞানবোধকালে শুকদেবের ন্যায়, মেরুশিখরে তপশ্চর্য্যানিরত ব্যাসদেবের ন্যায়, রাম-কথা-বর্ণন কালে বাল্মীকির ন্যায় ভাষ্যোপদেশ সময়ে পতঞ্জলির ন্যায়, দেবগণকে উপদেশদানকালে সুরাচার্য্যের ন্যায়, নারদঋষিকে উপদেশ কালে ব্রহ্মার ন্যায় এবং যুধিষ্ঠিরকে তত্ত্ব উপদেশ দিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভাসম্পন্ন বোধ হইত। এইরূপে বহু শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা ধন্য করিয়া অষ্টম বর্ষে তিনি শ্রীমৎগোবিন্দ যোগীন্দ্রের সদুপদেশ হেতু পরম হংসাশ্রম স্বীকার করিলেন। এস্থলে আপত্তি করা যাইতে পারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এরূপ অসঙ্গত কার্য্য কেন করিলেন? ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় ক্রমশঃ স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি আছে যে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বনী (বানপ্রস্থাশ্রমী) হইবে এবং বনী হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবেক। এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি হইবে। আচার্য্য কেন ক্রমভঙ্গ করিলেন? ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের যে আশ্রমেই বিরাগ উৎপন্ন হইবে, সেই আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যাশ্রম স্বীকার করিতে পারিবে। কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, যেখানেই বিরাগ হইবে সেইখানেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"— যে দিন সংসারে বিরাগ জন্মিবে সেই দিনেই পরমহংস হইতে পারিবে এই মত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কেহ অবলম্বন করে নাই, তিনিই ইহা প্রথম বাহির করেন। অতএব আচার্য্য যে প্রব্রজ্যা স্বীকার করিলেন তাহা গর্হিত হয় নাই। অতি অল্প বয়সেই শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম স্বীকার করিবার আত্যন্তিকী ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু মাতার অমত জন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। যখনই মাতার নিকট ঐ বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেন তখনই মাতা স্নেহপূর্ণ কাতরোক্তি দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য হইতে নিরস্ত করিতেন। কিন্তু মাতার অনেক অনুরোধেও বিবাহ করেন নাই। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মাতার একবার কোনক্রমে অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের আরাধনায় এবং ধর্ম্মের চিন্তাতে জীবন ক্ষয় করিব। সর্ব্বদাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং কি সুযোগে মাতার অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারিবেন ইহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল, সংসার বিষময় বোধ হইতে লাগিল, কি উপায়ে পরমহংস হইয়া সুখী হইবেন তাহাই অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিধি অনুকূল হইল এবং তাঁহার সুখের দিবস সুপ্রভাত হইল। তিনি তাঁহার মাতার সহিত স্বগৃহের নিকটে কোন আত্মীয়ের আলয়ে গমন করিলেন। যাইবার সময়ে পথিমধ্যে একটি ক্ষুদ্র পদব্রজে নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টির জলে সে নদীটি পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা যখন প্রত্যাগমন করেন তখন দেখিলেন যে

নদী জলপূর্ণ, সহজে হাঁটিয়া পার হইবার উপায় নাই। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া জলের কিয়ৎ হ্রাস হইলে পর তাঁহারা নদীর গর্ভে নামিলেন এবং পরপারে যাইবার নিমিত্ত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে অত্যন্ত জল বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারাও ক্রমশঃ আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন আর পূর্ব্বপারে ফিরিয়া আসিবার উপায় রহিল না। তাঁহাদের জলমগ্ন হইয়া মরিবার উপক্রম ঘটিল। তখন শঙ্করাচার্য্য স্বীয় প্রত্যুৎপন্ন মতির বলে মাতাকে বলিলেন, জননি, যদি আপনি আমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণে অনুজ্ঞা করেন তাহা হইলে আমি করুণাময় ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি, নতুবা উভয়কেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাঁহার মাতা ভয়ে ভীতা এবং বিষম বিপদে বিহ্বলা হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণে পুত্রকে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য দ্বিগুণ বলের সহিত মাতাকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া নদী সন্তরণ পূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ঈশ্বরের জয় প্রচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে ভক্তির সহিত মাতার চরণারবিন্দে প্রণাম এবং যথারীতি প্রদক্ষিণাদি করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রয়াণ করিলেন।

শঙ্করাচার্য্য আর্য্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার নখদর্পণ ছিল। এই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি অদ্বৈত মত প্রচার করিতে বাসনা করিলেন। সত্যজ্ঞানানন্দময় এক মাত্র ঈশ্বরই সত্য, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময়, ঈশ্বরই জগতের উপাদান কারণ; তাহা হইতে [illegible] হইয়া থাকে তদ্রূপ এই মিথ্যা মায়া-প্রপঞ্চমাত্র জগৎকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কোন ভেদ নাই। সত্য জ্ঞানানন্ত-লক্ষণ-লক্ষিত পরমাত্মার সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে এই ভেদভ্রম দূর হয় এবং জীবাত্মার মুক্তি হয়। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন "হে শিষ্য! তুমিই ব্রহ্ম, যেহেতু তুমি চৈতন্য স্বরূপ, অজ্ঞান-কল্পিত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও তুমিই (আত্মাই) চেতন।" শিষ্যগণ প্রশ্ন করিতেন "হে গুরো! আমি সুখ-দুঃখভাক্ অতএব কিরূপে চৈতন্য সম্ভবে। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম বশত জনিপ্রাপ্ত, জলবুদ্বুদবৎ অনিত্য-দেহ-বিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়াদি সহিত, জন্ম-স্থিতি-মরণ-প্রবাহে লীন, কাম ক্রোধাদি অরিষড়বর্গের দ্বারা পীড়িত, বিবিধ গ্রহগ্রস্ত হইলেও মদন্তর্ব্বর্ত্তি জীবের নিত্যানন্দরূপতা কল্পনা উচিত হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা জ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের আশ্রয় এবং ইচ্ছা মোহ প্রভৃতি পীড়িত। আর ভেদবাদিরা বলেন যে জীব জন্তু শুভাশুভের ভোক্তা, মায়ামোহিত, পরমেশ্বর হইতে ভিন্নরূপ, সম্যক জ্ঞানের দ্বারা কেবলমাত্র সাযুজ্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র বলে যে সুকৃত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকপ্রাপ্তি এবং কপূয়াদি কর্ম্ম দ্বারা নরকলোক প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিত জুগুপ্সিত কর্ম্মের নাম কপূয়। অনন্তর যদি ভাল কর্ম্ম করিলে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয় এবং মন্দকর্ম্ম করিলে নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি কালের ন্যায় প্রলয়কালেও জীবের ভেদ এবং প্রতি শরীরে কর্ম্ম-বৈচিত্র্য ঘটিবে এবং মোক্ষ সুখরূপ স্থান প্রাপ্তির নামমাত্র হইবে। এবম্ভূত জীবের সত্যজ্ঞানানন্দ-লক্ষণ-লক্ষিত যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহার কল্পনা কিরূপে উচিত হইতে পারে।" শিষ্যেরা এই প্রশ্ন

করিলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে বলিতেন যে, সর্ব্বজ্ঞ জগদুপাদান কারণ পরাত্মা সংকল্প মাত্রে এই লোক সকল সৃজন করিলেন। লোক সৃষ্টির অনন্তর অন্যান্য সৃষ্টি করিয়া পুরুষদেহ সৃজন করিলেন। পুরুষদেহ সৃজন পূর্ব্বক এইরূপ বিচার করিলেন যে, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি মনঃ-প্রবৃত্তির অনুযায়িক, সমনস্ক ইন্দ্রিয়গণ জড় বলিয়া তাহাদের প্রেরক আবশ্যক,যেহেতু প্রেরক না থাকিলে তাহাদের কার্য্যসামর্থ্য হয় না; জড় বস্তুর প্রেরক জড় হইতে পারে না, জড় বস্তুর প্রেরক অজড়, চেতন হইবে। অতএব পরমেশ্বর মনে করিলেন যে পুরুষদেহ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইলেও আমাভিন্ন থাকিতে পারে না, সুতরাং আমি জীবাত্মারূপে পুরুষদেহে প্রবেশ করিব। এই জীবাত্মা ভোগের স্বামী হইবে। কেবল দেহেন্দ্রিয় পালনই জীবাত্মার কর্ম্ম নহে, যেহেতু আত্মজ্ঞানরূপ প্রয়োজন বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেহে প্রবিষ্ট, প্রবেশমাত্র মায়ার অনুগ্রহ বশতঃ জীবভাবাপন্ন, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেরক, দেহেন্দ্রিয়ের অতীত আত্মার সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ পরমাত্মার সম্যক জ্ঞান হেতুক পরমাত্মাতে মনের লয় হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নান্যদস্তি কিঞ্চন' এই অভেদসিদ্ধি হইবে। এই বিচার করিয়া পরমাত্মা পুরুষ-দেহে জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। মূর্দ্ধার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া শিরোদেশে জ্ঞান বাহুল্য এবং কণ্ঠের অধোভাগে কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহুল্য। আচার্য্য এইরূপ উপদেশ দান করিলে শিষ্যেরা গুরুপাদাম্বুজে প্রণাম করিয়া স্বস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সুখে উপবেশন করিত।

এই প্রকার শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ-মহিমায় বহুসংখ্যক শিষ্য শুদ্ধাদ্বৈতপরায়ণ এবং সদাচার-তৎপর হইল। তিনি সকলকে কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইতে এবং কর্ম্মসমুদয় ব্রহ্মে অর্পণ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, নিত্য কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বর তুষ্ট হইয়া অদ্বৈত জ্ঞান প্রদান করেন এবং নর মুক্ত হয়। আত্মার ইহ এবং অমুত্র একরূপ বশত প্রাণির কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই দেহত্যাগ হয় এবং এই দেহত্যাগই মুক্তি। যে দেশের লোক অদ্বৈতমতাবলম্বী সেই দেশ পুণ্যবর্দ্ধন। যাহারা অদ্বৈত দর্শন-পর তাহারা মুক্ত। মূঢ় এবং দুঃখ ভোগী যাহারা অদ্বৈত মতের নিন্দা করে তাহারা মাতৃনিন্দারত পামরদিগের ন্যায় নিরয়গামী হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ আচার্য্যের পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, আনন্দগিরি প্রভৃতি অনেক শিষ্য তাঁহার সেবা আরম্ভ করিল। ইহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আচার্য্য সকল দ্বৈতবাদিদিগকে জয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয় পর প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকৃতি।

২৮ বৈশাখের ভারতসংস্কারকে "নিয়মতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রস্তাবনা" শিরে লিখিত হইয়াছে যে "দেবেন্দ্র বাবুর দল ক্ষমতাপ্রিয়, তাঁহারা সমাজের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার করেন না।" আমরা ভারতসংস্কারকের বিজ্ঞ সম্পাদকের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। রাজা রামমোহন রায় কৃত সমাজের ট্রষ্টডীডে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে কোন ব্যক্তি ভদ্র ও বিনীত ভাবে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী হইবেন তিনি

তথায় আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড অনুসারে আদি ব্রাহ্মসমাজ কেবল উপাসনার স্থান। যে কেহ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন তিনি তথায় গিয়া তাহা করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারো সাধ্য নাই যে এই উপাসনার অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে ক্ষমতা প্রদর্শন চলে না অতএব ভারতসংস্কারক যে ক্ষমতাপ্রিয়তার কথা লিখিয়াছেন তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আদোবেই প্রযুজ্য হইতে পারে না।

ভারতসংস্কারক প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের দলের কথা লিখিয়াছেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোন দল নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন দল হইতে পারে না। আদি সমাজ কেবল উপাসনার স্থান। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টীয়ান যে কোন ব্যক্তি সকল জাতির সাধারণ পিতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন তিনি তথায় আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন অতএব ইহাতে কি প্রকারে দল হইতে পারে?

অশোক চরিত।

৪১৭ সংখ্যক পত্রিকার ৯ পৃষ্ঠার পর।

অশোকের কুনাল নামে এক পুত্র জন্মে। ইহাঁর অপর নাম ধর্ম্মবর্দ্ধন। ইনি অল্প দিবসেই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে অধিকার লাভ করেন।

একদা রাজা অশোক কুক্কুটোদ্যানে কোন এক যতির নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে যান। তথায় উপগুপ্ত নামা আর এক জন যতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাজা এই যতিকে [illegible] একটী মঠ অর্পণ করেন।

উপগুপ্ত মথুরানিবাসী কোন এক ধনী লোকের পুত্র। ঐ ধনী উরুমুণ্ড পর্ব্বতে এক সন্ন্যাসীর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী পুত্র, অশ্বগুপ্ত, ধনগুপ্ত ও উপগুপ্ত। তিনি এই তিনটী পুত্রকেও ঐ সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করেন। বুদ্ধ কহিতেন, "মম নির্ব্বৃতিমারভ্য শতবর্ষগতে উপগুপ্ত নামা ভিক্ষুরুৎপৎস্যতি" আমার নির্ব্বাণের শত বৎসর পরে উপগুপ্ত নামে এক জন ভিক্ষু উৎপন্ন হইবেন। বিম্বিসার বুদ্ধদেবের সমকালীন লোক। অশোক বিম্বিসার হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর। সুতরাং বুদ্ধের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে অশোকের সমকালীন কোন ব্যক্তির জন্ম অসম্ভব। যাহাই হউক বুদ্ধদেবের এই ভবিষ্যৎ বাক্য রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের গুরু উপগুপ্তের মহিমা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। অশোক ইহাঁর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করেন এবং ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় তীর্থযাত্রা করিতে যান। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তিনি জম্বুবৃক্ষ দর্শন করেন। এই বৃক্ষতলে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন. ঐ স্থানে তিনি বাল্যক্রীড়া করেন এবং ঐ স্থানেই তিনি বহুকাল যাবৎ অনুতাপ করেন। রাজা অশোক যে সমস্ত প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন তথায় এক একটী মঠ প্রস্তুত করিয়া দেন।

অনন্তর তিনি দেশ মধ্যে প্রচার করিলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচার এবং ইহার গৌরব বিস্তার করিবার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। বুদ্ধগয়াতে যে বোধি বৃক্ষ আছে তাহার শোভা সম্পাদনার্থও তাঁহার অনেক ব্যয় হয়। পবিষ্যরক্ষিতা তাঁহার মহিষী ছিলেন। তিনি রাজা অশোককে পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং পবিত্র বোধিবৃক্ষ নষ্ট করি-

বার নিমিত্ত মাতঙ্গী নাম্নী এক চণ্ডালীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিয়োগ করেন। ঐ চণ্ডালী ঔষধ ও মন্ত্রবলে ঐ বৃক্ষ শুষ্ক করিয়া ফেলে। অশোক, বোধি বৃক্ষ নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া শোকে অত্যন্ত অভিভূত হন। তৎকালে রাজমহিষী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। পরিশেষে মহিষী বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ঐ চণ্ডালীকে নিয়োগ করিলেন। বৃক্ষও মন্ত্র ও ওষধিবলে পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল।

অনন্তর অশোক পাঁচ বৎসর বৌদ্ধসংসর্গে কালক্ষেপ করেন। তৎকালে তিনি মন্দর পর্ব্বত হইতে সপিণ্ডল ভরদ্বাজ নামা এক যতিকে স্বরাজ্য মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চম বৎসরান্তে আড়ম্বর সহকারে একটী ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে বিস্তর অন্ন বস্ত্র দান করেন।

এদিকে অশোকের পুত্র কুনালের বিবাহকাল উপস্থিত হইল। কুনাল কাঞ্চনমালা নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই অশোক কুনালকে বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন। কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রোহিদিগের অধিনায়ক। সে রাজকুমার কুনালের নিকট পরাস্ত হইল এবং দেশ মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি সংস্থাপিত হইল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একদা অশোক স্বপ্নযোগে দেখিলেন, যেন রাজকুমার কুনালের মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া দৈবজ্ঞদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। দৈবজ্ঞেরা কহিল রাজন্! এক্ষণে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা—প্রাণনাশ, সন্ন্যাসী হইয়া দেশত্যাগ বা অন্ধতা। শুনিয়া রাজা অশোক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তদবধি তিনি সমস্ত রাজকার্য্য কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন না।

তিষ্যরক্ষিতা নামে অশোকের আর এক মহিষী ছিলেন। তিনি কুনালের বিমাতা, তিনি রাজার স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্তই শুনিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া রাজকার্য্য সমস্ত স্বহস্তে লইলেন। তিনি কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ, আজ্ঞাদান এবং পত্রাদি স্বাক্ষর করিতেন। সপত্নীপুত্র বলিয়া কুনালের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। তিনি রাজকীয় মুদ্রায় পত্র অঙ্কিত করিয়া পাটলীপুত্র নগরে কুঞ্জরকর্ণকে এইরূপ লিখিলেন যে তুমি আমার আদেশ পাইবামাত্র রাজকুমারের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইবে। কুঞ্জরকর্ণ রাজমহিষীর পত্র পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং এক জন চাণ্ডালের সাহায্যে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল।

পরে রাজকুমার কুনাল অন্ধ হইয়া ভিক্ষুকবেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিলেন। একদা তিনি পর্য্যটন প্রসঙ্গে পাটলীপুত্রে উপস্থিত হন এবং রাত্রিকালে রাজার হস্তিশালায় আশ্রয় লন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর এবং জনপ্রাণী নিস্তব্ধ হইয়াছে, এই অবসরে রাজকুমার একাকী বংশীবাদন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা অশোক জাগরিত ছিলেন। তিনি বংশীরবে অত্যন্ত বিমোহিত হইলেন। পর দিন অশোক প্রাতঃকালে বংশীবাদককে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিলেন যে তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র কুনাল।

অনন্তর অশোক রাজকুমার কুনালকে এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুনাল তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া অশোক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং [illegible] [illegible] ছেদন করিবার নিমিত্ত [illegible], কিন্তু কুনাল [illegible]

তাঁহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শত্রুর প্রতি এইরূপ দয়া ও সদ্ভাব প্রদর্শন করাতে তাঁহার অবজ্ঞাও দূর হইল।

অনন্তর রাজ্যের কতকগুলি লোক রাজা অশোককে রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে একান্ত যত্নবান দেখিয়া বীতশোকের আশ্রয় লইল এবং যাহাতে রাজার বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধার হ্রাস হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিল। বীতশোক অশোককে পৈতৃক ধর্ম্মে আনিবার জন্য অনেক উপায় করিলেন, কিন্তু কোনটি বিশেষ ফলোপধায়ক হইল না। পরিশেষে রাজমন্ত্রী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং গোপনে বীতশোককে নানা রূপ প্রলোভন দেখাইলেন। অশোক বীতশোকের দুশ্চেষ্টার বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবার আজ্ঞা দিলেন। তখন রাজমন্ত্রী মধ্যস্থ হইয়া সপ্তাহকাল ক্ষমা চাহিলেন। ইত্যবসরে বীতশোকও পলায়ন পূর্ব্বক উপগুপ্তের আশ্রয় লইলেন এবং উপগুপ্তের শিষ্য গুণাকরের প্রসাদাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হইল না। ঐ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের একজন পরম শত্রু উদিত হয়। ঐ ব্যক্তি বুদ্ধের মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া আপনার পদতলে স্থাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের যথোচিত নিন্দাবাদ করিত। ক্রমশঃ এই ঘটনা পুণ্ড্রবর্দ্ধন দেশে অত্যন্ত প্রচার হইয়া উঠিল। তখন অশোক তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলেন এবং যে এই কার্য্য সমাধা করিবে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

একদা এক জন আভীর-ভ্রান্তিক্রমে বীতশোককে ধরিল এবং তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু ও জটাভার দেখিয়া তাঁহাকেই বুদ্ধভক্ত স্থির করিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। তখন অশোক বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপগুপ্তের নিকটে গিয়া ধর্ম্মোপদেশে দুঃখ শান্তি করিলেন।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

৪১৮ সংখ্যক পত্রিকার ৩৭ পৃষ্ঠার পর।

(৯৪)

যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাই ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমাকে কে বাধা দিতে পারিবে?

এপিক্‌টিটস্।

(৯৫)

ঈশ্বরের চক্ষে সুন্দর হইবার চেষ্টা কর। আপনার নিজের সন্নিধানে এবং ঈশ্বর সন্নিধানে পবিত্র হইবার ইচ্ছা কর।

ঐ।

(৯৬)

জগতের সকল কার্য্য নিয়মানুসারে হইতেছে। প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে। যখন তিনি বৃক্ষগণকে মুকুলিত হইতে বলেন তাহারা মুকুলিত হয় এবং যখন তাহাদিগকে ফল উৎপাদন করিতে বলেন তাহারা ফল উৎপাদন করে।

ঐ।

(৯৭)

মনুষ্য কি কেবল মত্ততা নিবন্ধন মৃত্যুভয়শূন্য হইতে পারে এবং জ্ঞান দ্বারা কি হইতে পারে না? এই জ্ঞান যে ঈশ্বর জগতের সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন এবং জগৎকে সমীচীন ও অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম-পরবশ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্তের জন্য অংশ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সেই অংশদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা সমস্তের হিতের জন্য আত্মার্পণ করে।

(৯৮)

কে সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে ? কে ফল সৃষ্টি করিয়াছেন ? কে ঋতু সকল সৃজন করিয়াছেন? কে উপযুক্তরূপে ও সর্ব্বসমঞ্জসীভূতরূপে সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন? সকল বস্তু এমন কি নিজ আপনাকে আর এক জনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া যদি তাঁহা দ্বারা একটী মাত্র বস্তু হইতে বঞ্চিত হও তাহা হইলে কি প্রদাতার প্রতি তোমার অসন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য ? তিনি কি তোমাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন নাই ? তিনি কি তোমাকে আলোক দেখান নাই? এবং জ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করেন নাই ?

ঐ।

(৯৯)

যদি কোন ব্যক্তি সম্যকরূপে এই তত্ত্ব জ্ঞাত থাকেন যে আমরা সকলেই ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি এবং জগতের প্রধান পদার্থ স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছি এবং ঈশ্বর উভয় মনুষ্য ও দেবতার পিতা তাহা হইলে কি তিনি আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান জানিয়া আপনাকে কখন নীচ মনে করিতে পারেন ?

ঐ।

(১০০)

ঈশ্বর এই জন্য মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন যে সে সুখী হউক এবং পিতার যেরূপ কর্ত্তব্য তাহা তিনি করিয়াছেন; যে সকল বস্তু আমাদিগের অধীন সেই সকল বস্তুতে আমাদিগের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত করিয়াছেন।

ঐ।

(১০১)

আমার উপর কোন মনুষ্যের ক্ষমতা নাই, আমি ঈশ্বর দ্বারা স্বাধীন সৃষ্ট হইয়াছি। আমি তাঁহার আদেশ জানিয়া তাঁহার দাস হইয়াছি। কেহ আমাকে দাস করিতে পারে না। আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিব যে আমি ঈশ্বরকে এই কথা বলিতে পারি আমি কি তোমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি? আমার মনোবৃত্তি এবং আমার মনের সাধারণ ভাব ও সূচনা সকলকে যেরূপ নিয়োগ করিতে হয় সেরূপ নিয়োগ না করিয়া তাহা অন্যরূপ কি নিয়োগ করিয়াছি ?

ঐ।

(১০২)

হে পরমাত্মন্! আমি কি কখন তোমার শাসন ও বিধানে অসন্তুষ্ট হইয়াছি? যখন তোমার ইচ্ছা যে আমি পীড়িত হই তখন আমি পীড়িত হইয়াছি। কিন্তু সন্তোষের সহিত হইয়াছি। আমি তোমার বিধান অনুসারে দরিদ্র হইয়াছি কিন্তু আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা হইয়াছি। আমি কখন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অন্য কোন উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর পদ ধারণ করি নাই যেহেতু তোমার তাহাতে ইচ্ছা ছিল না, এবং আমারও তাহাতে স্পৃহা ছিল না কিন্তু ইহার জন্য আমাকে কি কখন তুমি বিষণ্ণ দেখিয়াছ? আমি কখন কি তোমার সম্মুখে ম্লান-মুখে উপস্থিত হইয়াছি? তোমার ইচ্ছার জন্য আমি কি সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলাম না? তোমার কি ইচ্ছা যে এখন আমি এই সংসাররূপ উৎসব হইতে প্রস্থান করি? তাহা যদি হয় তাহা করিতে আমি এখনি প্রস্তুত আছি। হে পরমাত্মন্! তোমার সহিত এই উৎসবে সমভাগী হইয়াছি, তোমার কার্য্য দর্শন করিয়াছি, সংসারের যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছ তাহা দেখিয়াছি, আমার প্রতি যে এতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ তজ্জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এবং লিখিতে লিখিতে যেন মৃত্যু দ্বারা আমি আক্রান্ত হই।

ঐ।

ক্রমশঃ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত।)

এতাবৎ কাল প্রকৃত প্রস্তাবের কিপর্য্যন্ত মীমাংসা হইল, অগ্রে তাহার একটি চুম্বক প্রদর্শন করি, তাহার পর অবরোহ প্রণালীতে রীতিমত হস্তক্ষেপ করিব। প্রথম, আরোহ প্রণালী অনুসারে স্থূল ভূত-সঙ্ঘাত হইতে সূক্ষ্ম ভূতে উপনীত হইলাম; দ্বিতীয়, তাহাই যে চরম সূক্ষ্ম এমন নহে—সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম আছে এইরূপ স্থির করিলাম। কেননা ভৌতিক পদার্থ সহস্র-সূক্ষ্ম হইলেও তাহা আপেক্ষিক, তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে, এবং উভয়ই সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ-বিশেষকে অপেক্ষা করে। একটী মধ্যস্থ-পদার্থকে আমরা জানি যে, তাহা সূর্য্য হইতে প্রসারিত হইয়া বায়ুরাশি ভেদ করিয়া, পৃথিবীর জলস্থল ভেদ করিয়া তিষ্ঠিতেছে;—কে? না যেপদার্থের কম্পনদ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আলোক-বোধের উৎপত্তি হয়। আলোক-জনন সেই সূক্ষ্ম পদার্থে—সেই সূক্ষ্ম সূত্রে—সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলই গ্রথিত রহিয়াছে। ভারাকর্ষণই হউক, যোগাকর্ষণই হউক, চুম্বকাকর্ষণই হউক, সকলই ঐরূপ কোন না কোন সূক্ষ্ম মধ্যস্থ পদার্থকে অপেক্ষা করে। কেন-না আকর্ষণাধীন দুই দুই বস্তুর মধ্যে তৃতীয় কোন সূক্ষ্ম বস্তু না থাকিলে উক্ত বস্তুদ্বয়ের একটি হইতে অন্যটিতে আকর্ষণ-ক্রিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। এ বিষয়টি সাংখ্যদর্শনে অতি সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। পাঠকের উপকারার্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। "বল দেখি শক্তি পদার্থটি কি? স্বতন্ত্র? কি কাহারও অনুগত? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শক্তি, রূপ-প্রভৃতির ন্যায় সেই সেই বস্তুর অধীন অর্থাৎ গুণপদার্থ। গুণ, কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সঙ্গত হয় না সুতরাং শক্তিও আশ্রয়-চ্যুত হইয়া দূরে প্রস্থিত হয় না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে* ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তিক্ষেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরস্থ পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে? মনে কর; অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, জলের শৈত্য-গুণ আছে, পুষ্পের সৌরভ আছে, কিন্তু দাহিকা-শক্তি শৈত্য গুণ সৌরভ,ইহারা কি অগ্নি জল ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায়? কখনই না। তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ অনুভব করি দেখি, তাহা কেবল গুণ বা শক্তি নহে, সকলই আপন আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহযোগেই আইসে"। উপরে যাহা উদ্ধৃত করা হইল তাহার কিয়দংশ বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে প্রমাণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে নাই। তাপ-গুণ কেবল অগ্নিতে আছে জলেতে নাই এ কথা ঠিক নহে—কিন্তু তাহাতে আইসে যায় না। শূন্যকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া চলিতে পারে না, এটি সত্য কথা। বায়ু-পদার্থ অগ্নি পদার্থ হইতে (অর্থাৎ উত্তপ্ত এবং জলন্ত বস্তু যাহা কিছু তাহা হইতে) ভিন্ন বটে কিন্তু এত ভিন্ন নয় যে, অগ্নির তাপ-গুণ বায়ুতে সংক্রমিত হইতে পারে না। চাই মানো যে বায়ু অগ্নি জল স্থল সমুদায়ের ভিতর দিয়া তাপবাহক কোন একটি সূক্ষ্ম মধ্যস্থ বস্তু বিস্তৃত রহিয়াছে, চাই মানো যে, জল স্থল বায়ু পরস্পর এরূপ ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া আছে যে, একের উত্তাপ অপরে সংক্রমিত হইতে পারে—যাহাই মানো না কেন—ইহা সুনিশ্চিত যে, শূন্য আশ্রয় করিয়া গতি, ক্রিয়া, শক্তি, গুণ, ইহার কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব আকর্ষণাধীন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ-ক্রিয়ার একটা সঞ্চার ভূমি বর্ত্তমান থাকা চাই, সূক্ষ্ম মধ্যস্থ একটি বর্ত্তমান থাকা চাই, আবার সেই সূক্ষ্ম মধ্যস্থটি যদি ভৌতিক পদার্থ হয়,তবে তাহারও পরমাণুগণের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে মানিতে হয়, সুতরাং সেই আকর্ষণ ক্রিয়া-বাহক সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ-একটি তাহারও মূলে বর্ত্তমান থাকা চাই।

সকল ভৌতিক বস্তুই ছিদ্রালু (porous); পরমাণু-গণ পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আছে সত্য কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া নাই; তাহাদের মধ্যে একটু না একটু ব্যবধান আছেই আছে। বল-পূর্ব্বক সেই ব্যবধান কমাইতে গেলেই বিক্ষেপ-শক্তি তাহার

* চলিত ভাষায় আমরা কেবল দ্রব্যকেই পদার্থ বলিয়া থাকি কিন্তু বৈশেষিক ভাষায় দ্রব্য গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির প্রত্যেকেই পদার্থ; এমন কি অভাবকেও পদার্থের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

* শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত সাংখ্য দর্শন।

প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভৌতিক-বস্তুর ছিদ্র-সকল আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ-শক্তির বাহক কোন না কোন সূক্ষ্ম মধ্যস্থ দ্বারা পরিপূরিত ইহাতে আর ভুল নাই। এবং সেই সূক্ষ্ম বস্তুর ছিদ্র সকলও সূক্ষ্মতর বস্তু দ্বারা পরিপূরিত। মনে কর যেন ঐরূপ করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন এক উচ্চ সোপানে উপনীত হইয়াছ; কিন্তু তাহা যদি ভৌতিক বস্তু হয়, তবে তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে এবং উভয়ই মধ্যস্থ বিশেষকে অপেক্ষা করে;—ইহার উপরে যখন কোন কথা নাই তখন সে বস্তুকেও আপেক্ষিক বলিয়া মানিতে হইতেছে। কিন্তু যদি কোন বস্তুকে এত সূক্ষ্ম মনে কর যে তাহার ছিদ্র নাই, পরমাণু নাই, আবরণ নাই, তবে তাহা আর ভৌতিক বস্তু রহিল না, তাহা আপেক্ষিক বস্তুও রহিল না, তাহা অখণ্ড এবং স্বয়ংসিদ্ধ। আপেক্ষিক বস্তু স্বতঃ থাকিতে পারে না, নিরালম্ব বস্তুর আশ্রয়ে তাহাকে থাকিতেই হইবে। যাহা নিরালম্ব তাহার অংশ ছিদ্র বা আবরণ কিছুই থাকিতে পারে না। কেননা যাহার অংশ আছে তাহা যোজক-সত্তকে অপেক্ষা করে, যাহার আবরণ আছে তাহা আবরণকারী বস্তুকে অপেক্ষা করে, যাহার ছিদ্র আছে তাহা ব্যবধানকারী বস্তুকে অপেক্ষা করে। দ্বিতীয় কোন কিছুকেই অপেক্ষা করে না যে তাহাকেই আমরা নিরালম্ব বলি, সুতরাং তাহা নিরংশ অনুপহিত এবং নীরন্ধ্র। অতএব ইহা স্থির হইল যে ভৌতিক জগৎ, অংশ আবরণ এবং ছিদ্র বিহীন এক নিরালম্ব বস্তুকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জীবাত্মাও অখণ্ড অর্থাৎ নিরংশ কিন্তু তাহার আবরণ আছে—সীমা আছে—তাহা আপেক্ষিক সত্য—এটি যেন মনে থাকে। অনুপহিত অখণ্ড বস্তু এবং আপেক্ষিক বস্তু উভয়ের মধ্যে যে কি প্রভেদ তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই,—আপেক্ষিক বস্তুতে সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে সত্যই কেবল আছে সত্যের অভাব অণুমাত্রও নাই; অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে কোন প্রকার অভাবাত্মক উপাধি মূলেই বর্ত্তিতে পারে না, সে বস্তু পরিপূর্ণ সত্য। দেহাদি উপহিত অখণ্ড বস্তু যে জীবাত্মা, তিনি জড় অপেক্ষা সত্যপূর্ণ, নিরালম্ব অখণ্ড বস্তু জীবাত্মা অপেক্ষাও অসীম গুণে সত্যপূর্ণ ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি এই জন্য তিনি আত্মারও আত্মা পরমাত্মা শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। জড় বস্তু অপেক্ষা আত্মার সহিত তাঁহার অধিক সাদৃশ্য-বোধে আমরা তাঁহাকে বস্তু না বলিয়া—বলি তিনি পূর্ণ পুরুষ। কেননা পুরুষ শব্দে কেবল যে বস্তু বুঝায় এমন নহে, কিন্তু জড় অপেক্ষা দ্বিগুণ সত্যশালী, সুতরাং পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী উচ্চ মূল্যের বস্তু বুঝায়— আত্মা বুঝায়।

পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত; এক্ষণে অবরোহ প্রণালী দোহন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকরণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় তাহাই প্রদর্শন করি।

কম্‌টি বলেন আপেক্ষিক লইয়াই যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন, তাহার ও-দিকে আর কিছু থাকে থাকুক্, না থাকে না থাকুক্, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। স্পেন্সর বলেন যে, আপেক্ষিক সত্যের মূলে অসীম নিরালম্ব সত্য আছে, ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে। স্পেন্সরের উপর আর একটু অধিক আমরা এই বলিতে চাই যে, অসীম সত্য আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহেন তথাপি আমরা যেমন তাঁহার অস্তিত্ব ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তেমনি আমরা আর একটি বিষয়েরও সন্ধান পাইতে পারি;—কি? না আত্মা হইতে জড়ের দিক্ অসীম সত্যের দিক্ নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত দিক্ যে, জড় হইতে আত্মার দিক্ তাহাই অসীম সত্যের দিক্। আমরা গম্য স্থানের অন্ত না পাই—দিক্‌নির্ণয় করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি। আরোহ অবরোহ যেমন দুই প্রণালী জড় হইতে আত্মা এবং আত্মা হইতে জড় তেমনি দুই-দিক্। পূর্ব্বোক্ত দিক্‌ই অসীম সত্যের দিক্। ইহার প্রমাণ যাহা কারান্তরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আপেক্ষিক সত্য যত কিছু তাবতের মূলে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ অসীম নিরবলম্ব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বর্ত্তমান। পরমাত্মার সহিত জগৎ সৃষ্টির কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই এক্ষণে নিরূপণ করা যাইতেছে।

আরোহ-প্রণালী [illegible] যায় ততই জগতের আদিম [illegible] উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। সে ভাব ভেদরাহিত্য। জলে স্থলে বায়ুতে অগ্নিতে যে প্রভেদ তাঁহা আধুনিক। জগতের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বত্রই একাকার ভাব ছিল। সেরূপ একাকার ভাব সৃষ্টি অভি-ব্যক্তির পূর্ব্ব-ভাব, কেননা ভিন্নতা না থাকিলে বিশেষ কোন কিছুর অভিব্যক্তি হইতে পারে না। শ্বেত বর্ণ কাগজে ভিন্ন-বর্ণের অক্ষরই ফুটে শ্বেত বর্ণের অক্ষর ফুটে না। অভিব্যক্তির পক্ষে ভিন্নতাও যেমন চাই সমতাও তেমনি চাই। যদি সমান কালো বর্ণ বা অন্য কোন বর্ণ এক ঠাঁই জোড়াগাঁথা না হয় তাহা হইলেও তাহার অভিব্যক্তি সম্ভবে না। শ্বেতবর্ণ হইতে, ভিন্ন কেবল নয় কিছু, সমভিন্ন (অর্থাৎ সমান মাত্রায় ভিন্ন) বর্ণ-নিচয়ের সমষ্টি ব্যতিরেকে, শ্বেত নয় এমন কোনও বর্ণের অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ক—খ এই রেখা যদি আত্যন্তিক ক্ষুদ্র হয় তবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। সম-কৃষ্ণবর্ণ কিয়দংশ স্থানে পুঞ্জীভূত না হইলে কৃষ্ণবর্ণ ক—খ রেখা ব্যক্ত হইতে পারে না। সঙ্গীতের সা রে গা মা কাহারো অবিদিত নাই;—কতক মাত্রা সময় ব্যাপিয়া সা উচ্চারণ করিলে তবে তাহা স্বর-বিশেষ বলিয়া প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে যেরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছিল অথবা নিঃশব্দতা অনুভূত হইতেছিল তাহা হইতে সমভিন্ন (সমান মাত্রায় ভিন্ন) স্বর বিশেষের সমষ্টি হইতে (যথা সা আ আ আ ইহার সমষ্টি হইতে) সা এই স্বর উৎপন্ন হয়। অত এব বিশেষ কোন কিছুর প্রকাশের জন্য প্রথম চাই ভিন্নতা, পরে চাই সমান-মাত্রায় ভিন্ন অনেকের সমতা। পরে চাই সেই সমভিন্ন অনেকের সমষ্টি এই তিনটি না হইলেই নয়।

সর্ব্বাদিম অব্যক্ত একাকার ভাব—সৃষ্টির পূর্ব্ব-ভাব—কিরূপ? প্রকাশ পাইতেছে এ ভাব নহে—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইতে পারে এই ভাবই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্ব-ভাব। অত জটিলতায় কাজ কি—শুদ্ধ কেবল দিক্ উল্টাইলেই পাওয়া যায় যে, আপেক্ষিক সত্যের সম্বন্ধে মূল সত্য যখন অদ্বৈত পূর্ণ এবং নিরবলম্ব স্বতন্ত্র, তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ [illegible] বিভিন্ন অপূর্ণ এবং [illegible] হইবেই ত।

[illegible] গম্ভীর তত উৎকৃষ্ট তাহার আবির্ভাব [illegible]। [illegible] যেরূপ অন্তঃস্পর্শ "গভীর রচনা" তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্ত-কাল ব্যাপী। কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এককালেই প্রকাশ করিতে যান, তাহা হইলে সে ভাব ভাব মাত্রই রহিয়া যায়, আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। কবি আপনার মনের ভাব আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়। প্রকাশ হইয়াছে, অপ্রকাশ রহিয়াছে, এবং অপ্রকাশের মধ্য হইতে প্রকাশ হইবার উপক্রম হইতেছে, এই তিন অবস্থার উপর ভর করিয়া সমুদায় প্রকৃতি গম্যপথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় সাংখ্যদর্শন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগতের মূল উপাদান তিনটি মাত্র—একটি প্রকাশক, আর একটি প্রকাশের বাধাজনক, আর একটি চালক। প্রকাশক যেটি তাহার নাম সত্ত্ব গুণ, বাধক যেটি তাহার নাম তমোগুণ, চালক যেটি (অর্থাৎ প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে লইয়া যায় যেটি) তাহার নাম রজোগুণ। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে সাংখ্য দর্শন চলিত-অর্থেই গুণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে; গুণ-শব্দে আত্মার বন্ধন বুঝিতে হইবে ইহাই সাংখ্যদর্শনের অভিমত। প্রকাশ-ধর্ম্মী চলত্ব-ধর্ম্মী এবং আবরণ-ধর্ম্মী বস্তুত্রয়ই গুণত্রয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ মূল-বস্তু-তিনটির সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। বৈষম্যাবস্থাই জগৎ।

বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক আলোকচ্ছটা সাতটি উপচ্ছটার সাম্যাবস্থা। সেই সাতটির মধ্যে তিনটি বিশুদ্ধ, তদ্ব্যতীত আর যে চারিটি তাহাদের প্রত্যেকে উক্ত তিনটির ভিতরকার কোন একটিরও সহিত অপর কোনটীর সম্মিশ্র-বিশেষ। অতএব সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক আলোকচ্ছটা ঐ বিশুদ্ধ উপচ্ছটা তিনটির সাম্যাবস্থা। তিনটির মধ্যে একটি রক্ত বর্ণ, একটি পীতবর্ণ, অপরটি নীলবর্ণ। পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্য-বিধ উজ্জ্বল, নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল।

পীতবর্ণকে মনে কর সত্ত্বগুণ, রক্তবর্ণকে রজোগুণ, নীলবর্ণকে তমোগুণ।

ন্যূনাধিক মাত্রায় তিন মূল বর্ণের সম্মিশ্র হইতে আর আর সমুদায় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি

জাত বস্তু সকলকে মনে কর যেন সেই মিশ্রবর্ণ। প্রকৃতিজাত বস্তু মাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সত্ত্বরজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের সম্মিশ্র। সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরতা বাদ দিয়া তাহার উপরি উক্ত মত যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এই রূপ দাঁড়ায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুল-বিচিত্র মিশ্র বস্তু সমুদায়, কিম্বা তাহাদের মূল-গত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই আদি-বস্তু-তিনটি সাম্যাবস্থায় অবস্থিত ছিল—মূল প্রকৃতি রূপে ঈশ্বরের শক্তিতে তন্ময়ীভূত ছিল—তাহাদের বহুত্ব একত্বে কেন্দ্রীভূত ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃতি ত্রিগুণ সাম্য হইতে ত্রিগুণ বৈষম্যে পরিণত হইয়া—অব্যক্ত ছিল ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইল।

আলোকের উপমা এখনো শেষ হয় নাই। আলোকের উপচ্ছটা-তিনটির মধ্যে পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্যবিধ উজ্জ্বল, এবং নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল। ইহার ভাষান্তর এই যে, মূল যে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা—পীতবর্ণে তাহার সাদৃশ্য রক্তবর্ণে তাহার অপভ্রংশ এবং নীলবর্ণে তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এ যেমন তেমনি বলা যাইতে পারে যে, সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ-আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। অতএব ঈশ্বরের নিকট সাদৃশ্য দুঃসাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যই গুণ-ত্রয়-ভেদের পরিমাপক। তাৎপর্য্য এই যে, ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশক, বাধক, এবং সংক্রামক তিন প্রকার বস্তুই জগতে আছে ইহার কারণ এই যে ভিন্নতা না থাকিলে কোন কিছুর অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর যদি সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ হন, তবে তিনি ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ঈশ্বরের সে স্বপ্রকাশ ভাব ত আছেই, তদ্ভিন্ন আর একটি যে প্রকাশ—জগৎ-প্রকাশ—তাহাও তাঁহারই প্রকাশ কিন্তু তাহা বাধা-যুক্ত প্রকাশ;—তাহা তাঁহার স্বরূপ ভাব নহে তাহা আবির্ভাব, কেননা তাহাতে তাঁহার প্রকাশও আছে, প্রকাশের বাধাও আছে সুতরাং প্রকাশক, বাধক, এবং দুয়ের মধ্যস্থ এই তিনের সংঘাত ভিন্ন জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না।

ক্রমশঃ

EXTRACT FROM A LETTER OF PROFESSOR R. G. BHANDARKAR OF BOMBAY DATED THE 16TH APRIL, 1878.

"ON returning home late in the evening yesterday, I was agreeably surprised when your letter and the valuable pamphlets that accompanied it were put into my hands. The leading members of the Prarthana Samaj fully sympathize with the views and principles of the Adi Brahmo Samaj but unfortunately there has not been much communication between us. * * * * * * * * * * Yes, I agree with you in thinking that Hindooism is at bottom an elevating monotheism and, under Hinduism, I include the doctrines of sects that have obtained a footing in the country. Amidst the apparent polytheism of the older portion of the Vedas, a belief in a Supreme Power, fashioning and controlling the universe and swaying the destinies of man, is plainly observable, whether it be attributed to Agni at one time, to Varuna at another, or to Indra at a third, according to the predilection of the worshipper. The thought of this period culminated in the Upanishads which gave us the One God (with the names Indra, Varuna &c dropped) in his immensity or infinitude reigning over the universe in ineffable sweetness, the source of all light, life, and joy; and raised the contemplative devotee above the littlenesses of this world, and made him a partaker of his joy—a joy that "words can not express and the mind cannot comprehend." যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে. But the Upanishads took their stand upon a very high ground and did not take into account the infirmities of ordinary mortals. Hence arose the Itihases and the Puranas and the exquisite Bhagabad-Gita which brings the Infinite Sovereign of the Universe nearer to us and make him our father and deliverer whether it be Siva or Vishnu, Rama or Krishna to whom according to the inclination of the Bhakta, these attributes are assigned. This in brief is, I believe, the history of Indian religious thought; and our Sanskrit and Vernacular literatures teem with sentiments that are noble and not only will not yield place to the sacred scriptures of other countries but will successfully claim decided su-

periority over them. Then again certain nations give prominence to certain religious sentiments. The monotheism of Christianity Mahomedanism, Hinduism have all such peculiarities. For instance, perfect control of the passions or universal sympathy (দয়া, ক্ষমা শান্তি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মানি) are ideas that the Hindoo religious heart loves devotedly. Mahomedanism and, to a certain extent, Christianity not only do not shew much care for them but would enjoin or allow severity or even cruelty to get the sovereignty of God acknowledged. Toleration is the natural outcome of the Hindu idea, persecution and impatience of the Christian and the Mahomedan. Christianity deals almost exclusively with sin and promises freedom from it as its *Moksha*, and mostly by means of faith alone. Hinduism takes in the ideas of man's ignorance, littleness and misery also and promises not only purity but knowledge, greatness, joy and happiness as its *Moksha* and requires faith as well as individual effort (নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সচ্চিদানন্দ) You will thus see that we agree with you in thinking that our duty consists in proclaiming the monotheism that underlies the religion of the Hindus and to give prominence to those ideas that have a charm for the Hindu heart. If we insist on such ideas only as foreign religions lay stress upon, we shall fail to make an impression on the Hindus, and our own hearts which, notwithstanding the coating of European culture it has received, we shall, in the end, find to be Hindu, will be dissatisfied. Mine at any rate is dissatisfied with the gloomy tone consequent on the exclusive prominence given to the idea of sin which pervades Christianity, and which some of our Brahmos try or tried to reproduce. So also should our mode of propagation be in keeping with our antecedents. Hence our *Kirtans* and *Purans*. I am so deeply sensible of the sterling character of the religious instruction derivable from Hindu literature and of the suitability of Hindu ideas to the Hindu religious craving that in my sermons I take Hindu texts, and treat them in a Hindu style so far as possible. Our great want here is a person who could devote his whole time to the furtherance of the movement. We have all our own proper work."

নূতন পত্রিকা।

সাধারণে অবগত আছেন অনেকগুলি ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মশ্রেণী সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদী নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "তত্ত্ব" শব্দ এবং রামমোহন রায়ের প্রকাশিত কৌমুদী পত্রিকার নাম দুই একত্র করিয়া আপনাদিগের প্রকাশিত পত্রিকার নামকরণ করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় পত্রিকা যতই প্রকাশিত হয় ততই আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়, অতএব আমাদিগের অভিনব সহযোগীর অভ্যুদয় আমরা অন্তরের সহিত অভিনন্দন করিতেছি। তিনি কেবল ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মত প্রচার করিলে অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই। এবার তত্ত্বকৌমুদীতে যেমন বিবাদ বিসম্বাদের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে ভরসা করি সহযোগী সেইরূপ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে প্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী ধর্ম্ম-জগতের উপর বর্ষণ করিয়া লোকের প্রাণ মন শীতল করিবেন। "নিগূঢ় প্রেম শিরস্ক" প্রস্তাবটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে. তাহা হইতে আমরা একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"উপাস্য দেবতার প্রতি নিগূঢ় প্রেম অন্তরে উদয় হইলে, উপাসকের হৃদয় একটী নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রেমের যে সমস্ত লক্ষণ সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে সে অবস্থা তাহার অতীত। সে অবস্থা এই যে, সাধক তাঁহার অন্তরস্থিত প্রেমকে গোপন করিতে অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হন। তিনি তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় দেশে তাঁহার সঙ্গে গোপনে মিলিত হইতে চান। তিনি লোকের চক্ষুকে ভয় করেন, সুতরাং সে চক্ষুর অন্তরালে গিয়া তাঁহার সত্য শিব সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রিয়-জন-সমাগম-সুখ অনুভব করেন। তিনি সে ভাব কেন যত্নে গোপন

করিতে ভাল বাসেন, কেন লোকের চক্ষুকে ভয় করেন? এ প্রশ্নের গূঢ় কারণ আছে। তিনি এজন্য ভয় করেন না, যে, লোকে তাঁহাকে উৎপীড়িত করিবে। নির্য্যাতন, ভয় প্রকৃত সাধকের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি এজন্য তাঁহার অন্তরের ভাব গোপন করেন না যে, লোকে সে ভাবের আভাস না পাইয়া তাহার সুধাস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকে। এরূপ সঙ্কীর্ণতা প্রেমিক হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। তাঁহার ভয়ের ও হৃদয়ভাব গোপনের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহা এই জন্য পাছে অপ্রেমিক নিষ্ঠুর সংসার তাঁহার সেই নিগূঢ় ভাবের জন্য, তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম পদার্থকে উপহাস ও বিদ্রুপের বিষয় করিয়া ফেলে। তিনি লোকের সহস্র অপমান ও নির্য্যাতন অনায়াসে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সহ্য করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার প্রাণের প্রিয়তমের প্রতি লোকে যে একটী উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিবে, তাঁহার অন্তর প্রদেশে প্রতিনিয়ত যে প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে লোকে তাহাকে যে বিদ্রুপের বিষয় করিয়া তুলিবে, তাহা তিনি কখনই সহ্য করিতে সক্ষম নহেন। তিনি বিদ্রূপ ও উপহাস পরায়ণ সংসারের সম্মুখে তাঁহার প্রিয় সুহৃদের প্রিয়তম নামটীও প্রকাশ করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হন। তিনি হয়ত এক সময়ে নির্ভীক চিত্তে তাঁহার উপাস্য দেবতার মহান নাম শঙ্খধ্বনিতে প্রচার করিয়া দুরন্ত সংসারকে পরাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার হৃদয়ে ভাবের সেই উত্তাল তরঙ্গ প্রশমিত ও ঘনীভূত হইয়া নিগূঢ় প্রেমের আকার ধারণ করিল, তখনি তাঁহার অন্তরাকাশে লজ্জা, ভয় গোপনেচ্ছা প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া সেখানে যুগান্তর উপস্থিত করিল। তাঁহার মুখে আর কথা নাই। সংসার যতদূর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে শিখিয়াছে তিনি ততদূর পর্য্যন্ত আত্ম প্রকাশ করিতে কখনই সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু তাঁহার ভিতরের কথা তাঁহার সমহৃদয় দুই একটী বন্ধু বান্ধব ভিন্ন আর কেহ শুনিতে পান না। বাহিরের লোকে মনে করিতে পারে যে, ইঁহার ভাবের স্রোত বন্ধ হইয়াছে; কেন না, তাহারা তাঁহার নিকট যে সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে তাহা তাদৃশ সতেজ ও জীবন্ত নহে। তিনি যখন ইহাদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করেন তখন সেই অগাধ প্রেম সমুদ্রের যে গভীর স্থানে তিনি নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন, সেখানে থাকিয়া তিনি ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে অসমর্থ সুতরাং তাঁহাকে অনেক দূর উপরে ভাসিয়া উঠিয়া ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়, স্বস্থান-ভ্রষ্ট না হইয়া তিনি বাহিরের লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন না। কিন্তু সেখানে তাঁহার অন্তরের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না। লোকে কেনমা মনে করিবে তাঁহার ভাবের স্রোত বন্ধ হইয়াছে? লোকে বাহির হইতে যেরূপ দৃষ্টিগোচর করে তদনুসারেই বিচার করিয়া থাকে। নিগূঢ় প্রেমিকের প্রচার-ক্ষেত্র সুতরাং তাদৃশ বিস্তৃত হইতে পারে না। তিনি যতই প্রেমের অগাধ সাগরে প্রবিষ্ট হন ততই তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া যায়। তিনি মনের কথা ব্যক্ত করিবার জন্য দুই একটি লোক অন্বেষণ করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে যদি কখন প্রাপ্ত হন প্রাণের দ্বার খুলিয়া, আপনিও কৃতার্থ হন অন্যকেও কৃতার্থ করেন।"

পত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদককে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে একটি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা ঈশ্বরাদেশ বিষয়ে যাহা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম তদ্দারা তাহা বিলক্ষণ পোষকতা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রচারক মহাশয়ের সরলোক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ব্রাহ্ম মাত্রেই ঈশ্বরের আদেশে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। সহজ জ্ঞান, এবং বিবেক কর্ণে পরমেশ্বর যে আদেশ করেন তাহাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। আদেশ সম্বন্ধে চিরকালই আমাদিগের এক প্রকার মত। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করাকে আমরা জঘন্য পাপ এবং ঈশ্বরের অপমান মনে করি।

আবদুল্লা, জজ্ নর্ম্মাণ্‌সাহেবকে বধ করিয়া বলিয়াছিল যে, সে খোদার হুকুমে কাফেরের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। মহম্মদ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে যাহারা কোরানে বিশ্বাস না করিবে তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা বধ কর, ইহা ঈশ্বরের আদেশ। আমাদিগের দেশের প্রাচীন দস্যুগণ তাহাদিগের উপাস্য দেবতা কালীর আদেশে অনেক নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত।

* * * * * *

* * * * * *

পাপকার্য্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি [illegible]

প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তিনি কি, নিজের দোষ উপাস্য দেবতার উপরে স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না।

ঈশ্বরের আদেশ ব্রাহ্মদিগের কর্ম্মশাস্ত্র, তাহা তাঁহারা কোন কালে অস্বীকার করিতে পারেন না, যথার্থ ঈশ্বরাদেশকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি।

ঈশ্বর নিত্য, পবিত্র, অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্ত্তনীয় হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং পরিবর্ত্তনীয় বলিলে আমরা ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।"

আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম পবলিক্ ওপিনিয়ন।

গত ৬ই জুনের ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন নামক সম্বাদপত্রে লিখিত হইয়াছে।

"No one could have more painfully, or by the teaching of more bitter actual experience, learnt the necessity of a proper trust-deed for the Mandir than Mr. Sen himself. He and his friends had belonged to the Adi Brahmo Somaj and worked zealously on its behalf, never dreaming that the Somaj could in one moment be removed from the control of the worshippers or the general Brahmo Community. And yet when the hour of trial came, and there happened to be a difference of opinion between Babu D. N. Tagore and those members of the Somaj who were its active workers, the latter found themselves ignominiously turned out and the Somaj with all its belongings taken possession of by Mr. Tagore, simply because no control over it was given by any deed to the Brahmo Public. With this painful experience fresh in his mind, with this legal assertion of arbitrary individual authority over the moral rights of the community and its deplorable results but recently enacted before him, one would have naturally expected Mr. Sen to be *Especially* on the guard against a possible repetition of the same scene. One would have thought that he would feel a burning desire to take every imaginable precaution to secure the rights of the Brahmo Community over the building being raised by public subscription."

ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য এই যে রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ কেবল ব্রাহ্মদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, না হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান যে কেহ ঈশ্বরোপাসনার অভিলাষী হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন? রামমোহন রায় যখন ঐ গৃহ প্রস্তুত করেন তখন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হয় নাই অতএব প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মসাধারণকে ঐ গৃহের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিলেন সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তি নিতান্ত অমূলক ও অসঙ্গত।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ।৶০ বর্ত্তমান বৎসরের আশ্বিন মাসের মধ্যে অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৷৷০ টাকা গৃহীত হইবে।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট গত বৎসরের ও তাহার পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

আগামী ৩ আষাঢ় রবিবার প্রাতে ৭ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৩ রা আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের আলোচনা সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন অতএব ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ শ্যামবাজার নন্দন বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহী করিবেন।

শ্রীনন্দলাল মিত্র
সম্পাদক।

অশুদ্ধ সংশোধন।

গতবারের পত্রিকার ২৫পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২৬ পংক্তিতে "বিচিত্রশক্তিং পুরুষং পুরাণং" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে "বিচিত্র শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" হইবে।

আয় ব্যয়

চৈত্র ১৭৯৯ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৪০৬৷৷০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৮২ (৫
সমষ্টি		৫৮৮৷৷৫
ব্যয়	... ...	৪২০৷৷১৫
স্থিত	... ...	১৬৭৸৵১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৭৬৸৴০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	... ...	৯১ /১০
পুস্তকালয়	... ...	১৩৸১০
যন্ত্রালয়	... ...	২০৭
গচ্ছিত	... ...	১৬৷৷৴০
সমষ্টি	... ...	৪০৬৷৷০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৫৫ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	... ...	৬৯৶০
পুস্তকালয়	... ...	১৮ (১০
যন্ত্রালয়	... ...	২৫৮।৴০
গচ্ছিত	... ...	১৯৸১০
সমষ্টি	... ...	৪২০৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	... ...	২১
,, প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরের দান	... ...	১৭
,, হরিমোহন রায়	... ...	১০
,, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	... ...	৪
,, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	... ...	২
,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	... ...	১
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	... ...	১
,, তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য	... ...	১
		৬৭
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়		৫৸৴০
		[illegible]
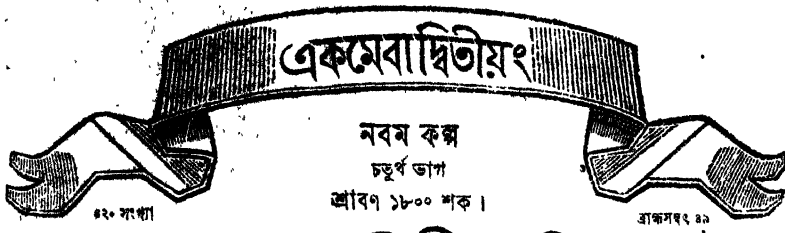
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৪। কলিকাতা [illegible]

Registerd No. 82.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প

চতুর্থ ভাগ

শ্রাবণ ১৮০০ শক।

৪২০ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর ষড়-বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় ১৮০০ শক।

ভূমণ্ডলে মনুষ্যজাতি যে অবস্থায় অবস্থান করুক, মুক্তির জন্য নর-নারীকে সকল অবস্থাতেই লালায়িত দেখা যায়। মনুষ্য, সুখ ঐশ্বর্য্যের উচ্চতর সীমাতেই উপনীত হউক, আর জ্ঞান-বিজ্ঞান-মঞ্চের উন্নততম শিখরেই আরোহণ করুক সর্ব্বকালে এবং জনসমাজের সর্ব্বাবস্থাতেই মনুষ্য যে মুক্তি-লাভের জন্য যত্ন চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। মুক্তি-ইচ্ছা মানব আত্মার এমনই প্রকৃতিগত কার্য্য, যে জনসমাজের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও বিপ্লাবনেও তাহা বিপর্য্যস্ত হয় নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহোন্নতি সাধন নিবন্ধন পৃথিবীর স্থানবিশেষে মনুষ্যের বেশ-বিন্যাস, আহার ব্যবহার, রুচি প্রবৃত্তির কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু আত্ম প্রকৃতি কিছুতেই ভিন্নভাব ধারণ করে নাই। মনুষ্য সেই অসভ্য অবস্থাতে বল্কল চর্ম্ম বা কৌপীন ধারণ করিয়া বিনীত ভাবে স্বীয় উপাস্য দেবতার সন্নিধানে যেমন মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছে, তেমনি বর্ত্তমানে নানা ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নানা প্রকার প্রতাপ প্রভুত্বের অভ্যন্তরেও মনুষ্য আপনাকে বন্দী জানিয়া দীনভাবে ঈশ্বর-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে। এই মুক্তি-কামনাতেই মনুষ্যের সৃষ্ট আশ্রিত ক্ষুদ্র ও বদ্ধভাব প্রকাশ পাইতেছে। এই অপ্রতিহত মুক্তি-লাভ-ইচ্ছাই, মনুষ্যকে ইতর প্রাণি-রাজ্য হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমে দেবলোক—পুণ্য লোকের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। এই মুক্তি-লালসাই আত্মার জ্ঞানকে প্রশস্ত, প্রীতিকে পরিশুদ্ধ এবং মঙ্গলভাবের আকার আয়তনকে বর্দ্ধিত করিয়াদিতেছে। এই মর্ত্ত্যলোকেই তাহাকে দেবদুর্লভ ব্রহ্মামৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ করিতেছে। সেই মুক্তি কি? বন্ধন-মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। মুক্ত ভাবই মানব আত্মার যারপর নাই প্রার্থনীয়। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে পশুপক্ষী প্রভৃতি, কেহই বদ্ধ থাকিতে চাহে না। যদিও তাহারদের জীবনকাল অত্যল্প, যদিও তাহারদের আহার-বিহার প্রভৃতি নিকৃষ্ট সুখই সর্ব্বস্ব তথাচ যে

কয়েক দিন জীবিত থাকে মুক্ত ভাবে বিচরণ করাই তাহারদের ইচ্ছা। তাহাতেই তাহারদের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য সুখ-স্বচ্ছন্দতা স্ফূর্ত্তি-উদ্যম বর্দ্ধিত হয়। তাহারদিগকে বদ্ধ রাখিয়া যদি বিবিধ সুস্বাদ ভোজ্যপান প্রতি-নিয়ত প্রদান করা যায়, তাহা হইলেও তাহারা সুখী হইতে পারে না। পশুপ্রধান সিংহ হস্তী প্রভৃতিকে লোকে পিঞ্জর বা শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া কত যত্নে প্রতিপালন করে, গুহা অরণ্য হইতে কত উৎকৃষ্টতর স্থানে রক্ষা করে, সেবা শুশ্রূষা জন্য কত অর্থই ব্যয় করিয়া থাকে, কিন্তু সেই বন্ধনকাল হইতেই তাহারদের যে স্বাভাবিক শোভা সৌন্দর্য্য উদ্যম স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া যায়, আর কিছুতেই তাহারা সেই পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতে পারে না। সর্ব্বদাই অবসন্ন ও ম্রিয়মান হইয়া থাকে।

পক্ষী যখন মুক্ত-বায়ুতে বিচরণ করে, তখন তাহার অন্নপান আহরণের জন্য প্রতি বারেই অবতরণ করিতে হয়, দশ বার চেষ্টা করিলে হয় তো এক বার এক বিন্দু খাদ্য লাভ করে। কিন্তু তাহাতেই তাহার কত স্ফূর্ত্তি। তাহাতেই তাহার কেমন শ্রীলাবণ্য! তাহার এক একটী অন্তস্ফূর্ত্ত আনন্দ-রবে বিশাল অরণ্য পর্য্যন্ত আমোদিত হয়। তাহার প্রাতঃকালের সংগীত-আলাপে নিদ্রিত মনুষ্য পর্য্যন্ত জাগ্রত হইয়া উঠে; ভাবুকগণের হৃদয়-ভাণ্ডারে কত নবতর ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। তাহাকে পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া পালন কর, সে ভাব আর দৃষ্টিগোচর হইবে না।

মুক্তভাব এমনই প্রকৃতি-মূলক যে সুখ-স্বচ্ছন্দে পালন করিলেও সিংহ হস্তী বন্ধন-চ্ছেদ করিবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট। স্বর্ণ-পিঞ্জরে রাখিলেও পক্ষী, শৃঙ্খল উন্মোচনের নিমিত্ত সততই যত্নবান। কয়েক দিনের জন্য, কেবল নিকৃষ্ট সুখই যাহাদের একমাত্র উপভোগ্য,মুক্ত হইবার জন্য যখন তাহারদেরই এত যত্ন চেষ্টা, উদ্‌যোগ উদ্যম, তখন জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত অনন্ত-কাল-বিহারী অমর আত্মার পক্ষে মুক্তি কতদূর প্রার্থনীয়! পশু-পক্ষীর ন্যায় নিকৃষ্ট সুখই যাহার চিরসেব্য নহে, অনন্ত বিশ্বের তুলনায় একবিন্দু পৃথিবী যাহার চির-বিহার-ভূমি নহে, ইতর প্রাণীর ন্যায় দুই দশ না হয় শতবৎসরও যাহার জীবনকাল নহে, সেই চিরজীবি অমর আত্মার পক্ষে বদ্ধভাব যে কত ক্লেশকর, কত শোকাবহ এবং শোচনীয় তাহা বাক্যে বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না। অতএব মুক্তিভিন্ন মানব আত্মার সুখ স্বচ্ছন্দতা, শিক্ষা সাধন, জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গল ভাবোন্নতির আর উপায়ান্তর নাই। মুক্তি ভিন্ন তাহার ব্রহ্মলাভ ও অমরত্ব লাভের আর গত্যন্তর নাই।

অনেকেই বলিতে পারেন, যে মনুষ্য আবার বদ্ধ কোথায়? মনুষ্য পৃথিবীর রাজা, মনুষ্য ভৌতিক পদার্থের নিয়ন্তা, মনুষ্য জন্তুজগতের মধ্যে স্বাধীন জীব। মনুষ্যের একাধিপত্যে পৃথিবী কম্পিত, নদ নদী সমুদ্র প্রভৃতি স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের অবারিত দ্বার সর্ব্বত্রই। মনুষ্য সাগর-গর্ভে, পর্ব্বত-শিখরে, ভূপঞ্জর-মধ্যে, অসীম আকাশে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছে। সে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র ধরাতলের সম্বাদ আহরণ করিতেছে, ভূমণ্ডলে বাস করিয়া সৌর জগতের আকার আয়তন, গতি-বিধি অবগত হইতেছে, তাহার আর বদ্ধ-ভাব কোথায়? সে স্বাধীন ও মুক্ত জীব। মনুষ্য পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবল পৃথিবীর জীব হইলে, কেবল শারীরিক ও মানসিক সুখই তাহার সর্ব্বস্ব হইলে এ অবস্থা তাহার পক্ষে সুখ-সৌভাগ্যের হইত। বস্তু-জ্ঞান ও পদার্থজ্ঞান প্রভৃতিই তাহার পর্য্যাপ্ত

বিষয় হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের শরীর মনই সর্ব্বস্ব নহে। তাহার আত্মা থাকাতেই সে এই মর্ত্তালোক-নিবাসী হইয়াও দেবতাদিগের সংসর্গের অধিকারী হইয়াছে। সংসারের অতীত অমর-সেব্য ব্রহ্মামৃতপানে সমর্থ হইয়াছে। তাহার আত্মা থাকাতেই সে পরমার্থ জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। এই শরীর তাহার বাহন-কার্য্যে এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল বহির্জগৎ হইতে সেই অমর আত্মার অন্নপানস্বরূপ জ্ঞান-ধর্ম্ম আহরণার্থে নিয়তই দাসত্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। তখন এই শরীর মনের আর স্বাধীনতা কোথায়? ইহারদের আবার মুক্তভাব কি? আত্মার স্বাধীনতাই আত্মার মুক্তভাবই মুক্তভাব। সেই আত্মা এখানে পরাধীন কি স্বাধীন, সেই আত্মা এখানে বদ্ধ কি মুক্ত? তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখ। শরীরের সৌন্দর্য্য বৈষয়িক বা মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া মনুষ্যকে স্বাধীন বলিয়া দম্ভ করিও না। আত্মাকে ছাড়িয়া দেখিতে গেলে মনুষ্য পশু অপেক্ষা বড় উচ্চ নহে। আত্মাকে লইয়া গণনা করিতে গেলে, মনুষ্য যথার্থই ভূদেব। মনুষ্যকে পৃথিবীর প্রবাসী এবং অমৃত ধামের যাত্রী বলিয়া প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি। সেই মনুষ্য এখানে স্বাধীন কি পরাধীন সে এখানে বদ্ধ কি মুক্ত, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ। শৃঙ্খল ও রজ্জু প্রভৃতি শরীরেরই বন্ধন। তদ্দ্বারা শরীরকেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। শৃঙ্খল-বদ্ধ বন্দী যখন কারাগৃহে রুদ্ধ থাকে তখন তাহার শরীরেরই স্বাধীনতা এককালে নষ্ট হয়, কিন্তু তাহার স্বাধীন চিন্তাকে কেহ অবরোধ করিতে পারে না।

আত্মার বন্ধন-রজ্জু অজ্ঞান ও মোহজাল, আত্মার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল পাপাসক্তি ও বিষয়-প্রলোভন। আত্মার কারাবাস বিষয়াসক্তি ও রিপুসেবা। যখন এই সকল বন্ধনে আত্মা আবদ্ধ হয়, তখনই সে বদ্ধ—তখনই সে পরাধীন। তদবস্থায় সে শৃঙ্খল-বদ্ধ সিংহ হস্তীর ন্যায় হতশ্রী ও হতবীর্য্য হওত মৃতকল্প হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই সে আত্ম প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় উৎসাহের সহিত পরমাকাশে সঞ্চরণ করিতে ধাবিত হয়। তখনই সে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অমর হয়।

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্।"

যতক্ষণ মানব আত্মা বিষয়-পাশে, মোহজালে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার দৃষ্টি থাকে না। ততক্ষণ সে পশুর ন্যায় কেবল লোভভরেই চালিত হয়। সংসারের উপর আধিপত্য দূরে থাকুক, তখন তাহার শরীরের উপরে—প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপরেও কর্তৃত্ব থাকে না। বিষয়ের প্রলোভন উপস্থিত হইলে, সে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া তাহাতেই প্রলুব্ধ হয়, ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় অন্ধ হইয়া পশু বা রাক্ষস-সদৃশ নৃশংস কার্য্য-সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। কি সে সুখ, কি সে দুঃখ, কি সে মঙ্গল, কি সে অমঙ্গল, তাহা প্রতীতি করিতে না পারিয়া অল্পবুদ্ধি বালকের ন্যায় সর্প শিশু বা জ্বলন্ত অনল ধরিতেই ধাবিত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়।

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।"

এই বদ্ধ অবস্থায় যদিও সে কোন সৎ কার্য্য করে, তথাপি তাহা ধর্ম্ম কার্য্য নহে। কেন না স্বার্থপরতাই তাহার দীক্ষা-গুরু, যশমান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছাই তাহার নেতা, নিয়ন্তা, উপদেষ্টা। আত্মসুখ সাধনের জন্যই সে কার্য্য করে, তাহা লোকের

চক্ষে ঈশ্বরের চক্ষে যে রূপই প্রতীয়মান হয় হউক, তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। যে কার্য্যে স্বার্থহানির সম্ভাবনা, তাহা যতই কেন উৎকৃষ্ট পবিত্র ও কল্যাণকর হউক না, তাহা হইতে সে তখনই পরাঙ্মুখ হয়। তাহার দৃষ্টি গৃহ-প্রাচীরেই আবদ্ধ, তাহার লক্ষ্য পশুভোগ্য সুখ-কামনাতেই অনুবিদ্ধ থাকে। দেবপ্রসাদে দুঃখ ক্লেশ শোক সন্তাপ উপস্থিত হইয়া যদিও তাহার বিচেতন চিত্তকে সচেতন করিয়া দেয়, তাহার বন্ধন-রজ্জু শিথিল করিয়া তাহাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে, তথাচ সে মুক্ত হইতে চাহে না। পোষিত বিহঙ্গকে যেমন ছাড়িয়া দিলেও সে আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে, তেমনি সেই অজ্ঞান ও মোহ-জাল-বদ্ধ ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী বিষয়-বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্যে একবার সচকিত হয়, আবার পরক্ষণেই বিষয়-জালে বিজড়িত হইয়া পড়ে। নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাব যে কি, সে তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যিনি শিক্ষাসাধন ও তপস্যা-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের সন্নিধানে মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন — মোহ-অন্ধকারে ও সংসার-যাতনার ভয়ে আকুল হইয়া যিনি অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্যে প্রার্থনা করেন,

"আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যং"

ঈশ্বরই তাহাকে আপনার শান্তিপ্রদ নিরাপদ ক্রোড়ে স্থানদান করিয়া রক্ষা করেন। অমৃত পরিবেশন দ্বারা তাহাকে পালন ও পোষণ করিয়া সংসারের প্রতিকূলে স্বীয় অসৎ প্রবৃত্তির প্রতিস্রোতে গমন করিবার বল বুদ্ধি শক্তি বিধান করেন। তাহার সন্নিধানে স্বীয় নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে তদনুকরণে শিক্ষা দেন। তখন সেই বন্ধন-মুক্ত জীব ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে স্বীয় স্রষ্টা পাতা বিধাতার লক্ষ্য সাধন করিতে করিতে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। আপনার মঙ্গল অমঙ্গল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতার প্রতি অন্তশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সমাপন করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হয়েন। আপনার ক্ষতি লাভের পুণ্যপাপের গণনা ছাড়িয়া দিয়া "বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্তে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।' তখন চতুর্দ্দিকে ঈশ্বরের প্রভাব, তাঁহারই কর্তৃত্ব প্রভুত্ব ও তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সংসারের ভবতাপ পাপ শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া অনিমেষ জ্ঞান-নয়নে তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া এই মধুর মঙ্গল গীত গান করিতে থাকেন।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"

মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞান-বৈরাগ্য অভ্যাসই সাধকের প্রধান কার্য্য। জ্ঞান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, সংসারের ক্ষুদ্র-ভাব বিষয়ের অনিত্যতা, সর্ব্বক্ষণই হৃদয়ে জাগরূক থাকে। বিষয়ের চাকচিক্য আর আত্মাকে মোহজালে বিজড়িত করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়-সুখের প্রলোভনও আর জীবকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। সূর্য্যালোক যেমন সকল বস্তুকে প্রকৃত-ভাবে প্রকাশ করে, জ্ঞান-জ্যোতিও তেমনি সাধকের সন্নিধানে শ্রেয় ও প্রেয়ের পথকে প্রদর্শন করে। আলোক অন্ধকার, জীবন

মৃত্যু, সুধা ও গরল তখন স্ব স্বভাবে প্রকাশ পায়। তখন সেই সাধক আপনার দিব্য জ্ঞানালোকে—ঈশ্বরের বিমল মঙ্গল-জ্যোতিতে চারি দিক আলোকিত দেখিয়া কেবল সত্যেরই পথে, শ্রেয়েরই পথে, অমৃতেরই সোপানে, সঞ্চরণ করিতে থাকেন। তখন সেই সর্ব্ব-সেব্য ঈশ্বরকে আত্মস্থ দেখিয়া নির্ভয়ে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। বিষয়ের সেবা, প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কেবল চিরসখা পরব্রহ্মেরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে অমৃতের পথে উত্থিত হয়েন। অসৎ বিষয় হইতে সৎস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে, অজ্ঞান-মোহ-অন্ধকার হইতে জ্যোতি-স্বরূপ পরমেশ্বরের দিকে, মৃত্যুর প্রতিকৃতি সংসার হইতে সেই অমৃতের একায়তন পরব্রহ্মের প্রতি অগ্রসর হওত নিত্য নূতন সুখ, নূতন শান্তি, নবতর বল বীর্য্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকেন।

মুক্তির অবস্থা নিষ্কর্ম্ম বা নিশ্চেষ্টতার অবস্থা নহে। মুক্তির অবস্থা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের এবং আত্মোন্নতি সম্পাদনের প্রশস্ত কাল। তখন সাধকের জ্ঞান উন্নত হয়, প্রীতি প্রশস্ত ভাব ধারণ করে, অনুরাগ দৃঢ়ীভূত হয়, এবং প্রত্যয় নিশ্চল ও ধ্রুব হইয়া উঠে, তখন তাহার আর ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যুত তরঙ্গপূর্ণ নদ নদীর মধ্যে যেমন জলোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইলে উর্ম্মিমালা প্রশমিত হইয়া যায়,—প্রশান্ত ভাবে প্রবাহ-বেগ বৃদ্ধি হইয়া নদ নদীকে পূর্ণ করিতে থাকে; তেমনি যোগ-যুক্ত বন্ধ-মুক্ত আত্মা অহর্নিশি জ্ঞান-প্রেম-সমুদ্র পরমেশ্বর হইতে শান্তি মঙ্গলের উচ্ছ্বাস লাভ করিয়া উদ্বেগ ও বিক্ষেপশূন্য হওত নিস্তরঙ্গ স্থির-হ্রদয়ের ন্যায় শান্তভাব ধারণ করে, তখন তাহার জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতার প্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া নিরুপদ্রবে আপনার ও জগতের কল্যাণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। আমারদের এমন সময় কখনই উপস্থিত হইবে না, যে সময়ে আমারদের শিক্ষা-সাধন ও তপস্যার শেষ হইবে; কেন না যিনি আমারদের আত্মার আদর্শ তিনি পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণ-প্রেম, পূর্ণ-শক্তি ও অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ। সেই অনন্তের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য অনন্ত কাল ও অনন্ত শিক্ষার প্রয়োজন।

মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মানুরক্ত ব্রহ্ম-সংস্থিত আত্মা, চতুর্দ্দিকে কেবল ব্রহ্মের বল, কেবল তাঁহারই প্রভাব, কেবল তাঁহারই সত্তা সন্দর্শন করে। মধ্যাহ্ন-কালীন প্রখর সূর্য্যের আলোক-মধ্যে যেমন দীপজ্যোতি উপলব্ধ হয় না, তেমনি সেই পরব্রহ্মের উজ্জ্বলতর প্রকাশ মধ্যে ব্রহ্মগত-প্রাণ সাধকের প্রতাপ প্রভুত্ব অনুভবই হয় না। ঈশ্বরের অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রমের মধ্যে তাঁহার দম্ভ মাৎসর্য্য সকলই খর্ব্ব হইয়া থাকে। তাঁহার আত্মা, লক্ষ্য-বিদ্ধ শরের ন্যায় কেবল ব্রহ্মেরই মহিমায় অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। "শরবৎ তন্ময়োভবেৎ।" ইহাই ব্রহ্মোপাসনার চরম ফল, ইহাই শিক্ষা-সাধনের শেষ পুরস্কার, ইহাই অনন্ত উন্নতি লাভের সোপান, ইহাই অমৃত লাভের সেতু, ইহাই মুক্তি, ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্যই আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে এই পবিত্র উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হই। এই মুক্তি লাভের জন্যই আমরা বর্ষে বর্ষে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার জন্যই এই উৎসব-মণ্ডপে একত্রিত হইয়া থাকি।

আমরা সকলে সংসারবন্ধনে জর্জরীভূত হইয়াছি, শোক তাপে অন্ধীভূত হইয়া মুক্তির পথ হইতে বহুদূরে নিপতিত রহিয়াছি, অথচ আমারদের জীবনকাল প্রায় নিঃশেষিত হইল, আর যেন আমরা এই

দুর্লভ অবসরের প্রতি উপেক্ষা না করি, আইস সকলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

হে করুণানিধান! আমারদের গতি মুক্তির জন্য তুমি কৃপা করিয়া কত সুন্দর অবসরই প্রদান করিতেছ, অবস্থাভেদে ঘটনাভেদে তুমি আমারদিগকে কতরূপেই শিক্ষা দিতেছ! কিন্তু আমরা এমনই বিচেতন. যে তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। আমরা কেবল সংসারকেই দেখিতেছি, চারিদিকের বিষয়-সুখের গণনাতেই স্ফীত হইয়া অনন্তকালের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করি না। বন্দীর ন্যায় কারাগৃহের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই দিন-যামিনী চেষ্টা করিতেছি, আত্মতত্ত্বরূপ নিজধাম আমারদের স্মরণই হয় না। হে ঈশ্বর! হৃদয়গ্রন্থি সকল তুমি ছেদ করিয়া দেও—আমারদের মোহপাশ মোচন কর। আমরা তোমারই দ্বারে মুক্তিকামনায় সকলে উপস্থিত হইয়াছি, আমারদের কামনা তুমি পূর্ণ

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ধর্ম্ম-গোলে ধর্ম্মের বিলোপ।

যাঁহারা কোন ধর্ম্ম প্রথম সংস্থাপন করেন তাঁহারা সকল মনুষ্য প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক হইবে এই অভিপ্রায়েই তাহা করিয়া থাকেন। যাহাতে সকল লোকে ঈশ্বরপরায়ণ হয়, সাধু হয়, এবং পরোপকারে রত থাকে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা এই রূপ উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তীরা এই উপদেশ অবহেলন করিয়া ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়। তাহারা উপাসনার, বাহ্যানুষ্ঠান, অর্থ না প্রণিধান করিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, উৎসব, প্রভৃতি ধর্ম্মের সকল বাহ্যাড়ম্বরকেই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহাতে অধিকতর রত হয়। সকল ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত এই বাক্যের যথার্থতার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ধর্ম্মসংস্কারকেরা ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে যত্নবান হয়েন, তাঁহার অনুবর্ত্তীরা সেই ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলে, আবার তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন জন্য আর এক জন ধর্ম্মসংস্কারকের আবশ্যক হয়। পৃথিবীতে এইরূপ ক্রমিকই হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা জগতে আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে এমত পূর্ব্বে আর কোন ধর্ম্মে করে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যেই উহার ভিতর অবতারবাদ, আদেশবাদ, বিশেষ বিধান প্রভৃতি অতি দূষণীয় মত সকল প্রবেশ করিয়া উহার বিশুদ্ধতার হানি করিতেছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটি লক্ষণ দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইতে হয়। সে লক্ষণ এই যে উহা জল্পনা-প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে। ইহা যথার্থ বটে যে কোন ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকিলে সেই ধর্ম্মের প্রধান উপদেষ্টাদিগের বিষয়ে কথা না কহিয়া থাকা যায় না; ইহা যথার্থ বটে যে ধর্ম্ম-বিষয়ে মত বিভেদ হইলে সে বিষয় আন্দোলন না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিনায়কদিগের কথা ও মত বিষয়ক বিবাদের কথা উক্ত ধর্ম্মের সার হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে যাওয়া যায় সেই খানে কেবল এই সকল কথাই শ্রুত হওয়া যায়। যে সকল কথা সন্তাপ হরণ করিতে পারে তাহা অতি অল্পই শুনা যায়। যে সকল কথা গুরুভারাক্রান্ত মনুষ্যের দুঃখভার লাঘব করে, এবং মনশ্চক্ষু সমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করিয়া প্রাণ মন শীতল করে, সে সকল কথা

এক্ষণকার ব্রাহ্মমণ্ডলীতে প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মেরা অধিনায়কদিগের কথা ও বিবাদের কথা কহিতে যত সমুৎসুক ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সম্পাদন ও যোগস্থ হইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনের কথা কহিতে তাঁহাদিগকে তত সমুৎসুক দেখা যায় না। কেবল জল্পনা, জল্পনা, জল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিউটেষ্টমেণ্টের একটি স্থানে লিখিত আছে "In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God." যদি এই বাক্যের এইরূপ অনুবাদ করা যায় যে "সর্ব্ব প্রথমে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, বাক্যই ঈশ্বর" তাহা হইলে নিউটেষ্টমেণ্টের এই কথাতে ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান অবস্থা যেমন বর্ণিত হইতে পারে এমন অন্য কোন কথায় হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মদিগের ব্যবহার দেখিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে তাঁহারা কেবল বাক্যকেই ঈশ্বর বোধ করেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। যেমন প্রমত্ত নাবিক সমস্ত রাত্রি নৌকা অতি বলপূর্ব্বক বাহিয়া প্রাতঃকালে দেখে যে নৌকা কিছুমাত্রও অগ্রসর হয় নাই, যেখানকার নৌকা সেই খানেই আছে, যেহেতু সন্ধ্যাকালে ছাড়িবার সময় শঙ্কু হইতে নৌকাবন্ধনকারী রজ্জু উদ্ঘাটন করে নাই, সেইরূপ এক একবার এইরূপ বোধ হয় যে যেখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই খানেই আছে, কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি তখন হইবে যখন অধিকাংশ ব্রাহ্ম সংসাররূপ শঙ্কু হইতে মোহ-রজ্জু উদ্ঘাটন করিয়া ঈশ্বরেতে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে সক্ষম হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি তখন হইবে, যখন অধিকাংশ ব্রাহ্ম অন্তরস্থ রিপু দমন করিয়া ও চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া ঈশ্বরকে আত্মার্পণ করিতে এবং সকলের প্রতি সাধু ব্যবহার ও সকল জীবের হিতসাধন করিতে সক্ষম হইবেন। বৃথা জল্পনাতে কোন ফলোদয় হইতে পারে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে হিন্দুমত প্রচার।

(গত মাসের পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

আমরা গত মাসের পত্রিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে কতকগুলি হিন্দু দার্শনিক মত প্রচারের বিষয় পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছি। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি মতের প্রচারের বিবরণ পাঠকবর্গকে বিদিত করিব।

কয়েক বৎসর হইল ফ্রান্স দেশের রাজধানী প্যারিস নগরে 'French Spiritist Society' অর্থাৎ "ফরাসীস আত্মবাদী সভা" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার সভ্যেরা বলেন যে তাঁহারা মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার সহিত নানা উপায়ে কথোপকথন করিতে পারেন ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে পরলোকে আত্মার অবস্থার বিবরণ অবগত হইতে পারেন। ইহাঁরা কতকগুলি ফরাসীস ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তির আত্মাদিগের নিকট হইতে পরলোকে মনুষ্য আত্মার অবস্থার বিবরণ সমস্ত জানিয়াছেন এবং ইহাদিগের সভার সভাপতি এলান কার্ডেক (Allan Kardec) তাহা ফ্রেঞ্চ ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এনা ব্লাকওয়েল (Anna Blackwell) নাম্নী ইংলণ্ডীয়া কোন বিদ্যাবতী ললনা তাহার ইংরাজী ভাষায় "Heaven and Hell" "স্বর্গ ও নরক" নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ পরলোকগত আত্মারা যোনি-ভ্রমণ ও

পৃথিবীতে আত্মার পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফলভোগ, সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের এই দুইটি মত সত্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পরলোকগত আত্মাদিগের সহিত ফরাসীস আত্মবাদী সভার সভ্যেরা কথোপকথন করেন এই কথা কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সেই সকল আত্মাদিগের কথা প্রমাণ করিয়া তাঁহারা উক্ত মতদ্বয় ইউরোপে প্রচার করিতেছেন। ইহাঁরা ঐ দুইটি মতের যথার্থতা ও যুক্তিযুক্ততা দেখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের দল বৃদ্ধি করিতেছেন।

হিন্দুদিগের ন্যায় ফরাসীস আত্মবাদী সভার সভ্যেরা বলেন যে, যে আত্মা পৃথিবীতে একবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি মনুষ্যোচিত কার্য্য না করিয়া, অজ্ঞ ও মূঢ় হইয়া থাকে ও পাপাচরণ করে তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যদেহ ধারণ করত জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং যে জন্মে সে প্রকৃতরূপে জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মাচরণ করিয়া শুদ্ধ ও বুদ্ধ হয় সেই জন্মের পর অবধি সে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি লাভ করে। হিন্দুমতাবলম্বী ধর্ম্মোপদেষ্টার ন্যায় ফরাসীস আত্মবাদীরা উপদেশ দেন, "If you dread re-incarnation in this world, on account of the miseries of human life, you may escape from that necessity by doing, in your present-life, all that you ought to do, that is to say, in working out your own improvement."* "যদি তুমি মনুষ্য জন্মের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার আশঙ্কায় পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হও তাহা হইলে তোমার এই বর্ত্তমান জীবনেই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থাৎ তোমার আত্মার সম্যক উন্নতি সম্পাদন কর।"

* Heaven and Hell. P, 244.

হিন্দুদিগের ন্যায় ফরাসীস আত্মবাদী সভার সভ্যেরা কর্ম্মফলভোগ মানিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন না করিয়া অধর্ম্মাচরণে কালক্ষেপ করিয়াছিল তাহাকে ইহজন্মে সেই অধর্ম্মাচরণের দণ্ডস্বরূপ নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আবার যে মনুষ্য ইহ জীবনে ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করে না তাহাকে পরজন্মে তাহার দণ্ড স্বরূপ অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট ভোগ করিতে হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারা বলেন "There is no suffering in your present life that is not the echo of suffering which you have caused to others in the past, every privation you endure is the counterpoise of an excess of which you have been guilty in a former life; every tear you shed is needed to wash away some fault or some crime."† "ইহ জীবনে তোমাকে এমন একটিও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না যাহা তোমার পূর্ব্বজন্মে তুমি অন্যকে যে কষ্ট দিয়াছিলে তাহার ফল নহে, ইহ জীবনে তোমাকে এমন একটিও অভাব ও দরিদ্রতা হইতে কষ্ট পাইতে হয় না যাহা তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন অপরিমিতাচারের ফল নহে; তোমার চক্ষু হইতে পতিত প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন একটি দোষ কিম্বা পাপ ধৌত করিবার নিমিত্ত আবশ্যক।"

শত শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীতীরে যে সকল মত প্রচারিত হইত, অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে ডেনিউব, রাইন্, ও সীন্ নদী তীরে সেই সকল মত পুনরায় আপনা হইতেই প্রচারিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইয়াছি। ইংরাজী ভাষায় একটি চলিত কথা আছে "History repeats itself," [illegible] বাক্য-

† Heaven and Hell, P, [illegible]

টির যথার্থতা বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে হিন্দু মত সকলের পুনঃ-প্রচাররূপ ঘটনা দ্বারা যেমন প্রমাণীকৃত হইতেছে এমন বোধ হয় ইতি পূর্ব্বে আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা হয় নাই। বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক পরলোকগত ডফ্ সাহেব স্কটলণ্ডের ফ্রী চর্চের অধিনায়ক সভার সভাপতি ছিলেন; তিনি ঐ সভার একটি অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে আমরা যেমন হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি তেমনি তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্মে আমাদিগকে নিঃস্তব্ধ ভাবে আকর্ষণ করিয়া বৈরনির্যাতন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং জর্ম্মেণী দেশে অদ্বৈত মতের প্রাবল্য আপনার বাক্যের উদাহরণ স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

এস্কিমো জাতি

দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্ব প্রান্তস্থ লেব্রেডর নামক উপদ্বীপ হইতে বেয়ারিং উপসাগর পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র পাঁচ শত ক্রোশ সমুদ্র-তীর ব্যাপিয়া এস্কিমো নামে এক অসভ্য জাতি বাস করে। পর্য্যটকেরা বলেন যে আমেরিকার যত উত্তরে যাওয়া যায় এই জাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মনুষ্যেরা মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষী ও মৎস্যাহরণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। আরব দেশীয় বেডউইন, স্পেন দেশীয় জিপসী, ও ভারতবর্ষীয় বেদেদিগের ন্যায় ইহারা প্রায় এক স্থানে বাস করে না। শীতকালে উত্তর আমেরিকার দারুণ শীতাধিক্য প্রযুক্ত ইহারা এক স্থানে বাস করে বটে, কিন্তু গ্রীষ্মের আরম্ভে হরিণ ও সীল মৎস্য শীকার করিবার জন্য তাম্বুতে ইহারা পর্য্যটনে বাহির হয়। ইহাদিগের উভয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা পশু-চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাজামা ও পিরান এবং লম্বা বুট জুতা পরিধান করে। এস্কিমোদিগের বাটী সচরাচর প্রস্তর কিম্বা পর্ণ-নির্ম্মিত। ঐ বাটীর মধ্যে একটি চতুষ্কোণ গৃহ থাকে; বাটীর এক পার্শ্বে একটি সুড়ঙ্গ থাকে, সেই সুড়ঙ্গ দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে হয় এবং অন্য তিন পার্শ্বে শয়নের জন্য বারাণ্ডার মত থাকে, সেইখানে নিবাসীরা শয়ন করে। এই প্রকার প্রত্যেক বাটীতে এক হইতে বিংশতি লোকবিশিষ্ট তিনটি চারিটি পরিবার বাস করে। রন্ধন-পাত্র, নৌকা, তুষারাবৃত ভূমির উপর দিয়া গমনের নিমিত্ত শ্লেজ্‌নামক চক্রহীন গাড়ি, শীতকালের নিমিত্ত সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি সমস্ত বস্তু বাটীস্থ সকলের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। কেবল মৎস্য ধরিবার যন্ত্র ও কায়াক্ নামক জেলেডিঙ্গী প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদিগের রন্ধন-পাত্র সোপ-প্রস্তর নামক প্রস্তরে ও তিমি মৎস্যের অস্থিতে নির্ম্মিত। ধাতু-নির্ম্মিত কোন সামগ্রী ইহাদিগের নিকট অতিশয় মূল্যবান। ইহারা বল্লম ও বড়শা প্রভৃতি অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা বড়শা নিক্ষেপে এরূপ নিপুণ যে উহা দ্বারা পক্ষী বিদ্ধ করিয়া বধ করিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে এক বিবাহ করাই নিয়ম, কিন্তু স্ত্রী কিম্বা স্বামী ত্যাগ ও দ্বিতীয় স্ত্রী-গ্রহণ-প্রথাও প্রচলিত আছে। নববিবাহিত দম্পতী স্বামী কিম্বা স্ত্রীর পিত্রালয়ে বাস করে। এস্কিমোদিগের কতকগুলি অদ্ভুত নিয়ম ও রীতি আছে। ইহাদিগের রাজা কিম্বা সম্রাটের ন্যায় কোন সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা বা নায়ক নাই। পিতাই প্রত্যেক গৃহের কর্ত্তা, কিন্তু বহু-গৃহ-পূর্ণ একটি গ্রামের মধ্যে সাধারণের মত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শাসন নাই। ইহাদিগের মধ্যে একটি অদ্ভুত

নিয়ম এই যে যদ্যপি এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নিকট হইতে কোন একটি যন্ত্র বা অস্ত্র ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহা হারাইয়া ফেলে কিম্বা অন্য কোনরূপে নষ্ট করে তাহা হইলে তাহার জন্য তাহাকে দায়ী বা দোষী হইতে হয় না। ইহাদিগের মধ্যে কোন বিচারালয় নাই, কোন দোষ ও পাপের জন্য সাধারণের ভৎর্সনা ও ঘৃণার পাত্র হওয়া ব্যতীত অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থাও নাই। এই স্থলে ইহা স্মরণ করা আবশ্যক যে এস্কিমো জাতি অত্যন্ত দরিদ্র, অতএব ইহাদিগের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি ও ঐ প্রকার দোষ সকল সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। ইহারা স্বভাবতঃ শিস্ট ও নম্র এই জন্য ইহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীস্থ অন্যান্য কোন কোন জাতির ন্যায় এস্কিমোরা আপনাদিগের সন্তানের পিতামহের নামে নামকরণ করে। সন্তানকে পরাক্রমশালী শিকারী করিবার জন্য পিতা খাদ্য দ্রব্যের পাত্রের নিম্নে জুতা রাখিয়া খাদ্য ভক্ষণ করে এবং তাহার এক বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহার মাতা তাহাকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া থাকে। বোধ হয় এই শেষোক্ত রীতিটি এস্কিমো জাতি আপনাদিগের প্রতিবাসী ভল্লুকদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে।

এস্কিমো জাতিরা অসভ্য হইলেও, ইহারা ধর্ম্ম-শূন্য জাতি নহে। ইহারা আত্মার অমরত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং কর্ম্ম-ফল-জনিত যোনি ভ্রমণ মতেও বিশ্বাস করে। ইহাদিগের মতে পৃথিবী কতকগুলি দেবতা কর্ত্তৃক প্রশাসিত হইয়া থাকে, এবং আকাশে একটি লোক ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে আর একটি লোক আছে, এই দুই লোকে মনুষ্যের আত্মা মৃত্যুর পর গমন করে। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে স্বর্গ আকাশের উপর স্থিত ও নরক পৃথিবীর নিম্নে স্থিত কিন্তু ইহাদিগের বিশ্বাস তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বলে যে আকাশস্থিত লোক দুঃখের স্থান ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্থিত লোক সুখের স্থান; পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ উর্ব্বর সুখময় লোকে ধার্ম্মিকেরা, এবং আকাশস্থ শীতল ও অনুর্ব্বর লোকে পাপীরা গমন করে। ইহারা আরও বিশ্বাস করে যে দেবতাগণের উপরে এক জন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ আছেন। তিনি কখন কখন কোন কোন মনুষ্যকে সাধারণের মঙ্গলার্থ উক্ত দেবতাগণ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রদান করেন। ঐ সকল মনুষ্যকে ইহারা এঞ্জিকক বলিয়া থাকে। এঞ্জিককেরা মৃত ব্যক্তিগণের আত্মা ডাকিয়া উপস্থিত করিতে পারে এবং ইংলণ্ডীয় আত্মবাদী হোম সাহেব প্রভৃতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারে। এক জন এঞ্জিককের পদদ্বয়ের মধ্যে মস্তক বাঁধিয়া একটি অন্ধকার গৃহের মেজিয়ার উপর রাখিয়া দিলে কোন মৃতব্যক্তির আত্মা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আলোক প্রকাশ করিয়া সহসা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে এবং ঐ গৃহস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তাহাকে যে প্রশ্ন করা হয় সে তাহার উত্তর দিয়া থাকে। অসভ্য এস্কিমো জাতির মধ্যে প্রচলিত এই ব্যাপারটি সুসভ্য ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ও ইংলণ্ডনিবাসী আত্মবাদিগণের মধ্যে প্রচলিত মৃত ব্যক্তির আত্মা নামাইবার প্রথার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এস্কিমোরা বিশ্বাস করে কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন দেবতার সহিত মিলিত হইয়া কোন গূঢ় স্বার্থসাধন বা মন্দ অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারে; মৃতব্যক্তিরা ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে এবং সঙ্গীত ধ্বনি করিয়া বা শীষ দিয়া আপ-

নাদিগের আবির্ভাব জানাইয়া থাকে, কখন স্বশরীরেও প্রকাশ হয়। তাহারা বিশ্বাস করে সূর্য্য স্ত্রী, চন্দ্র পুরুষ; পৃথিবী হইতে চন্দ্রে যাইবার পথে এক ভয়ঙ্করী ডাকিনী বাস করে, সে যে পথিককে হাসাইতে পারে তাহাকে বধ করিয়া থাকে। এই সকল নানা প্রকার অদ্ভুত কুসংস্কার এস্কিমোদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভবিষ্যৎ অমঙ্গল দূর করিবার জন্য ইহারা কবচ পরিধান, উপবাস এবং দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। এস্কিমোদিগের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে অত্যন্ত অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মে বিশ্বাস বিদ্যমান আছে।

জৈনদিগের সম্প্রদায়-ভেদ এবং ধর্ম্ম প্রচার।

আমরা জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তির বিষয় যথাসম্ভব বর্ণনা করিয়া, জৈনদিগের ধর্ম্মের মূল সূত্র এবং জৈন সিদ্ধ পুরুষদিগের বিষয় যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছি। তৎপরে জৈন গ্রন্থ সমূহ হইতে অর্হৎগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। এক্ষণে জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ এবং জৈনধর্ম্ম-প্রচারের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাবীর-চরিতে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে মহাবীর শিষ্যদিগের সহিত গঙ্গার উভয়তীরস্থিত প্রদেশ সমূহে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। বিহার, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, রাজগৃহ, অপাপপুরী প্রভৃতি স্থানে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার জীবিতকালে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল সুধর্ম্মা এবং গৌতম তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন। গৌতম শীঘ্রই মানবলীলা সম্বরণ করেন। একমাত্র সুধর্ম্মাই জৈনমত বিষয়ে উপদেশ দিতে অবশিষ্ট ছিলেন। সুধর্ম্মের প্রধান শিষ্য জম্বুস্বামী এবং তদনন্তর তাঁহার শিষ্যগণ জৈনধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন। মহাবীরের সময় হইতে জৈনদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-বন্ধন হইবার সূত্রপাত হয়। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় বন্ধন করেন। এইরূপে জৈনদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া উঠে।

জৈনেরা দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দিগম্বরদিগের পরিধান বাস নাই বলিয়া তাহাদিগকে দিগম্বর বলিত। দিগম্বর জৈনগণ আপনাদিগকে মহাবীরের শিষ্য বলিয়া অভিমান করে। ইদানীং ইহারা রক্তাম্বর বা রক্তপট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ ইহারা এক্ষণে আহার-কাল ব্যতীত অন্য সকল সময় রক্তবস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিগম্বরেরা শ্বেতাম্বরদিগের অপেক্ষা প্রধান বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া থাকে। দিগম্বর জৈনেরা তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি সকল বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া রাখে না। ইহারা ষোড়শবিধ স্বর্গ এবং শতবিধ স্বর্গস্থ ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। ইহারা সম্মার্জ্জনী বা জলপাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় না, কিন্তু শ্বেতাম্বর জৈনগণ শ্বেত বসন পরিধান করে এবং আপনাদিগকে পার্শ্বনাথের শিষ্য বলিয়া খ্যাপন করে। শ্বেতাম্বর জৈনেরা তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি সকল বসন ভূষণাদিতে ভূষিত করিয়া রাখে এবং সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি স্বর্গ ও চতুঃষষ্টি সংখ্যক ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহারা সম্মার্জ্জনী এবং জল-কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে অজ্ঞাত-

সারে কোন জীবের প্রাণহিংসা নিবারণের জন্য তাহারা হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা কোন স্থান পরিষ্কার করিয়া তবে তথায় উপবেশন করে। কমণ্ডলু করিয়া জল লইবার প্রয়োজন এই যে অন্য-প্রদত্ত জল পান করিতে হইলে যদি সেই জলে কীটাদি কোন জীব থাকে তাহা হইলে তাঁহারা জীবহিংসা করিবেন এবং তজ্জন্য পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। ইত্যাদি নানা বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবম্বিধ মতভেদ আছে বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সময় ঘোরতর বিবাদ হইয়া থাকে। উপরি উক্ত সম্প্রদায় ব্যতীত জৈনদিগের সাধারণতঃ যতি এবং শ্রাবক এই দুই সম্প্রদায় আছে। যতিগণ উদাসীন এবং যোগী। ইহারা কেবল ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী দ্বারা জীবন যাপন করে, কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ভাল বাসেনা, স্ত্রীলোকদিগের সহবাস ঘৃণা করে এবং লোকালয়-শূন্য প্রদেশে মঠ রচনা করিয়া তথায় বাস করে। ইহারা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" মত অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রদর্শন করে। ইহারা সম্মার্জ্জনী দ্বারা উপবেশনস্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় উপবেশন করে। ইহারা কখন কিন্তু জৈন মন্দিরের পুরোহিত হয় না, পৌরোহিত্য কার্য্য প্রায় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যতিরা পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন বটে কিন্তু জৈনমন্দিরের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। শ্রাবকেরা সংসারী। শ্রাবকগণ যতিদিগকে ভিক্ষা প্রদান করে এবং পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এই তীর্থঙ্করদ্বয়ের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করে। শ্রাবকেরা অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে। শ্রাবকেরা গৃহস্থ এবং সংসার-নিবিষ্ট কিন্তু যতিরা সংসারত্যাগী এবং স্বল্পাহারী ক্লেশসহিষ্ণু সন্ন্যাসীমাত্র। যাঁহারা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া যতি হইয়া থাকে তাহারা দেবতার্চ্চনা প্রভৃতি করে না। জৈন শ্রাবকেরাই মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্কর প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। ইহারা যে কেবল তীর্থঙ্করদিগের পূজা করে তাহা নহে, অনেক হিন্দু দেব দেবীরও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তীর্থঙ্করদিগের জীবন-বৃত্তান্তে যে সকল হিন্দুদেবতার উল্লেখ আছে, ইহারা তাহাদিগের পূজা করে। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদও একপ্রকার প্রচলিত আছে। ইহারা কোন প্রকার জীবের প্রতি হিংসা করে না এবং বৎসরের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিবসে লবণ, অম্ল, মধু, ফল, মূল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ব্যবহার করে না। ইহারা নীতিশাস্ত্রের পাঁচটি নিয়ম সবিশেষ পালন করে। সে পাঁচটি নীতি এই,

(১) জীবহত্যা করা উচিত নহে।

(২) সর্ব্বদা সত্য কহা উচিত।

(৩) সরল এবং সৎস্বভাব হওয়া উচিত।

(৪) পতি ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক হওয়া, অন্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত নহে।

(৫) পার্থিব বাসনা সমূহ দমন করা একান্ত আবশ্যক।

ইহারা দান, ভক্তি, নম্রতা এবং প্রায়শ্চিত্ত এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মন সংযত করিয়া রাখে। ইহারা বৈমানিক, ভুবনপতি জ্যোতিষ্ক এবং ব্যন্তর এই চারি প্রকার দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এই দেবতা সমূহ কিন্তু তীর্থঙ্করদিগের সমান নহে। ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি বর্ত্তমান এবং অতীত কল্পের দেবগণ বৈমানিক অর্থাৎ বিমানচারী। অসুর, কুমার, নাগকুমার প্রভৃতি দশবিধ দেবতারা ভুবনপতি। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ,

নক্ষত্র এবং অন্যান্য জ্যোতিঃ পদার্থ সকল জ্যোতিষ্ক দেবতা। এবং রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতি অষ্টবিধ ব্যন্তর দেবতা। এই সমস্ত দেবতাই মৃত্যুর অধীন, কেবল জ্যোতিষ্ক দেবতারা নহেন। জৈনদিগের সম্প্রদায় সকল এক প্রকার উল্লিখিত হইল। দিগম্বরদিগকে বিবসন, মুক্তবসন এবং মুক্তাম্বর এই ত্রিবিধ নামেও নামিত করে। শ্বেতাম্বরদিগকে লুঞ্চিতকেশ নামেও অভিহিত দেখা যায়; কারণ তাঁহারা শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন করিবার সময় কখন কখন অকস্মাৎ মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলেন। প্রবাদ আছে যে পার্শ্বনাথ সন্ন্যাসী হইয়া স্বমস্তক হইতে পাঁচ গুচ্ছ কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলেন। অতঃপর জৈনধর্ম্ম প্রচারের কথা।

জৈনদিগের গ্রন্থনিচয় এবং স্তুপ প্রভৃতি পরিদর্শন করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে বিহার এবং বারাণসী প্রদেশেই জৈনধর্ম্ম সমুদ্ভূত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। মহাবীর বিহারের অন্তর্গত পাবন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বারাণসী পার্শ্বনাথের জন্মস্থান। গঙ্গার উভয় তীরে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কান্যকুব্জ প্রদেশে যে বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন তাহা আমরা চাঁদকবি প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাই। বঙ্গদেশে কোন কালে জৈনধর্ম্মের প্রচার হয় নাই। পশ্চিমাঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যেই জৈনধর্ম্মের প্রচার বিশেষ রূপে হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে গুজরাটের রাজগণ জৈনমত গ্রহণ করেন। এই সময়েই বোধ হয় মারওয়ার এবং চালুক্য প্রদেশের রাজগণ জৈন হয়েন। অদ্যাপি মারওয়ার, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে জৈনধর্ম্মের বিবিধ চিহ্ন উজ্জ্বল রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেই জৈনধর্ম্ম করমণ্ডল উপকূলে প্রচারিত হইয়াছিল। মথুরা মহীশূর প্রভৃতি জনপদে জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে ছিল। অবশেষে কেবলমাত্র বিজয় নগরে জৈনধর্ম্মের প্রভাব ছিল, অন্যত্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে এবং দক্ষিণাংশে জৈনধর্ম্মের বহুসংখ্যক কীর্ত্তিস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

অধুনাতন কালে বঙ্গদেশেও অনেক জৈনের বাস হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীরা জৈনধর্ম্মাবলম্বী, এই নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে কতকগুলি জৈন-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা নগরীতেও অনেক জৈন বাস করেন। ইহাঁরা সকলেই ব্যবসায়ী। প্রতিবৎসর কলিকাতায় জৈনেরা পার্শ্বনাথকে মহোৎসব এবং মহা জাঁকজমকের সহিত নগর ভ্রমণ করান। কলিকাতার পূর্ব্বপার্শ্বে মানিকতলার পোলের নিকট একটি জৈন মন্দির আছে। ইহা বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীটে স্থিত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বদ্রিদাস ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহাতে জৈন দশম অর্হৎ শীতলনাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জৈনমন্দির নানাবিধ কারুকার্য্যে শোভিত এবং অতি চমৎকার। ইহার ভিতরের যে কি অপূর্ব্ব শোভা তাহা না দেখিলে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ছাদটি গম্বুজাকার এবং তদুপরি বহু সংখ্যক সুবর্ণরঞ্জিত চূড়া বিরাজমান। গম্বুজের নিম্নভাগে নানাবিধ চিত্র এবং তন্নিম্নে যে কত শত মণিমুক্তা গৃহ আলোকিত করিয়া লম্বমান রহিয়াছে তাঁহার সংখ্যা করা যায় না। গৃহতল উৎকৃষ্ট শ্বেত-প্রস্তর-রচিত এবং নানাবিধ সুগন্ধে সুবাসিত। প্রতি দিন সায়ংকালে শীতলনাথের আরত্রিক হইয়া থাকে। দোলপূর্ণিমার দিন এই মন্দিরে মহোৎ-

সব হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের মন্দির অপেক্ষা জৈনদিগের মন্দির সকলের গঠন-প্রণালী সর্ব্বত্রই অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। বিহার প্রদেশের নানাস্থানে বহুসংখ্যক জৈনমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। বারাণসীতেও অনেক জৈন মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু জয়পুর ও মারওয়ার প্রভৃতি প্রদেশে যত জৈন মন্দির আছে অন্য কুত্রাপি তত নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলে জৈন-মন্দির আছে। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থলে জৈনদিগের বাস আছে। অল্পে বলিতে গেলে জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বাণিজ্যাদি নানা কারণ বশত ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে জৈনদিগের অনন্ত কালের বিবিধ বিভাগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। হেমচন্দ্রাচার্য্য-বিরচিত অভিধান-চিন্তামণির দ্বিতীয় কাণ্ডের ৪০—৫০ শ্লোকে জৈন কালনির্ণয় বর্ণিত আছে। জৈনদিগের কাল দ্বিবিধ, উৎসর্পিণী এবং অবসর্পিণী। বিংশতি কোটি কোটি সাগর এই উভয় কালের পরিমাণ। প্রত্যেক দিকে এক যোজন পরিমিত গহ্বরে ছিন্নকেশ রাশীকৃত থাকিলে তাহা হইতে এক একটি কেশ যদি একশত বৎসর অন্তর তুলিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে যত সময়ে সেই সমস্ত গহ্বর কেশশূন্য হইবে, সেই অপরিমিত কালের নাম সাগর বা সাগরোপম। দশ কোটি কোটি পল্যে এক সাগর হয়। এই উৎসর্পিণী এবং অবসর্পিণী কালদ্বয়ের প্রত্যেকেই ছয় অরে বিভক্ত; অতএব কালচক্র দ্বাদশ অরে বিবর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং এক অরও অপরিমিত কাল। শকট-চক্রের অর থাকে বলিয়া কালচক্রের ভাগকে অর নাম দেওয়া হইয়াছে। উৎসর্পিণীকালে জীবগণ একান্ত দুঃখ হইতে একান্ত সুখে ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। আর অবসর্পিণীকালে জীবগণ একান্ত সুখ হইতে ক্রমশঃ একান্ত দুঃখে অবনত হয়। উৎসর্পিণীকালের যে অ-রাখ্য ছয় যুগ আছে তাহার প্রথম অরে বা যুগে মনুষ্যের একহস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য এবং ষোড়শ বৎসরমাত্র জীবিত কাল। দ্বিতীয় যুগে সপ্তহস্ত প্রমাণ দৈর্ঘ্য এবং শতবৎসর আয়ুঃকাল। তৃতীয় যুগে এক কোটি বৎসর আয়ুঃকাল এবং ৫০০ ধনুঃ দৈর্ঘ্য। চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ যুগে ক্রমান্বয়ে এক দুই ও তিন গব্যূতি দৈর্ঘ্য এবং এক, দুই ও তিন পল্য আয়ুঃকাল। এই শেষ তিন অরে বা যুগে মনুষ্যেরা কল্পদ্রুমের ফলে সন্তুষ্ট থাকিত। পল্য পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; গব্যূতি সার্দ্ধ এক ক্রোশ এবং ধনুষ্ চতুর্হস্ত পরিমাণ। এইরূপ অবসর্পিণী কালের ছয় যুগে ক্রমশঃ অবনতি হইয়া থাকে। সুতরাং উৎসর্পিণী কালের ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম যুগ ক্রমান্বয়ে অবসর্পিণী কালের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ যুগ হইবে। অবসর্পিণীকাল শেষ হইলে আবার উৎসর্পিণীকাল আরম্ভ হইবে। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে জৈনেরা হিন্দু পৌরাণিকদিগের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে কল্পনা-সেবক বলিয়া কালের এতাদৃশ অসম্ভব বিভাগ করিয়াছে। অর্হৎগণের জীবনীতেও এই কালের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অভিধান-চিন্তামণির তৃতীয় কাণ্ডের ৩৫৫—৩৬৩ শ্লোকে ৬৩ জন জৈনদিগের শলাকা পুরুষ অর্থাৎ বিখ্যাত পুরুষের নামোল্লেখ আছে।[৪] চতুর্বিংশতি সংখ্যক জিন বা অর্হৎ, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, নব বাসুদেব, নব শুক্ল বলদেব এবং নব প্রতিবাসুদেব সমষ্টিতে ত্রিষষ্টি সংখ্যক। চতুর্বিংশতি অর্হৎগণের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী যথা—ভরতপুত্র, ভরত, অজিতাত্মজ

সগর, বিজয়-তনয় মঘবা, অশ্বসেন নৃপতি-নন্দন শনৎকুমার, বিশ্বসেন-তনয় শান্তিজিন, সূরপুত্র কুন্থুজিন, সুদর্শনাত্মজ অরজিন, কার্ত্তবীর্য্য শুভূম, পদ্মোত্তর-পুত্র পদ্ম, হরিসুত হরিষেণ, বিজয়-নন্দন জয় এবং ব্রহ্মসুনু ব্রহ্মদত্ত। এই দ্বাদশ চক্রবর্ত্তীই জৈনদিগের ইক্ষ্বাকু-বংশ-সম্ভূত। নব বাসুদেবের নাম যথা—প্রাজাপত্য ত্রিপৃষ্ঠ, ব্রহ্মসম্ভব দ্বিপৃষ্ঠ, রুদ্রতনয় স্বয়ম্ভু, সোমজ পুরুষোত্তম, শৈবি বা শিবজ পুরুষসিংহ, মহাসীরঃ-পুত্র পুরুষ-পুণ্ডরীক, অগ্নিসিংহ-নন্দন দত্ত, দাশরথি নারায়ণ (রামচন্দ্র?) এবং বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ। নব শুক্ল বলদেবদিগের নাম যথা—অচল, ভদ্র; বিজয়, সুপ্রভ, সুদর্শন, আনন্দ, নন্দন, পদ্ম এবং রাম (বলরাম ?) নব প্রতি বাসুদেব বা বাসুদেব শত্রুদিগের নাম যথা—অশ্বগ্রীব; তারক, মেরক, মধু, নিশুম্ভ, বলি, প্রহ্লাদ, লঙ্কেশ্বর (রাবণ,) এবং মগধেশ্বর (জরাসন্ধ)। এই ত্রিসষ্টিসংখ্যক পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া হেমচন্দ্রাচার্য্য বহুসংখ্যক হিন্দু নাম কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে পরমার্হৎ কুমারপালের নাম করিয়াছেন। এই হিন্দুনাম সকল বৈণ্য, পৃথু, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ষড়বিংশতি সংখ্যক। কেবল শেষনাম কুমারপালের চৌলুক্য, রাজর্ষি এবং পরমার্হৎ এই বিশেষ বিশেষণ দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল কুমারপালই ইহাদিগের মধ্যে জৈন ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের ১১—৪৬০ শ্লোকে হেমচন্দ্রাচার্য্য ভূগোল বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ, ঐরাবতবর্ষ, বিদেহবর্ষ এবং কুরু-বর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। ৪।১৪ শ্লোকে আর্য্যাবর্ত্তের এই বর্ণনা করিয়াছেন,

> আর্য্যাবর্ত্তো জন্মভূমির্জিনচক্র্যর্দ্ধচক্রিণাং।
> পুণ্যভূরাচারবেদী মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ॥

হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আচারবেদি, পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত জিনচক্রী এবং অর্দ্ধচক্রীদিগের নিবাসস্থান। এতদ্ব্যতীত হেমচন্দ্র অন্তর্ব্বেদি, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মবেদি ও মধ্যদেশের স্থাননির্দেশ করিয়াছেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সমস্থলী অন্তর্ব্বেদি; সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত; কুরুক্ষেত্র-স্থিত ব্রহ্মবেদি এবং প্রয়াগের পশ্চিম এবং সরস্বতীর অদর্শনস্থান বিনশনের পূর্ব্বে স্থিত মধ্যদেশ। তদনন্তর ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক জনপদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

জৈনদিগের বিশ্বাস যে পৃথিবী অসংখ্য দ্বীপ বিশিষ্ট। প্রথম জম্বুদ্বীপ, ইহার মধ্যস্থলে সুদর্শমেরু পর্ব্বত এবং চতুর্দিকে লবণোদধি। এই লবণ সমুদ্রের পারে ধাতুকী দ্বীপ, ইহাতে বিজয় ও অচল নামে দুই পর্ব্বত আছে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে কালোদধি। এই কৃষ্ণ সমুদ্রের পারে পুষ্কর দ্বীপ, ইহাতে মন্দীরা এবং বিদ্যুন্মালী নামে দুই পর্ব্বত আছে এবং ইহার অর্দ্ধাংশমাত্র মনুষ্যগম্য, যেহেতু অনুলঙ্ঘনীয় মানুষোত্তর পর্ব্বত ইহার মধ্যভাগে উত্থিত হইয়া ইহার অর্দ্ধাংশ ব্যবহিত ও মনুষ্যের অগম্য করিয়াছে। এই পৃথিবীর নিম্নে সপ্ত নরক আছে; যথা—রত্নপ্রভা, শর্করপ্রভা, বালুকপ্রভা, পঙ্কপ্রভা, ধূমপ্রভা, তমপ্রভা এবং তমতমপ্রভা। আর পৃথিবীর উপরে পঞ্চ বিমান বা দেবতাদিগের বাসস্থান আছে; যথা—অপরাজিত, জয়ন্ত, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, বৈজয়ন্ত এবং বিজয়। পরপ্রস্তাবে জৈনধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইবে।"

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন।

ইউরোপখণ্ড পঞ্চম খ্রীষ্টীয় শতাব্দি হইতে দশম শতাব্দি পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল। সেই অন্ধকার অতি গাঢ়;

অতিবিরল একটি একটি বিদ্বান লোকের অধিষ্ঠান দ্বারা স্থানে স্থানে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের কিঞ্চিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছিল। এক জন পাদ্রি অন্য লোককে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার এবং নিজে লাটিন কবিতা অধ্যয়ন করিবার জন্য পোপ মহান্ গ্রিগরির দ্বারা ভৎসিত হইয়াছিলেন। বিষয়ী কিম্বা পাদ্রীর, রাজা কিম্বা কৃষকের সামান্য বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না। রোম নগরে এমন একটি লোক ছিল না যে বর্ণমালাও জানিত। শার্লমেন রাজার সময়ে স্পেন দেশের কোন পাদ্রিই সামান্য একটি পত্র লিখিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডরাজ এলেফ্রেড বলেন যে টেম্‌জ নদীর দক্ষিণে কোন পাদ্রি সামান্য ঈশ্বর-স্তোত্র অথবা প্রার্থনা বুঝিতে কিম্বা একটি লাটিন পত্র স্বদেশীয় প্রচলিত ভাষাতে অনুবাদ করিতে পরিতেন এমন তাঁহার স্মরণ হয় না। যখন ইউরোপ খণ্ড সহস্র বৎসর জ্ঞানরাজ্যে আধিপত্য করিয়া অজ্ঞানাবর্ত্তে এইরূপ দ্রুত বেগে নিপতিত হইতেছিল তখন আরবদেশীয় অবজ্ঞাস্পদ বর্ব্বরদিগের মধ্যে একটি মহা বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল। সে বিপ্লব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের উপদেশজনিত। বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয় মহম্মদের শিষ্যগণ দ্বারা ইউরোপের উপকার সাধন। যদাপি এই বিষয়ের সহিত মহম্মদের চরিত্র, জীবন, ও উপদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তথাপি শেষোক্ত বিষয় এরূপ বিস্তারিত ও বিশাল যে তাহা সংক্ষেপে সারা কঠিন। অতএব আমরা তাঁহাতে প্রবৃত্ত হইব না। এস্থলে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের দ্বারা মহম্মদ লোভপরবশ ও বৈরনির্যাতনপ্রিয় নরপিশাচরূপে অথবা নির্ব্বোধ ও অনিষ্টকর প্রতারকরূপে বর্ণিত হইয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহার গুণাগুণ অপক্ষপাতে বিচারিত হইতেছে। সম্প্রতি চর্চ্চ আব ইংলণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলীর একজন পাদ্রী আপনার প্রকাশিত একটি গ্রন্থে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের প্রতি বিশেষ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় আর কোন প্রচলিত ধর্ম্ম এত শীঘ্র প্রচারিত হয় নাই এবং কোন প্রচলিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীরা তদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকা বিষয়ে এতদ্রূপ দৃঢ়তা প্রকাশ করে নাই, এবং কোন ধর্ম্ম উহার ন্যায় দ্বাদশ সহস্র শতাব্দির অধিক কাল স্থিতি করিয়াও এতদ্রূপ আদিম তেজস্বিতা ও আড়ম্বরশূন্যতা অদ্যাপি ধারণ করিয়া থাকার বিষয়ে গর্ব্ব করিতে সক্ষম হয় না।

হিজরী শকের প্রারম্ভ হইতে মহম্মদের মৃত্যু পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আরব দেশ তাঁহার বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সিন্ধু নদীর সাগরসঙ্গমস্থান হইতে স্পেন দেশের দোরো নদীর মুখ পর্য্যন্ত এবং কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে বেবলমেণ্ডবের প্রণালী পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিকে আপনাদিগের রাজদণ্ডের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি বাল্যকালে উক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে মদীনার পথে সঙ্গীবিহীন নিরাশ্রয় পলাতক ব্যক্তিরূপে দেখিয়াছিলেন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ না হইতে হইতে ডামাস্কসের সিংহাসনে অধিরূঢ় তাঁহার উত্তরাধিকারীকে এক সৈন্যদল ইস্তাম্বোল আক্রমন করিতে, অন্য সৈন্যদল মরোক্কা পরাজয় করিতে, অপর এক সৈন্যদল অক্সস্ নদীর পর পারস্থ দেশ আক্রমণ করিতে, স্বীয় অর্ণবপোত সকল ভূমধ্যস্থ সাগরে পরিভ্রমণ করাইতে এবং নিজ রাজকোষ পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও আরবের কর

দ্বারা পূর্ণ করিতে দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান মনুষ্যজাতির সহিত সংসর্গ-প্রভাবে স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ও কৌতুহল-গুণ-সমন্বিত আরবজাতি শীঘ্র উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কালিফ আব্দল মালিকের কালে আরব দেশে একটি টঙ্কশালা সংস্থাপিত হয়। ইহা আরবদিগের মধ্যে একটি নূতন ব্যাপার। সকল দেশে সকল কালে যেরূপ হইয়া থাকে প্রাচীন-প্রথানুরক্ত কতকগুলি নির্ব্বোধ ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি এই নূতন ব্যাপারের বিরোধী হইল। কিন্তু তাহারা তাহাদিগের প্রতিবন্ধকতাচরণে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কালিফ ওয়ালিদ যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং যাঁহার রাজপ্রাসাদ এশিয়া খণ্ডের বোখারা এবং ইউরোপ খণ্ডের টোলিডো নগরের লুণ্ঠিত দ্রব্য দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল, তিনি মুসলমান স্থাপত্য বিদ্যার এক জন উৎসাহ-দাতা ছিলেন। মরুভূমিবাসী অসভ্য আরবেরা বৃহন্নগরে বাস করিয়া এবং প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধশিক্ষার অধীন হইয়া ক্রমে সুসভ্য ও অনুশিষ্ট হইতে লাগিল। যদ্যপি মুসলমানদিগের এই সময়ে আত্মবিচ্ছেদ না হইত তাহা হইলে আরবদিগের জয়স্রোত কিছুতেই নিবারিত হইত না। এই সময়ে আব্বাস ও ওমেয়া রাজ বংশদ্বয়ের মধ্যে স্মরণীয় বিরোধ উপস্থিত হইল এবং তাহা আরবদিগের রাজ্য বিস্তারের উচ্চাভিলাষ খর্ব্ব করিল। আব্বাস বংশীয়েরা এশিয়া ও আফ্রিকার রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বোগদাদ নামক স্থানে আপনাদিগের শোভন রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। ওমিয়ো বংশের শেষ রাজা স্পেনে পলায়ন করিয়া তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বজননিধনের দুঃসহ পরিতাপ নিবারণ করিলেন।

ওমিও ও আব্বাস রাজবংশদ্বয়ের মধ্যে শত্রুতা এবং নূতন নূতন রাজ্য জয়ের চেষ্টা হইতে বিরাম, আরবদিগের উৎসাহ ও যত্ন অন্য একটি মহত্তর বিষয়ে চালিত করিল। ঐ নূতন বিষয়ে তাহারা এরূপ অসীম গৌরব লাভ করিয়াছিল যে সে গৌরব তাহাদিগের সাম্রাজ্যের বিনাশের পর অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বোধ হয়, তাহাদিগের ধর্ম্মের লোপের পরও বর্ত্তমান থাকিবে। আরবেরা যেরূপ মহোদ্যম ও সম্বেগের সহিত দেশ-জয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল তদ্রূপ মহোদ্যম ও সম্বেগের সহিত জ্ঞানালোচনা ও সর্ব্ব প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করিল। যৎকালে হিজরী শক আরম্ভ হয় তৎকালে আরবেরা একটি যুদ্ধ-নিপুণ অসভ্য জাতি মাত্র ছিল; কিন্তু দুই শতাব্দির মধ্যে তাহারা মাধ্যমিক কালের সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ও মার্জ্জিত-জ্ঞান-সম্পন্ন জাতি হইয়া উঠিল।

কোন বিদ্যার উন্নতি সাধন করিতে গেলে তদ্বিষয়ে মানবজাতির পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক। আরবেরা এই সময়ে পুরাকালীন গ্রীকদিগের প্রণীত যে সমস্ত পুস্তক ছিল, বিশেষতঃ তাহাদিগের প্রণীত দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি অন্বেষণ করিয়া তাহা দীর্ঘ ভাষ্য সহিত অনুবাদ করিতে লাগিল। গ্রীক কবিদিগের গ্রন্থ সকল অনুবাদিত হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে ঠিক কিছু জানা নাই। আলমামন নামক বোগদাদের সপ্তম কালিফ আরমেনিয়া সিরিয়া ও মিসরে লোক নিযুক্ত করিয়া তত্তৎদেশে যে যে গ্রীক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ইস্তাম্বুলের গ্রীক সম্রাটকে একটি পুস্তকালয় প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকালয়ে টলেমি-প্রণীত "মেগালিস্

সিনটাক্সিস” নামক মহাগ্রন্থ ছিল। স্পেনস্থ করডোবার কালিক দ্বিতীয় হাকেম মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যদেশে পুস্তক-সংগ্রহ-কারক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সকল বিখ্যাত ব্যক্তিকে তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তক সকল তাঁহাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় নূতন পুস্তক রচনা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুস্তক উপহার অপেক্ষা অন্য কোন উপহার হাকেমের নিকট তত প্রীতিকর ছিল না। এই প্রকারে ইউরোপের আরব রাজারা বহু-পুস্তক-পূর্ণ বৃহৎ আয়তনের পুস্তকালয় সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হাকেমের সংস্থাপিত পুস্তকালয়ে ছয় লক্ষ পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে চুয়াল্লিশ খানিতে কেবল পুস্তকালয়স্থিত পুস্তকের তালিকা লিখিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে সত্তরটির অধিক সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেবো নগরের পুস্তকালয়ে এক লক্ষ পুস্তক ছিল; ঐ সকল পুস্তক বিনা মূল্যে সাধারণকে পাঠ করিতে দেওয়া হইত। কিছুকাল মধ্যে রাজার বিদ্যোৎসাহ ও সুরুচি প্রজাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এক জন স্বাধীনব্যবসায়ী ভিষক বলিয়াছিলেন যে তাঁহার এত পুস্তক আছে যে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চারি শত উষ্ট্র আবশ্যক।

ক্রমশঃ

ভারত-সংস্কারক ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজ।

আমরা গত সংখ্যক পত্রিকায় “ভারত সংস্কারকের” দ্বারা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ও তাঁহার অনুবর্ত্তিদিগের ক্ষমতাপ্রিয়তা দোষারোপ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তদুত্তরে উক্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন, “দেবেন্দ্র বাবু ক্ষমতাপ্রিয় একথা আমরা প্রথম বলি নাই। মিরর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি পত্র বরাবর তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য তাহা এক পক্ষের কথা। কিন্তু অন্য পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত উত্তর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এস্থলে একটি কথা জিজ্ঞাস্য— যে আদি ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য রাজা রামমোহন রায়ের কৃত ট্রষ্টী অনুসারে সকল জাতীয় লোকের ব্রহ্মোপাসনার স্থান এবং ট্রষ্টীরা তাহার অন্যথা করিতে পারেন না, কিন্তু যখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি এক স্বতন্ত্র দিনে উক্ত সমাজ-গৃহে উপাসনার জন্য প্রার্থী হইলেন তখন তাঁহাদিগকে কেন সে অধিকার দেওয়া হইল না ইহাতে ট্রষ্টডীডের কি কোন নিয়ম ভঙ্গ হইত? সাধারণের সংস্কার এই, ট্রষ্টীরা এখানে নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।” ভারত সংস্কারক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার উত্তর নিজে প্রধান আচার্য্য মহাশয় কেশব বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়াই তাহার কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার প্রত্যুত্তরে দিয়াছেন, আমরা এখানে সেই উত্তর অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। “তোমরা লিখিয়াছ যে ‘যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।’ ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে তোমরা যে কয়েকটী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্প সংখ্যক কয়েকটীকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, বাস্তবিক এক্ষা-

সাধিগের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে তাঁহাদের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমারদের ও তাঁহারদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহারদের জন্য অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না উপাসনার জন্য যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্য। কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যও নয়, সর্ব্বসাধারণের জন্য।" *

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত।)

আমরা দেশ কালের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার বিভিন্নতা দেখিতে পাই। প্রথম, দেশ হইতে কালের বিভিন্নতা; দ্বিতীয়, অসীম দেশ-কাল হইতে সসীম দেশ কালের বিভিন্নতা; তৃতীয় দেশকাল হইলে দেশকালান্তরের বিভিন্নতা; চতুর্থ, বর্ত্তমান কাল হইতে ভূত-ভবিষ্যতের বিভিন্নতা; পঞ্চম দৈর্ঘ প্রস্থ এবং বেধের বিভিন্নতা। সৃষ্টি আলোচনার সময় দেশ কালের অতীত পরমাত্মার সহিত দেশ কালের অন্তঃপাতী জগতের সম্বন্ধ আলোচনার সময়—তিনটি মাত্র মূল বিভিন্নতা সাংখ্যকারের মনে হইয়াছিল। কি? না ত্রিগুণের পরস্পর বিভিন্নতা, ত্রিগুণ-সাম্য হইতে ত্রিগুণ-বৈষম্যের বিভিন্নতা এবং আত্মা হইতে ত্রিগুণের বিভিন্নতা। সাংখ্য-দর্শন ঈশ্বর-বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, দুই একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা না বলারই মধ্যে। ঈশ্বরের সহিত ত্রিগুণের ভিন্নতা কিরূপ এবিষয়ে নিরীশ্বর সাংখ্য কিছুই বলেন নাই বটে কিন্তু সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল তাহা বলিতে ত্রুটি করেন নাই। পাতঞ্জল বলিয়াছেন "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" অবিদ্যা-মূলক যে ক্লেশ এবং কর্ম্মফল-পরিপাকের আধার যে সংস্কারাত্মক বাসনা সমূহ তাহা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। সাংখ্য মতে আত্মামাত্রই নির্গুণ কিন্তু ত্রিগুণের সংসর্গদোষে জীবাত্মা নির্গুণ হইয়াও সগুণ; সাধন বিশেষ-দ্বারা ত্রিগুণের সঙ্গ-ত্যাগ করিতে পারিলেই তবে তিনি আপনার স্বরূপ লাভ করেন—নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করেন—আপনি যাহা তাহাই হন, যতক্ষণ তাহা না হন ততক্ষণ আপনি যাহা নহেন তাহাই আপনাকে মনে করেন; দুঃখ সুখ মোহপাশে বদ্ধ মনে করেন। এই রূপ বন্ধন-সংস্কারই জীবাত্মার বন্ধন, এবং তাহা হইতে মুক্তিই জীবাত্মার মুক্তি সাংখ্যের এই প্রকার মত। কি উপায়ে জীব মুক্তিলাভ করেন? না সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধন দ্বারা। (পাতঞ্জল বলেন) কিন্তু ঈশ্বরেতে নিত্য কালই সত্ত্ব-গুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে—তাহাতে সাধনের অপেক্ষা নাই; "তস্য চ তথাবিধমৈশ্বর্য্যম্ অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ।"

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মনোগত অভিপ্রায় এইরূপ। সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ জীবাত্মাকেই বন্ধন করিতে পারে, পরমাত্মাকে নহে। কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, পরমাত্মাতে যদি সত্ত্বগুণ (প্রকাশক বস্তু) না থাকে তবে "তিনি স্বপ্রকাশ" এ কথা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সত্ত্বগুণ পরমাত্মাকে প্রকাশ করিবে কি, পরমাত্মার প্রকাশ দ্বারাই সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হইতেছে—সত্ত্বগুণ পরমাত্মার প্রকাশের অনুপ্রকাশ মাত্র। যে-প্রকাশ বিরোধী বস্তু দ্বারা বাধা পাইতে পারে তাহাই সত্ত্বগুণের প্রকাশ। দৈর্ঘ প্রস্থ বেধের ন্যায় সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ পরস্পরাপেক্ষ অর্থাৎ বস্তু বিশেষে দৈর্ঘ-প্রস্থ বেধের যেমন ন্যূনাধিক্য দেখা যায় তেমনি বস্তু-বিশেষে গুণ তিনটির ন্যূনাধিক্য হইতে পারে. কিন্তু কোন একটি গুণ মূলেই নাই এরূপ হইতে পারে না। এক খণ্ড স্বর্ণকে যদি দৈর্ঘে বাড়াও, তবে তাহার প্রস্থ এবং বেধ কমিয়া যাইবে, প্রস্থে বাড়াও দৈর্ঘ এবং বেধ কমিয়া যাইবে; বেধ বাড়াও দৈর্ঘ এবং প্রস্থ কমিয়া যাইবে, কিন্তু সহস্র কমিলেও তিনের কোনটি আদবেই নাই এরূপ হইতে পারিবে না। এই কাগজটির বেধ এত অল্প যে তাহা মনে ধারণা করাই সুকঠিন, কিন্তু তাহা আছে-যে তাহাতে আর সংশয় নাই। যেমন দৈর্ঘ বেধ-বিহীন প্রস্থ থাকিতে পারে না প্রস্থ-বেধ-বিহীন দৈর্ঘ থাকিতে পারে না, দৈর্ঘ-প্রস্থ-বিহীন বেধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ কোন বস্তুতে সত্ত্বরজো-বিহীন তমঃ অথবা তমরজোবিহীন সত্ত্ব, অথবা সত্ত্ব-তমো-বিহীন রজঃ একাকী থাকিতে পারে না। সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণ এইরূপ আপেক্ষিক। কিন্তু ঈশ্বরের যে স্বপ্রকাশ মহিমা তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্ব-গুণের ন্যায় আপেক্ষিক নহে, তাহা বাধা-গ্রস্থ নহে, এজন্য যদি ইচ্ছা কর তবে তাহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিতে পার, কেবল এইটি মনেরাখিও যে, তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের ভিতরকার

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮০৭ শক।

বাপায়ুক্ত সত্ত্বগুণ নহে,প্রকৃতির ভিতরকার সত্ত্বগুণ নহে, রজস্তমোহপেক্ষ সত্ত্বগুণ নহে অর্থাৎ তাহাকে সত্ত্বগুণ না বলিলেই ভাল হয়। কেননা যাঁহার প্রকাশেতে করিয়া সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হয়, তাঁহাকে সত্ত্বগুণ বলিলে ভ্রমোৎপত্তির একটি পথ খুলিয়া রাখা হয়। পাতঞ্জল যে বলিয়াছেন ঈশ্বরেতে সত্ত্বগুণ ঐকান্তিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাঁহার অর্থ এই যে, তাহা রজস্তমো কর্তৃক কিছুমাত্র বাধাগ্রস্ত নহে, সুতরাং তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণ হইতে ভিন্ন। ইতিপূর্ব্বে যাহা একবার বলিয়াছি তাহা আবার বলি ; পীতবর্ণ উপচ্ছটা যেমন মূল চ্ছটার সদৃশ আবির্ভাব, রক্তবর্ণ কলুষিত আবির্ভাব, নীলবর্ণ বিসদৃশ আবির্ভাব ; সেইরূপ সত্ত্ব-গুণ ঐশী শক্তির সদৃশ আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, এবং তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। বিভিন্নতা ব্যতিরেকে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না, ত্রিগুণের বিভিন্নতাই আর আর সমুদায় বিভিন্নতার মূলে বর্ত্তমান আছে। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ আবির্ভাব হইলেও তাহা আবির্ভাব মাত্র, ছায়া মাত্র—সুতরাং ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ মহিমা হইতে তাহা ভিন্ন। পরমাত্মার যে স্বপ্রকাশভাব তাহা ত্রিগুণাতীত।

অতঃপর ত্রিগুণাত্মক জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ক্রম কিরূপ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

BRAHMA SOMAJ OF THE PUNJAB

Dated Lahore, the 23rd June, 1878.

No.

From

The Secretary of the Brahma Somaj of the Punjab, Lahore.

To

The Secretary Adi Brahmo Somaj, Calcutta.

Sir

In accordance with a resolution passed [illegible] of the members of the Brahmo Somaj Punjab held on the 19th Instant, I [illegible] send you copy of the following resolution and request its insertion in your organ [illegible] information of the other Samajes.

Proposed by Babu [illegible]jolal Ghose and [illegible] Narayn and passed [illegible]

That the Punjab Brahma Somaj has acted [illegible] up to this time and desires to [illegible] in the same way for the future, consequently it will continue to co operate with all the Brahmo Somajes for the diffusion of Theism and other beneficent work.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obdt Servant

BANEE PERSHAD.

THE HINDU SOMAJ.

It is highly derogatory to enlightened Hindus that they resort to hypocrisy. The Hindu Shastras have plainly stated that there is only One God and that He is immaterial. It is obviously for the uneducated that the worship of the Deity in imaginary forms has been allowed. But it is highly derogatory to the educated Hindus that they voluntarily degrade themselves to the level of their uneducated brethren inasmuch as they do not evince the moral courage of stating that they believe according to the instructions of the Shastras in a figureless Deity. This behaviour is quite opposed to Hindooism and ignores the distinction of the educated and uneducated made in the Shasters. It is a matter of deep regret that Non-Hinduism is now-adays passing for Hinduism so much so that an orthodox Hindu will not venture to acknowledge that he worships a formless God in accordance with the higher portion of the Shasters. He will rather dissemble his opinion or resort to silence in an enquiry concerning his religion. This silence or hypocrisy is not at all demanded by orthodoxy which allows a broad margin for the most refined faith that men can possibly have. Hypocrisy or silence concerning faith and that too resorted to gratuitously, is fertile in mischief. It is supremely hostile to truth and its propagation and consequently to a healthy development of society. If Hinduism be faithfully followed, then there will be very little doctrinal distinction between Brahmos and the enlightened Hindus. The Adi Somaj, as a writer in the *Tattwabodhini Patrika* has truly called it, is the refined Hindu Somaj but strange to say that even enlightened Hindus shrink from identifying themselves with that Somaj The sacrifice of truth to interest is a gigantic calamity and is made without any imperious necessity as stated hereinbefore. Such a sacrifice, though for the sake of some necessity, is not justifiable and how much the mischief is aggravated in a case where there is no sort of necessity needs scarcely be mentioned.

(To be continued.)

KISSORILAL ROY.
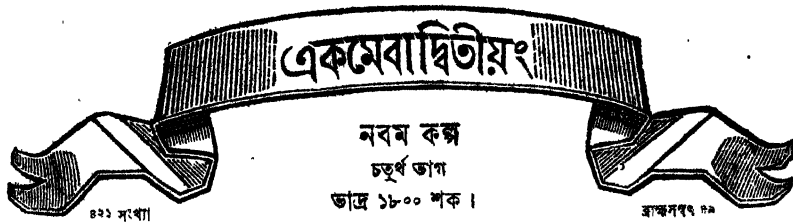
Registered No 52.

নবম কল্প

চতুর্থ ভাগ

ভাদ্র ১৮০০ শক।

৪২১ সংখ্যা   ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তেন কিং।

যদি আমি ব্যাধি-শয্যায় পতিত থাকিয়া শারীরিক অসুখে অস্থির হই, যদি রোগের যাতনা নিবন্ধন দণ্ড, পল, অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী বোধ হয় এবং জগতের কোন বস্তু ভাল না লাগে, "তেন কিং?" তাহাতেই বা কি? পরম ভিষক ত আমার নিকটে আছেন, তিনি ত আমার গাত্রে হস্ত বুলাইতেছেন, তিনি ত আমাকে মাতার ন্যায় যত্ন করিতেছেন, তিনি ত হয় আমাকে আরোগ্য প্রদান করিবেন নয় পরম বন্ধু মৃত্যুর সহায়তা দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ ধামে লইয়া যাইবেন, এই সকল চিন্তার দ্বারা আমি মনকে সুস্থির রাখিতে পারি। যদি দারুণ দারিদ্র্যাবস্থায় পতিত হই, যদি কেবল শাকান্ন আহার করিয়া কাল যাপন করিতে হয়, যদি সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা কিছুমাত্র উপভোগ করিতে না পাই, যদি সকলে অবজ্ঞা করে, যদি অনিত্য ঐশ্বর্য্য-মদে স্ফীত ব্যক্তিরা আমাকে তাচ্ছিল্য করে, "তেন কিং?" তাহাতেই বা কি? যদি আমার সামান্য অর্থ না থাকে পরমার্থ ত আমার আছে, যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ধনাগার না থাকে সন্তোষের ধনাগার তো আমার আছে, যদি দাস দাসী না থাকে তথাপি ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, ঈশ্বর-প্রীতি, ও দয়ারূপ সহচর সহচরী ত আমার আছে। যদি অন্যায় রূপে আমার অযশ সর্ব্বত্র পরিঘোষিত হয়, যদি যেখানে কেবল আদর প্রাপ্ত হইতাম সেখান হইতে উদাসীন ব্যবহার প্রাপ্ত হই, যদি যেখানে যাই সেইখান হইতে লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হই, যদি সকলে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে "তেন কিং?" তাহাতেই বা কি? আমি ত মনে জানি যে আমার নিজের কোন দোস নাই, আমি ত মনে জানি যে কেবল যাঁহার নিকট আমি আমার কার্য্যের জন্য দায়ী তিনি ত আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন। যদি অন্যায় রাজাজ্ঞায় আমাকে দ্বীপান্তরিত হইতে হয়, যদি যে স্থানের সহিত আমার বাল্যসখিত্ব, যে স্থান আমার প্রাণপ্রিয়জনদিগের আবাস, সেই স্থান সেই আজ্ঞাক্রমে পরিত্যাগ করিতে হয়, "তেন কিং?" তাহাতেই বা কি? সেই দ্বীপে যে পৃথিবী সকল-মনুষ্যের সাধারণ গৃহ সেই পৃথিবী ত আমার থাকিবে, যে সূর্য্য আমার স্বদেশে সমুদিত হইয়া সকল জীবের মনে

আহ্লাদ সঞ্চার করিতেছে সেইখানেও সেই সূর্য্য সমুদিত হইয়া সমস্ত জগৎকে আহ্লাদিত করিবে, যে চন্দ্র স্বকীয় সুধাময় কিরণ দ্বারা স্বদেশকে রজতবঞ্জনে রঞ্জিত করিতেছে, সেই চন্দ্র সেই স্থানকেও স্বকীয় সুধাময় কিরণ দ্বারা রজতরঞ্জনে রঞ্জিত করিবে, এখানেও যে অন্তরতর অন্তরতম পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইতেছি, সেখানেও সেই অন্তরতর অন্তরতম পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইব। মৃত্যু যদি এক্ষণেই স্বকীয় তীক্ষ্ণ করবাল দ্বারা আমার পৃথিবীস্থ শিবির-বন্ধ ছেদন করে "তেন কিং?" তাহাতেই বা কি? আনন্দের দ্বার হইতে ভয়ের সহিত বিমুখ হওয়া আমার রীতি নহে। যদি প্রলয়কাল এখনি উপস্থিত হয়, যে আকর্ষণ-সূত্রে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু গ্রথিত রহিয়াছে তাহা যদি এক্ষণেই বিচ্ছিন্ন হইয়া সে সকল জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রতিঘাত পূর্ব্বক চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে থাকে "তেন কিং" তাহাতেই বা কি? আমি নিশ্চয় জানি যে আমার অমর আত্মা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, উহা চির যৌবনান্বিত হইয়া সেই অমৃত পুরুষের সঙ্গে অমৃত উপভোগ করিবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃতি।

যখন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হন তখন তিনি ও তাঁহার অনুবর্ত্তি ব্রাহ্মেরা তথায় স্বতন্ত্র এক দিন উপাসনার জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট আবেদন করাতে এবং তিনি সেই আবেদন গ্রাহ্য না করাতে সম্প্রতি কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহাদের মুখস্বরূপ কোন কোন সংবাদ পত্রে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিতেছেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে যদি প্রধান আচার্য্য মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের দলকে আদি ব্রাহ্মসমাজে স্বতন্ত্র দিনে উপাসনা করিতে দিতেন তাহা হইলে ঐ দল হইতে পৃথক হইয়া সম্প্রতি যে এক ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও সমাজে আর এক দিন উপাসনা করিতে দিতে হয়। কে জানে যে ভবিষ্যতে এই দল হইতে আর এক ব্রাহ্মদল বহির্গত না হইবে? সে দল উৎপন্ন হইলে তাহাকেও আর এক দিন উক্ত সমাজে উপাসনা করিতে দিতে হইবে এই রূপ যদি এক শত ব্রাহ্মদল হয় তাহাদিগের প্রত্যেককে সমাজে এক এক দিন উপাসনা করিতে দিতে হইবে। রামমোহন রায়ের ট্রস্ট্‌ডীডে লিখিত আছে যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা উক্ত সমাজে সমাগত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে, অতএব ব্রাহ্মদলকে কেন, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রত্যেক দলকে সমাজে উপাসনা করিতে দিতে হয় কিন্তু পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত এত দল আছে যে এই রূপ করিয়া স্বতন্ত্র দিনে সকল দলকে উপাসনা করিতে দিলে কোন একটি বিশেষ দলের ভাগ্যে পুনরায় এক দিন তথায় উপাসনা করা ঘটিয়া উঠে কি না সন্দেহ।

স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এরূপ করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলিকে প্রশ্রয় দেওয়া রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় নহে। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এক সময়ে একাসনে বসিয়া সকল জাতির সাধারণ পিতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে।

পৌত্তলিকতা।

যে সকল ব্রাহ্ম অন্য ব্রাহ্মের প্রতি সহসা পৌত্তলিকতা-দোষ আরোপ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের বিবেচনার্থ এই কয়েক পংক্তি অর্পিত হইতেছে।

ব্রাহ্মেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে পরব্রহ্মরূপে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবেন না অতএব পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের অবশ্য পরিহার্য্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পৌত্তলিক ব্যবহার আপনা হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক কমিয়া আসিতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কোন প্রচলিত ধর্ম্মোৎসবে প্রতিমার উপাসনা করেন না ও প্রতিমাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন না। ব্রাহ্মেরা এপ্রকার পৌত্তলিকতা অনায়াসে পরিহার করিতে পারেন কিন্তু আর এক প্রকার পৌত্তলিকতা পরিহার করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হয়। হিন্দুসমাজের গঠনে পৌত্তলিকতা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে এই জন্য ব্রাহ্মেরা অন্যান্য বিষয়ে পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়াও শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি গার্হস্থ ক্রিয়ায় পৌত্তলিকতা পরিহার করা দুষ্কর বোধ করেন, তথাপি এক্ষণে দেখা যায় যে অনেক ব্রাহ্ম নির্দ্দিষ্ট প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া সেই পদ্ধতির অনুসরণ করেন। যাঁহারা উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, তাঁহারা যে সকল ব্রাহ্মকে পৌত্তলিক মনে করেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেককে ক্রিয়াকালে প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া সেই ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায়। অনেক ব্রাহ্ম কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ব্রাহ্ম-পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া এই রূপ করিয়া থাকেন কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতির কোন্ অংশ পৌত্তলিকতা-দোষ-সংস্পৃষ্ট ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তি ব্রাহ্মেরা তাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন না। আবার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তি ব্রাহ্মেরা যাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা তাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার্থ এই বিষয়ে পরস্পরের প্রতি পরস্পর ঔদার্য্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোন ব্রাহ্ম সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করিলে তাঁহাকে অনুযোগ করা যাইতে পারে কিন্তু তিনি যদি প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিবর্জ্জন কালে কোন বিশেষ অংশ আপত্তিজনক মনে না করিয়া তাহার অনুসরণ করেন কিন্তু আমি সে অংশ পৌত্তলিকতা দোষ-সংস্পৃষ্ট মনে করি তাহা হইলে তাঁহার উপর পৌত্তলিকতা-দোষ আরোপ করা আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমি প্রচলিত পদ্ধতির যে অংশ পৌত্তলিকতা-সংস্পৃষ্ট মনে করি তাহা আর এক জন অপৌত্তলিক ব্রাহ্মকে তাঁহার নিজের অনভিমতে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা এক প্রকার আধ্যাত্মিক পীড়ন বলিতে হইবে। এ বিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য। কাহারও ধর্ম্ম-বিবেকের স্বাধীনতা অপহরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

অবশেষে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই কোন ব্রাহ্ম পৌত্তলিক ব্যবহার করিলে যাঁহারা হুলস্থূল উপস্থিত করেন তাঁহারা বাহ্য পৌত্তলিকতার বিষয় যত ধরেন আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার বিষয় তত ধরেন না কেন? বাহ্য পৌত্তলিকতা অপেক্ষা কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি রূপ পুত্তলিকার উপাসনা যে আরো ভয়ানক। এতদ্ব্যতীত কোন বিশেষ জাতিকে সমাজের সম্পূর্ণ আদর্শ জ্ঞান করা

রূপ সামাজিক পৌত্তলিকতা আছে। কোন কোন ব্রাহ্ম ইংরাজ জাতিকে যে উপাস্য পুত্তলিকা করিয়া তুলিয়াছেন সে পৌত্তলিকতা পরিহারের উপায় কি? সম্প্রতি কোন প্রবীণ ব্রাহ্ম কোন ব্রাহ্ম সম্বাদ পত্রে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে যাঁহারা বিদেশীয় রীতি নীতি অবলম্বন করেন তাঁহারই উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-পদের বাচ্য-যেন ধুতি চাদর পরিয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্ম হইতে পারা যায় না। ইহা অপেক্ষা সামাজিক পৌত্তলিকতা আর অধিক হইতে পারে না।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন।

৪২০ সংখ্যক পত্রিকার ৭৮ পৃষ্ঠার পর।

আরবেরা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে অল্প মনোযোগী ছিল না। হাকেমের রাজত্বকালে করডোবা নগরে আশিটি মহাবিদ্যালয় ছিল; এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রানাডা নগরে পঞ্চাশটি ঐরূপ বিদ্যালয় ছিল। বোগদাদ নগরে একটি মহাবিদ্যালয় সংস্থাপনে ১০ লক্ষ-মুদ্রা ব্যয়িত হয়। ঐ বিদ্যালয়ে প্রায় ছয় সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং উহা হইতে প্রতি বৎসরে পঁচাত্তর সহস্র টাকা আয় হইত। ওমিয়া বংশের যুবরাজেরা স্পেনের বিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়ন করিতেন এবং পুরস্কার লাভার্থে নানা প্রকার পরীক্ষা দিতেন। আরব রাজগণ কর্ত্তৃক সামান্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত হারুণঅলরসিদ আপন রাজ্যে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং এক জন নেষ্টোরয়নি সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয়ানকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ান রাজগণ হারুণের এই কার্য্য হইতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ঔদার্য্য বিষয়ে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। এই রূপে আরবেরা দুই শতাব্দীর মধ্যে মানবজাতির মানসিক উন্নতির জন্য এমন উপায় সকল অবলম্বন করিল যে আরবদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক রাজাদিগের সময়ে এলেকজেণ্ড্রিয়া ব্যতীত কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় নাই।

আরবেরা এই রূপে পুরাতন জ্ঞান খনির আবিষ্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া আপনাদিগের ভাষায় একটি নূতন সাহিত্য প্রস্তুত করিতে অল্প চেষ্টিত ছিল না। তাহারা তৎকালে যে সকল নূতন অতীব শোভনীয় সাহিত্য-রচনা করিয়াছিল তৎসমুদয় অদ্যাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিশেষ সম্মান ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই কালের আরবীয় সাহিত্য অতিশয় বিস্তৃত এবং উহার ভাষা অতি সুন্দর ও সুমার্জ্জিত ছিল। বিশেষতঃ স্পেন দেশীয় আরবেরা ধীশক্তির অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সকল উল্লিখিত গুণের জন্য আরও অধিকতর বিখ্যাত ছিল। কেবল করডোবা মালাগা, আলমিরা, এবং মুরসিয়া নামক স্থানে প্রায় তিন শত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক এবং অন্ধ ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত দেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারের বৃদ্ধি কল্পে সহকারিতা করিয়াছিল; এবং এক জন আরব গ্রন্থকার ইতিহাস, আইন, নীতিশাস্ত্র ও ভৈষজ্য বিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন বিষয়ে এক সহস্র পঞ্চাশ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আরব গ্রন্থকর্ত্তাদিগের রচনা সংক্ষেপতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, প্রথম দর্শন; দ্বিতীয় বিজ্ঞান; তৃতীয় সাধারণ সাহিত্য। এই কয়েক বিষয়ে তাহাদিগের উন্নতির সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিবার মানস করি।

এসিয়াখণ্ডে পৃথিবীস্থ ছয়টী প্রধান প্রধান ধর্ম্ম প্রথম সম্ভূত হয় এবং অদ্যাপি অল্প বা অধিক উন্নত অবস্থায় সে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ধর্ম্মালোচনাপরায়ণ এসিয়ানিবাসীদিগের মধ্যে গভীর ও নিগূঢ় চিন্তার প্রতি আগ্রহ চিরকাল পরিলক্ষিত হয়। আরবেরা ইহার ব্যভিচার-স্থল ছিল না। আরবেরা দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় এরূপ উদ্যমের সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে স্পেন দেশীয় এস্কুরিয়েল নামক বিশাল পুস্তকাগারের অর্দ্ধ অন্ধকারময় গৃহে যে বিখ্যাত পুস্তক সংক্রীত ও পরিরক্ষিত আছে তাহার নবমাংশের একাংশ আরব গ্রন্থকর্ত্তাদিগের কর্ত্তৃক প্রণীত ন্যায় ও তত্ত্ববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থ। গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যে এরিস্টটলের দার্শনিক প্রণালীতে স্থানীয় বিশেষত্ব অতি অল্পই ছিল এই জন্য তাহা এসিয়াবাসীদিগের মনের সহিত যেমন মিলে এমন অন্য গ্রীক দর্শন-কর্ত্তার প্রণালী মিলে না। আরবেরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়াছিল। এই সময়ে ইউরোপবাসী খ্রীষ্টীয়ানেরা এরূপ অজ্ঞ ছিল যে তাহারা বহু-পুরুষ-পরম্পরা এরিষ্টটলের গ্রন্থ গ্রীকভাষাতে অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ ছিল, আরবেরা তাঁহাদিগকে আরিষ্টটলের গ্রন্থের সহিত প্রথম পরিচয় করিয়া দেয়। আরবদিগের এই অত্যারূঢ় গুরুভক্তি কোন কোন বিষয়ে তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, যেহেতু তাহারা স্বকপোল চিন্তার মনোরম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া টীকাকারের নীরস ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। মুসলমান জ্ঞানীরা বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি পরিচালনায় অভ্যস্ত হইয়া জাতীয় ধর্ম্মের ভ্রম সকল অনুভব করিতে সক্ষম হয়, এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গত ও উন্নত মত অবলম্বন করিতে প্রয়োজিত হয়। অদ্বৈতবাদ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া পরিশেষে সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পদার্থেই বিলীন হয় এই বিশ্বাসটি শিক্ষা দেয়; শিক্ষিত এসিয়ানিবাসীদিগের মনের সহিত সেই অদ্বৈতবাদের চিরকালই মৈত্রী ভাব দৃষ্ট হয়; এই অদ্বৈতবাদ আরব দার্শনিকদিগের দ্বারা সাধারণতঃ আদরের সহিত গৃহীত হইল। এবারুস নামক বিখ্যাত আরব দার্শনিক এবং তাঁহার সমব্যবসায়ীরা যে সকল প্রশস্ত গৃহে উপদেশ দিতেন সে সকল গৃহ এক্ষণে সমভূম হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল এক্ষণে পণ্ডিতসমাজে অধীত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারাই মধ্য কালে ইউরোপখণ্ডে প্রথম সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ভাব উদ্দিক্ত করিয়াছিলেন যাহার প্রভাবে আমরা এক্ষণে স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান আলোচনার সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি।

গ্রীক বিদ্যা আলোচনা করিয়া আরবেরা কেবল বহুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল এমত নহে, হিপার্কস ও আর্কিমিডিস প্রভৃতি গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সকলের আবিষ্ক্রিয়ার প্রকৃত উপায়ও শিক্ষা করিয়াছিল। দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্ক্রিয়ার প্রণালী এথেন্স ও আইওনিয়াতে অবলম্বিত হয় নাই কিন্তু পরিশেষে উহা আলেকজেণ্ড্রিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হওয়াতে অনেক আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। আরবেরা এই প্রণালী অন্ধকার হইতে উদ্ধার করে, এবং পুনরায় পদার্থ-বিদ্যার আলোচনায় নিয়োগ করিয়া অনেক সত্যের আবিষ্ক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হয়। ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই গেলিলিও ও নিউটন অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্য সকল

আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। আরবেরা সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গণিত শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিত। আরবেরাই প্রথমতঃ দশ গণিতাঙ্ক ইউরোপে প্রচালিত করে এবং বীজ-গণিত সম্বন্ধীয় কতকগুলি অত্যাবশ্যক সত্য আবিষ্কৃত করিয়া ঐ বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধন করে। ত্রিকোণমিতি গণিত আরবদিগের পরিচিত ছিল। আরবেরাই এই গণিতকে ই-হার বর্ত্তমান আকার প্রদান করে। বোগদাদ নগরের স্থাপনকর্ত্তা আলমনসর নিজে জ্যো-তির্ব্বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। আলমামন প্রা-চীন-মত-ভক্ত ব্যক্তিগণের লাঞ্ছনা তুচ্ছ ক-রিয়া আপন অধিকারে নিযুক্ত জ্যোতির্ব্বেত্তা-গণের সাহায্যে ভৌগোলিক চক্রের একটি অক্ষাংশ পরিমাণ করাইয়া পৃথিবীর পরিধি দ্বাদশ সহস্র ক্রোশ স্থির করেন। এই সত্যটি ইহার অগ্রে কেহ আবিষ্কার করে নাই, এমন কি ইহার সাত শতাব্দি পরে কলম্বস ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবীর যে পরিধি স্থির করিয়াছিলেন তাহা ভ্রমাত্মক। কয়েক শতাব্দির মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, বিষুব কাল, সূর্য্যক্রান্তি, গ্রহদিগের সংযোগ, নক্ষত্রদিগের অদর্শন কাল, প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত নানা বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আরবেরা পুরাকালীন জ্যোতির্ব্বিৎ-দিগের ঐসকল বিষয়ে ভ্রমসঙ্কুল মত সকল সংশোধন করিয়াছিল। পারস্য দেশের জ্যোতির্ব্বেত্তারা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই যে তাহারা পুরাকালীন পঞ্জিকার নানা রূপ ভ্রম সংশোধন করিয়া তাহার পুনঃ-সংস্কার করেন। ইউরোপীয়েরা ইহার পাঁচ শতাব্দী পরে আপনাদিগের পুরাতন পঞ্জিকা সংশো-ধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আরবেরাই সময় নিরূপণ করিবার জন্য দোলযন্ত্র সর্ব্ব-
[illegible]

প্রথমে তাহাদিগের সাম্রাজ্যে গ্রহনক্ষত্রাদি নিরীক্ষণার্থ মানমন্দির সকল নির্ম্মাণ করে। যন্ত্রতত্ত্ব ও জলতত্ত্ব এই দুইটি বিজ্ঞানের আরবেরা বিশেষ উন্নতি সাধন করে। পদার্থ সকল জলের উপরি ভাগে কেন ভাসে ও কেনই বা ডুবে ইহারা এতৎ বিষয়ক কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া ছিল, এবং নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যা-কর্ষণের নিয়ম-নিষ্ঠ সামান্য জ্ঞানও লাভ করিয়াছিল। গ্রীসের দৃষ্টিবিজ্ঞানবিদেরা বলিতেন চক্ষু হইতে রশ্মি দৃষ্ট পদার্থে গিয়া লাগে, আরবেরা ঐ ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক দৃষ্ট পদার্থ হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া চক্ষুতে আসিয়া লাগে এই সত্য প্র-চার করিয়া দৃষ্টিবিজ্ঞানবিদ্যাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপনা করে। আলহাজেন নামক কোন আরব বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, আলোক আকাশের মধ্য দিয়া ঋজু-রেখায় না আসিয়া বক্রগতিতে আসিয়া থাকে এবং তজ্জন্য আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রকে উদয়ের অগ্রে ও অস্তের পরেও কিয়ৎ-কাল দেখিতে পাই। আরবেরা রসা-য়ন বিদ্যার জন্মদাতা। তাহারাই প্রথমে রসায়ন বিদ্যার বিশেষ আলোচনা আরম্ভ করে। আরবেরা নানা রাসায়নিক সত্য ও নূতন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত করিয়া ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া যায়। তাহারা ক্ষার ও অম্ল পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ ও দ্রাবক ও ক্ষারজান অম্ল এবং সুরাসারের আবিষ্ক্রিয়া করে। এই রূপ সকল বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা ও উন্নতি হওয়াতে ভৈষজ্য বিদ্যা ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে রীতিমত ভৈষজ্য বিদ্যার আলোচনা ও শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ঐ বিদ্যায় পরীক্ষো-তীর্ণ হইলে আরবের বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া

ছিল। চিকিৎসা বিদ্যার পরীক্ষা-রীতি তখন ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত ছিল না। বোগদাদ নগরেই প্রায় আটশত আটজন পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রশংসা-পত্র-প্রাপ্ত আরব চিকিৎসক ছিলেন। এই আরব চিকিৎসকেরা আপনাদিগের কার্য্যে যে অতি নিপুণ ছিলেন তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে দক্ষিণ ইউরোপের গর্ব্বিত ও পক্ষপাতী রাজগণ ঐ সকল চিকিৎসকের বিশেষ সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগকে স্ব স্ব চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

কলিকাল।

(বিষ্ণুপুরাণ হইতে অনুবাদিত)

আমরা ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তাহা বলিবার অলৌকিক ক্ষমতাতে বিশ্বাস করি না কিন্তু এক জন দূরদর্শী ঋষি স্বীয় বুদ্ধিবলে বহুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা প্রকাশ করিলাম।

ব্রহ্মন্! কলিযুগে মানবগণের প্রবৃত্তি ও আচার ব্যবহার বর্ণের অনুরূপ ও আশ্রমের অনুরূপ হইবে না। মনুষ্যেরা বেদবিধি অনুসারে ক্রিয়াকাণ্ড করিবে না। ব্রাহ্ম দৈব আর্য্য প্রভৃতি আট প্রকার বিবাহের মধ্যে যে বিবাহ যাহার পক্ষে ধর্ম্মানুমোদিত সে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। গুরু, শিষ্যের প্রতি ও শিষ্য,গুরুর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন না। দম্পতির যেরূপ ব্যবহার আবশ্যক তাহার অন্যথা ঘটিবে। দেব-ভক্তিতে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান রহিত হইয়া যাইবে। বলবান ব্যক্তি নীচ কুলে জন্মিলেও সকলের অধীশ্বর হইবে। জাতি-নিরপেক্ষ হইয়া বিবাহ প্রচলিত হইবে। কলির ব্রাহ্মণ যথারীতি দীক্ষিত হউন বা না হউন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। প্রায়শ্চিত্ত কেবল লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হইবে। তৎকালে মনুষ্যের যে কোন বাক্যই শাস্ত্র, মনঃকল্পিত দেবতার সৃষ্টি ও ইচ্ছানুরূপ আশ্রমের সৃষ্টি হইবে। মনুষ্যেরা অল্পমাত্র ধনে গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে। স্ত্রীলোকের কেশমাত্রেই রূপগর্ব্ব উপস্থিত হইবে। সুবর্ণ মণি রত্ন ও বস্ত্র প্রভৃতি কিছুই সুলভ থাকিবে না। রমণীগণ কেবল কেশেই আপনাদিগকে সুবেশ মনে করিবে। নির্ধন স্বামী উহাদের ত্যাজ্য এবং ধনবানই উহাদের গ্রাহ্য হইবে। যে ব্যক্তি দানশৌণ্ড সেই সকলের প্রভু হইবে। কৌলিন্য নিবন্ধন প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে। মনুষ্যেরা গৃহাদি নির্ম্মাণকেই ধন সঞ্চয় মনে করিবে। সকলেই অর্থোপার্জ্জনে ব্যগ্র, জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইবে। সঞ্চিত অর্থ নিজের ভোগেই পর্য্যবসিত হইবে। স্ত্রীজাতি রমণীয় বস্তুতে স্পৃহাবতী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। তৎকালে অন্যায়ত উপার্জ্জন করিতে সকলেই লোলুপ হইবে এবং সুহৃদদের প্রার্থনাতেও কেহ স্বার্থহানি করিবে না। শূদ্রাদির এরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইবে যে, পুরুষত্বে আমি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ন্যূন নহি তবে আমার সহিত তাঁহার ইতর বিশেষ কি? দুগ্ধের পরিমাণ অনুসারে গোগণের প্রতি গৌরব বৃদ্ধি হইবে। তৎকালে প্রায়ই অনাবৃষ্টি, প্রজারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জলবিন্দু প্রত্যাশায় সতৃষ্ণ নয়নে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। এই অনাবৃষ্টি-জনিত দুঃখে কাতর হইয়া লোকে ফল মূল পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অধিকাংশই ধনহীন হইয়া দুর্ভিক্ষে ক্লেশ ভোগ করিবে। আমোদ প্রমোদ লুপ্ত হইয়া যাইবে। লোকে অস্নাত হইয়া আহার করিবে এবং অতিথিসৎকার ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি

রহিত হইবে। রমণী লুব্ধস্বভাবা উদর-পরায়ণা বহুপ্রসবা ও দুর্ভগা হইবে। তাহারা উভয় হস্তে মস্তক কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক গুরুজন ও স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, আহার ও পরিচ্ছদেই তাহাদের অভিরুচি হইবে, দেহ ক্ষুদ্র ও সংস্কারহীন হইবে। নিষ্ঠুর ও মিথ্যা বাক্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। তাহারা স্বয়ং দুঃশীলা এবং দুঃশীল পুরুষেও তাহাদের অনুরাগ জন্মিবে। কুলকামিনীরা অসৎ-চরিত্রা হইয়া পুরুষের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিতে থাকিবে। ব্রত নিয়মাদি-রহিত ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করিবে। দানের পাত্রাপাত্র-বিচার থাকিবে না। যাহারা বানপ্রস্থ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী তাহারা পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত মিত্রাদি সম্বন্ধে বদ্ধ হইবে।

রাজগণ প্রজাপালন না করিয়াও শুল্কছলে প্রজাদের ও বণিকগণের ধন হরণ করিবে। যে ব্যক্তির বহু পরিমাণে হস্ত্যশ্ব রথ থাকিবে সেই রাজা হইবে। দুর্ব্বলেরা ধনবানের ভৃত্য হইয়া থাকিবে। বৈশ্যেরা স্বকার্য্য কৃষি বাণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কারুকর্ম্ম ও সেবা দ্বারা জীবিকা সংস্থান করিবে। সংস্কারহীন শূদ্রগণ প্রব্রজ্যা-চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক পাষণ্ড-বৃত্তি ভিক্ষা আশ্রয় করিবে। প্রজারা দুর্ভিক্ষ ও রাজকরে পীড়িত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে কদন্ন-ভূমিষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিবে। বেদ-বিধি বিলুপ্ত, জনসমাজ পাষণ্ড লোকে পূর্ণ হইবে এবং অধর্ম্ম-বৃদ্ধি হেতু সকলে অল্পায়ুঃ হইয়া উঠিবে। স্ত্রী পুরুষের প্রতি অল্পবয়সেই সন্তান জন্মিবে। অল্পের মধ্যেই লোকের বার্দ্ধক্য, অল্পকালই লোক জীবিত থাকিবে। যে যে সময়ে পাষণ্ডদলের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায় সেই সেই সময়কেই কলিকাল বলিয়া অনুমান করিতে হইবেক কহিল। যে সময়ে বেদমার্গানুসারী সাধুগণের হানি দৃষ্ট হয় এবং যে সময়ে ধার্ম্মিক লোকের কার্য্য অবসন্ন হইয়া আইসে সেই সময়েই কলির প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। যে সময় লোকে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আরাধনায় ঔদাস্য করে সেই সময় বুঝিতে হইবে কলি প্রবল। যে সময় বেদবাক্যে অপ্রীতি এবং পাষণ্ডী পথে প্রীতি পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সেই সময়েই কলির বৃদ্ধি। তৎকালে লোকে নাস্তিকদিগের প্রবর্তনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে অর্চনা করিবে না এবং এই রূপ কহিয়া বেড়াইবে যে বেদে আবশ্যক কি, ব্রাহ্মণে প্রয়োজন কি, দেবতা কি জন্য পূজ্য এবং জল দ্বারা দেহশুদ্ধিরই বা ফল কি? কলিকালে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হইবে। অল্প-ফল শস্য এবং ফল স্বাদহীন ও অসার হইবে। কলিকালের বস্ত্র সকল সূক্ষ্ম এবং বৃক্ষ নিষ্ফল হইবে। সমস্ত বর্ণ শূদ্রবৎ ব্যবহারে রত হইবে। ধান্য অণুমাত্র এবং ধেনুর অভাবে ছাগদুগ্ধেরই ব্যবহার হইবে। কলিকালে গুরুর মধ্যে কেবল শ্বশ্রূ ও শ্বশুর। যাহার ভার্য্যা সুন্দরী সে, এবং শ্যালক পরম মিত্র হইবে। তৎকালে সকলই শ্বশুরের অনুগত হইয়া বলিবে পুরুষ যখন কর্ম্মাধীন তখন কে কাহার মাতা এবং কেই বা কাহার পিতা। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা বারংবার কায়িক বাচিক ও মানসিক দোষে অভিভূত হইয়া দিন দিন পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। সকলে স্বত্বহীন অশুচি ও শ্রীভ্রষ্ট, যে যে কার্য্য দুঃখজনক তাহাই ঘটিতে থাকিবে। ব্রাহ্মন্! এই রূপ যখন বেদাধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞ রহিত হইবে তখন কোন এক পবিত্র স্থানে অল্প সংখ্য লোক বাস করিবে। সত্যযুগে তপস্যা দ্বারা যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হইত ঐ স্থানে অল্প যত্নে সেই রূপ উৎকৃষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

এতদ্দেশীয় কৃষক ও ধর্ম্মনীতি।

মনুষ্যের মৃগয়া প্রথম অবস্থা পরে পাশু-পাল্য। যখন কাহারও জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই, ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি কেহই জানিতে পারে নাই তখন কেবল পশুমাংস ও পশুদুগ্ধই সকলের জীবিকা ছিল। ক্রমে যখন বন্যপশু অসুলভ হইল, মনুষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং সকলের অভাব-বোধ উপস্থিত হইল তখনই কৃষি ও কৃষক-দলের উৎপত্তি হয়। ফলত অভাবই ইহার প্রসূতি। কিন্তু তৎকালে সকলেই যে কৃষক ছিল এরূপ বোধ হয় না, এই কৃষকদলের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে কর্ম্মার (১) প্রভৃতি আর কতকগুলি শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা বিনিময়ে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করিত। এই কৃষকদল হইতে মনুষ্যের পশু-হিংসা-জনিত রুক্ষভাব বিলুপ্ত, উদ্ভিদের স্নিগ্ধতা ও শান্তি প্রত্যেকের অস্থিতে অস্থিতে সঞ্চরিত এবং মনুষ্য-সমাজে ভাবী উন্নতির শিশু-দোলা বিনির্ম্মিত হয়।

বহুপূর্ব্বে এতদ্দেশে ভূমির উপর কৃষকেরই নির্ব্যূঢ় স্বত্ব ছিল। ব্যবস্থাপক মনু কহেন,(২) যে,যে ব্যক্তি মৃগকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করে মৃগ যেমন তাহারই সেইরূপ যে ব্যক্তি ভূমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া হলকর্ষণ ও বীজ বপন করে ভূমি তাহারই। যখন শাস-নের অনুরোধে রাজার সৃষ্টি হইল তখনও কৃষকদিগের অধিকার অখণ্ডিত ছিল। রাজা সাধারণের রক্ষক, তিনি এই রক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিবার জন্য কৃষকদিগের নিকট আ-য়ের ষষ্ঠাংশমাত্র লইতেন। এই ষষ্ঠাংশ সংগ্রহ করিবার জন্য রাজা ও প্রজার মধ্য-বর্ত্তী এক এক জন মণ্ডলাধিপতি থাকিত। রাজা আবার এই অর্থ প্রজাদিগেরই সুখ-বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাক্রমে ব্যয় করিতেন। এইটি এতদ্দেশের পূর্ব্বতন নিয়ম। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, ভূমির স্থায়ী অধিকার কৃষকেরা বহু দিন নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়া-ছিল এবং সুখী ছিল। পরে যখন দুর্জ্জয় মোগল সম্রাটেরা আসিয়া পুণ্যভূমি ভারতের বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল, যখন হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু আচার ও হিন্দু ধর্ম্মকে ইহারা বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, তখনও কৃষকদিগের পক্ষে পূর্ব্ব-প্রথার তাদৃশ পরিবর্ত্ত হয় নাই। উহারা কিছু কিছু কর দিয়া ভূমি অধিকার করিয়া থাকিত; কিন্তু মোগল জাতি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়, উহারা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত এবং বীর্য্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া সুরা অপ্সরা লইয়া কালক্ষেপ করিত। এই সুযোগে উহাদের অধিকারে নিযুক্ত মণ্ডলাধিপতিরাও যথেচ্ছা-চারে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহারাই পরিশেষে এ দেশের জমিদার হইয়া উঠে। ঐ সময় কৃষকদিগের হাহাকার, উহাদের করুণ কণ্ঠ-ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লা-গিল, কিন্তু তাহার অশ্রুজলে আর কাহার হৃদয় আর্দ্র হইবে।

পরে ব্রিটিস-সিংহের অধিকার। মোগল সাম্রাজ্যের অত্যাচার এক প্রকার বিলুপ্ত হইল, কিন্তু এসময়েও কৃষকেরা তাদৃশ সুখী নয়। ভূমির উপর ইহাদের নামমাত্র স্বত্ব আছে বটে কিন্তু ইহারা নানা প্রকার কর-ভারে নি-তান্ত নিপীড়িত। ইহাদের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। হয়ত এক ব্যক্তি ভূমিতে শস্যোৎ-পাদন করিবার জন্য বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিল, শ্রাবণের মুষলধারে বৃষ্টি তাহার মস্তকের উপর দিয়া গেল, ঝঞ্ঝাবাত, শিলাপাত সহ্য করিল, পশু পক্ষী ও মনুষ্যের উৎপাত দূর করিল, এই সমস্ত করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ

(১) ঋগ্বেদে কর্ম্মার শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অপভ্রংশ কামার।

(২) স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগং। মনু

উদারান্ন সঞ্চিত হইল, কিন্তু এক দিন হয়ত রাজকর প্রদানে অসমর্থ হইয়াছে, তাহার সঞ্চিত অন্ন রাজপুরুষেরা আসিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। ফলত ইহারা এখন অসুখী।

আর একটি কথা, পূর্ব্বকালে এই কৃষকের সহিত উচ্চ শ্রেণীর একটী বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। কোন ভদ্রবংশীয় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ পারিষদগোষ্ঠীতে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে এক জন কৃষক উপস্থিত, বৃদ্ধ তাহাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত স্বপার্শ্বে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। হয়ত সেই কৃষকের সহিত কোন একটি পবিত্র কল্পিত সম্পর্ক আছে, তিনি সেই সম্পর্কের অনুরূপ সম্বোধনে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন; কখন পারিষদ-গোষ্ঠীতে রাম যুধিষ্ঠিরাদির চরিত্র লইয়া আন্দোলন হইতেছে, কৃষক আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিত, কখন উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মসমস্যা উঠিতেছে কৃষক স্থির কর্ণে তাহা শুনিত, কখন বা বৈষয়িক জটিল তর্ক উত্থিত হইতেছে কৃষক সকলের সঙ্গে একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, কখন বা কৃষি-কার্য্যের কোন নিগূঢ় কথা উপস্থিত, কৃষক তন্ন তন্ন করিয়া সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইত। এতদ্ব্যতীত কৃষক পত্নী ও তাহার অন্যান্য পরিজন ঐ সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের অন্তঃপুরে অত্যন্ত সমাদৃত এবং নানা প্রকার সম্বন্ধে আহূত।

পূর্ব্বকালে এই রূপ ব্যবহারে জনসমাজে চারিটী বিশেষ ফল সাধিত হইত। প্রথমত নিম্ন শ্রেণীতে বহুল পরিমাণে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচার, দ্বিতীয়ত সংস্রবাধীন পরস্পরের স্নেহ মমতার বৃদ্ধি, তৃতীয়ত সম্পর্ক-সূত্রে পরস্পরের পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা, চতুর্থত ভদ্রসমাজে কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষিত দল কৃষিকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া আছেন। ইহাঁরা ইংরাজী-শিক্ষা-প্রভাবে স্বার্থপর ও আড়ম্বরপ্রিয় হইয়াছেন। পুণ্য অপেক্ষা যশই অধিক পরিমাণে ইহাঁদের কার্য্য নিয়মিত করে। কৃষকশ্রেণীর প্রতি ইহাঁদের প্রকৃত স্নেহ ও মমত্ব নাই, স্পষ্ট কথায় বলিতে কি, ইহাঁদের ভিতর ফোঁফরা, তজ্জন্যই অধিক হাঁক ডাক। "সাধারণ হিত সাধারণ হিত" বলিয়া সর্ব্বত্র ধুম ধাম করিয়া বেড়ান, কৃষকের পক্ষ-সমর্থনার্থ গগনস্পর্শী স্বরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলেন, পার্লেমেণ্টে আবেদন পাঠান কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র কৃষককে একমুষ্টি অন্ন দেন না, তাহাদের সঙ্গে বশিতে লজ্জা বোধ করেন, বাক্যালাপে মানহানির আশঙ্কা করেন। কিন্তু ইহা একটী নিগূঢ় কথা—মনুষ্য স্বভাবের নিগূঢ়তম তত্ত্ব, যে, যেখানে পরস্পর সম্মান নাই সেখানে প্রীতির অভাব, আর যেখানে পরস্পর সম্মান আছে সেখানে অবশ্যই প্রীতি থাকিবে। সম্মানশূন্য প্রীতি হয় কপটতা নয় কেবল কথার কথা মাত্র। গুণবোধই প্রীতির কারণ, গুণবোধ হইলে সম্মানের ভাব অবশ্যই আসিবে। যাঁহারা কৃষককে হৃদয়ে ঘৃণা করেন এবং মুখে ভালবাসি বলেন আমরা তাঁহাদের সেই ভালবাসায় সন্দেহ করি এবং এই মৌখিক প্রীতি যে তাঁহাদের কোন নিগূঢ় সংকল্প সিদ্ধ করিবার ব্রহ্মাস্ত্র তাহাতেও বিশ্বাস করি।

এক্ষণে পরস্পরের এই অপ্রীতির একটী বিষময় ফল ফলিতেছে। কৃষকেরা আর ভদ্রলোককে প্রীতির চক্ষে দেখে না, এবং তাঁহাদিগকে আর তাদৃশ সম্মানও করে না। সংস্রব দূরে থাক, ভদ্রের নামে কর্ণে হস্তার্পণ করে। এই সংস্রবের অভাব ইহাদিগকে পানদোষে লিপ্ত করিয়াছে এবং শিষ্টাচারবিহীন করিতেছে। পূর্ব্বে ইহাদের কোন একটি দায় উপস্থিত হইলে ভদ্রলোকে

তাহা মিটাইয়া দিতেন, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। বিচারালয়ের ভীম ভাব আর ইহাদের গতিরোধে সমর্থ নহে। এদিকে ভদ্রেরাও মনে করিতেছেন আমরা উপেক্ষিত হইলাম। সুতরাং ইহাঁদেরও নির্য্যাতনস্পৃহা বলবতী হইয়াছে, ইহাঁরা অনুদার হইতেছেন,পরন্তু হতযত্ন,অধিকতর নিষ্ঠুর ও কর্কশ হইতেছেন। যখন নিম্ন-শ্রেণীর সাহিত বিশেষ সংস্রব নাই তখন ত ইহাঁরা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থায় একপ্রকার অনভিজ্ঞ এবং তন্নিবন্ধন ক্রমশঃ সমাজ-শাসনেরও অযোগ্য হইয়া উঠিতেছেন। ইহাঁরা সমাজ শাসনে অক্ষম, নিম্ন-শ্রেণীও অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল এজন্য রাজ-শাসন-প্রণালীও ক্রমশঃ কঠিন হইতেছে। দেশের উচ্চ লোক যদি অধস্তনদিগকে স্নেহ ও প্রীতিতে শাসন করিতে পারেন তাহা হইলে রাজা কি জন্য ইপ্রভাব ধারণ করিবেন। এখনকার পুলিশের যে বেশি আঁটা আঁটি এবং অধিকতর ফৌজদারি আদালতের সৃষ্টি তাহারও কারণ বোধ হয় এইটী।

আর একটী কথা। হৃদয়ের অনুদারতা সমাজের বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া থাকে। আমরা স্বজাতীয়দিগকে ঘৃণা করিয়া কত যে হারাইব বলিতে পারি না।

উপসংহারে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনকে কিছু বলা আবশ্যক। ইহার সভ্যেরা কৃষকদিগের স্বত্ত্ব রক্ষার্থ প্রথমে বদ্ধপরিকর হন। এখন তাঁহাদের সে উদ্যম ও চেষ্টা নাই। আমরা বলি তাঁহাদের সে উদ্যম ও চেষ্টা থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে উদ্যম ও চেষ্টার সফলতার জন্য কৃষক-শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে প্রকৃত স্নেহ ও সদ্ভাব দেখাইতে হইবে, তাহাদিগকে আপনার পরিবারতুল্য বিবেচনা করিতে হইবে, তাহাদিগকে আপনার দেহ ও রক্ত বিবেচনা করিয়া তাদের ব্যথায় ব্যথী হইতে হইবে। নচেৎ তাঁহাদের পক্ষ হইয়া সহস্র আন্দোলন করুন, সহস্র আবেদন করুন, সহস্র উপকার করুন, কোন ফলোদয় হইবে না। কৃষকশ্রেণী নিরক্ষর, এই উপকার-সমষ্টি কাহার হস্ত হইতে আসিতেছে কিছুই বুঝে না, সুতরাং যে অসদ্ভাব সেই অসদ্ভাবই থাকিয়া যাইবে।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪১৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠার পর।

১০৩

সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে চক্ষু উত্তোলন কর এবং বল যে ভবিষ্যতে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাতেই আমাকে নিয়োগ কর। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা; সকল বস্তুর প্রতি উদাসীন হইয়া তোমার সহিত একমন হইতেছি। যাহা তুমি ভাল বিবেচনা কর তাহা আমি কখন অস্বীকার করিব না,যেখানে তোমার ইচ্ছা সেইখানে আমাকে লইয়া যাও। লোক-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কিম্বা তদ্বিপরীত, ধনাঢ্য কি ভিক্ষুক, যাহা তুমি হইতে বল তাহা হইতে আমি প্রস্তুত আছি। এই সকল কার্য্য জন্য লোকসমীপে তোমার পক্ষ-সমর্থন করিব এবং কেন এইরূপ বিধান করিলে তাহার কারণ প্রদর্শন করিব।

এপিকটিটস্

১০৪

(বন্ধুর প্রতি উক্ত)

কি ক্ষুদ্র কি গুরুতর বিষয়ে ঈশ্বরে প্রতি দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক তোমাকে স্বাধীন ও অক্ষুণ্ণ-চিত্ত করিবার আমার অভিপ্রায়।

১০৫

কেবল ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি না রাখিলে, ঈশ্বরপরায়ণ না হইলে, কেবল ঈশ্বরের আদেশ পালন না করিলে শোক, ভয়, কাম, ঈর্ষা প্রভৃতিকে দূর করিতে পারা যায় না।

ঐ

১০৬

আমাদিগের দুই প্রকার সম্বন্ধ আছে; যাহাদের সঙ্গে বাস করি তাহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং যে জগৎ-কারণ দ্বারা সকল ঘটনার বিধান হইতেছে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ।

এণ্টোনাইনস

১০৭

ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত চিত্তে সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্য ক্রমাগত করিবে।

ঐ

১০৮

আমি জগৎ-নিয়ন্তার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেছি।

ঐ

১০৯

যদি আমাদিগের বুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে প্রকাশ্যরূপে এবং গোপন ভাবে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতাম, তাঁহার স্বস্তিবাচন করিতাম এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম। যাহারা ভূমি খনন করে, হলযন্ত্র চালনা করে, এবং ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহাদিগের এই প্রকারে ঈশ্বরের নিয়ত গুণ গান করা কি উচিত নহে? "ধন্য ঈশ্বর যিনি ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এই সকল ইন্দ্রিয় আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ধন্য ঈশ্বর যিনি আমাদিগকে হস্ত প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, যিনি আমাদিগের শরীর ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিতেছেন, যিনি নিদ্রা-সময়ে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সক্ষম করিয়াছেন।" কিন্তু এই সকল বিষয়ে (অর্থাৎ তাঁহার করুণার এই সকল কার্য্য) আমরা বুঝিতে পারি বলিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করা সকল গুণানুবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন অধিকাংশ মনুষ্য মোহান্ধ তখন এই কার্য্য কি এক জনের নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত নহে যে তিনি সকলের হইয়া ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করেন? যদি আমি কোকিল হইতাম, কোকিলের কাজ করিতাম, যদি হংস হইতাম, হংসের কাজ করিতাম, যখন আমি বুদ্ধিমান জীব হইয়াছি তখন আমার কর্ত্তব্য যে উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের গুণ গান করি ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করি।

ঐ

ক্রমশঃ

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও তল্লাভের বিশিষ্ট উপায়।

পারিস নগর প্রবাসী কোন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভব হিন্দুযুবক সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন ও সেই পত্র-সম্বলিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা তল্লাভের বিশিষ্ট উপায় বিষয়ে একটি যুক্তিযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা উভয় পত্র ও প্রবন্ধ অত্যন্ত আদরের সহিত নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

Paris, June 21, 1878.

DEAR SIR,

The enclosed was commenced and the greater part of it written in the beginning of February. Pressure of my regular studies rendered it impossible to finish what I have begun and it was laid quite aside. In the meantime some of my dark apprehensions have been realised. The Vernacular Press Act has been passed. Thinking that such

outspoken thoughts might be of some service to our countrymen in the existing circumstances, I have in spite of excessive pressure of work, brought what I had to say, to a close and I hasten to send it to your address.

* * * *

* * * *

The more I know of our old Hindu life, the more I learn to love and respect it—the more I appreciate the feeling with which you once so eloquently pleaded for the "*Hindu Name*" in the sequel of your Lecture: "[illegible]." "We cannot—dare not give it up.—it is to unite us All once more" you so justly said. And those who know what our old Hindu life once was—who do all they can to know more and see the immeasurable bearings of that knowledge on the development of the future Hindu nationality in India—should all the more draw close to each other—should unite themselves in the bonds of brotherly sympathy and fellow ship. We are all working to the same noble cause. Unity should give us also here as everywhere else more efficiency—should greatly accelerate our progress.

* * * * *

* * * * *

How the enclosed ought to be published I leave it entirely to you to decide.

* * * *

As for my studies I am now engaged in a work on our great Hindi Poet Chand, but the work is not likely to be done until some time to come! Chand was a very great poet and yet so little known in Bengal. * * The new Brahmo movement interests me greatly but its anti-Hindu spirit I can not quite approve of. * *

I remain,
Sir,
Respectfully your's,

POLITICAL LIBERTY AND THE BEST MEANS FOR ITS ATTAINMENT BY THE NATIVES OF INDIA.

From the few quotations which the Calcutta Correspondent of the "Times" lately made from some native journals, it is easy to see that there is at least a spirit of bold speculation amongst the educated natives of India. They seem already to have caught at least partially that spirit of independence which is such a characteristic of all European nations, especially of the Teutonic races. India, even in the days of her glorious Past, has been said by no less an authority than Professor Max Muller to have not been particularly prominent in this feeling—political interests were alien to a people who directed all their energies to the problems of Life and Death or to those which concern Man's relation to "The All" as the [illegible] fore a very hopeful sign, a feeling which it is impossible to notice without sincere delight, that India is also taking into herself a spirit of political liberty and if it be laid at the door of England that she has done nothing but impoverished India, this creating as it were a new element in the Indian national life must at least be recorded in her favour. Granted that England's monarchy in India has verily been that which Mr. Bright in his late Manchester speech attributed to her, granted that all the rhetorical epithets which that eloquent statesman applied were subject to no qualification, has not England at least done this one thing for India which the Mahometans, not to say anything of the Greeks, were incapable of doing in their sway of 1000 years: And how long is it that England reigns in India? A century—no more. Nay, her proper reign might be said to have begun only since half-a-century. Is not that at least an auspicious beginning?

But however one might congratulate India and her young patriots on their growing feeling of national independence——however one might sympathise with their just and laudable enthusiasm for the rights of their country, there is nevertheless a different side of this matter which it is essential to bring home to them. National liberty is an object which every individual is bound to strive after and fight for. But there are certain conditions which we regard as essential—inevitable to its realisation. And therefore the question of the most essential importance is: Are the modern Patriots of India endeavouring to fulfil those conditions or are they venting their patriotism merely in dithyrambs and sonnets to Liberty—in patriotic associations or in such sensational journalistic productions as those extracts from which have been alluded to in the

beginning? Do the modern Patriots of India really think that they should be able to do much in the way of their national independence merely by such literary efforts, unless the latter be at the same time accompanied by those practical means which it is the real object of the former to give an impulse to? Not that we do not know how to value earnestness of soul. It has its great value but what we contend for and we simply repeat what we have said above that there are certain inevitable conditions, which alone entitle a nation to political independence or endow it with the *might*, and hence with the *right*, of governing itself. It is necessary to be clearer. Our studies in History and its cognate branches have gradually brought us to the conviction that the Law of Natural Selection whose action is so fearfully prominent in the vegetable and animal worlds obtains equally in human society with scarcely any perceptible modification. And we all know what that Law means. It means that only the fittest deserve to, and will, survive, and, by the fittest, nature seems to mean in the first place the strongest in body and soul. She seems to abhor the weak and the imbecile no less than the fancied vacuum of old and her procedure with them is one of total annihilation or of [illegible] degradation to the position they should justly occupy. Only he dares speak of right or rights who has might exclaims she in her Book of Revelations which we term History. And if man—foolish man, misled either by metaphysical subtleties or theological fancies, misreads that Book,—refuses to listen to Nature's solemn audible voice across the dust of empires and the din of centuries, oh! then she knows well enough how to flog her truant child back to his proper senses and her admonitions are not quite those of a caressing Bengali mother, but consist [illegible] all knocks in fearful convulsive revolutions [illegible] Rome finds her Caesar, England her Cromwell and France her Napoleon (not of course "Le Petit"). In these Nature once more asserts her eternal law—once more gives the Hero who reigns not by the so-called right of conventional inheritance but of *might* which alone gives you the right! The imbeciles and weaklings or worse still the sham-heroes who brought the nation to its miserable plight have been scattered to the winds by her volcanic force—the almost inundating lava-streams of the people's blood have now been stemmed, and look how the nation blooms and flourishes once more under the sway of its just rightful King, because chosen by Nature on account of his acknowledged might and therefore his inviolable right to rule. (See the very well-known works: (1) Mommsen's "Geschichte Roms," (2) Carlyle's "Cromwell's Letters and Speeches" and (3) "Thier's Histoire du Consulat"). And what the great philosophical historians we have just named have so conclusively proved by an immense mass of facts and the rare force of their logical powers in the case of individual men, holds equally good in the case of individual nations whose community forms the human race. Here also, it is the most heroic that should reign—the wisest and the strongest that should rule, and abundant blessings flow to the conquered in spite of the bloody resistance they might offer, or curses and imprecations they might heap on their hated conquerrors. Read only what David Hume says on the effects of the Roman Conquest in Britain and if you will appeal to the facts of Universal History (Weltgeschichte) you will be convinced that similar effects have taken place in all countries and in all climes—all the more in proportion to the higher civilisation of the conquering and the *wise teachableness* of the conquered. Nay, History proves more. It proves that even if the conquering race occupy an inferior scale of civilisation—even if it be destitute of those arts and sciences which are generally recognised as the inevitable concomitants of a civilised life and have no other qualities to recommend itself but manly courage, abounding energy and undisguised frankness, its hammering down the tottering remnants of a highly civilised but exceedingly corrupt nation is of rare service to humanity as a whole. It is hardly necessary to allude to those whom we mean. We mean of course the Franks, the Goths and the Vandals: those "barbarians of the North" who battered down the effete civilisation of the Roman Empire. If the all sweeping, all-devastating Mongolic hordes had not once, under their well-known leaders, over-spread locust-like all the countries lying between Pekin and Moscow, Punjab and

Silesia, we should have been deprived of those exemplary Mogul rulers whose great memories we must cherish with perpetual gratitude and who conferred blessings of civilisation on our land which every street, nay every mouldering stone of Delhi, Agra and Lucknow still bears a magnificent and no less a touching witness of. We mean of course *our* Baber, *our* Akbar (Glory to his name—perhaps the very *beau-ideal* of a Ruler and hence also of a man that has ever lived ?) and *our* Shahjehan—rulers in whose presence we feel as if we were before our Rama, Vikramaditya and Chandragupta;

If such be then the verdict of Universal History—if such be Nature's inexorable Law, it is meet that we, the Hindus, should recognise it in due time and try to wrest out of Fate all the good she is able to yield. And if without allowing ourselves to be hurried away by the impetuosity of a blind patriotism which we are afraid has begun to infect the rising generation of India, we should calmly and thoughtfully weigh the facts as they are, we should go out with the conviction, that for India, no other foreign conquest could be more favorable—more suited to supply her with all that she most needs than that of England. And what is it that our country stands most in need of ? Certainly: (1) Industry (2) Commerce (3) Political Spirit and above all (4) The Physical Sciences. These, we say are the crying needs of India, needs which must be met with or we must perish most miserably—like Peru or Mexico. And those who have taken most pains to study what India once was, and what a hotbed of famine, pestilence, ignorance, superstition, and of brutality she now is, shall accede most to this opinion, as for example that gifted nobleman who, with a discrimination proportionate to his good will, holds now the rudder of our government. In a speech which His Excellency delivered quite in the beginning of his gracious reign (it was, we believe before the Convocation of the Calcutta University) he observed that what India wanted was not *meta-physical philosophy* but *physical science*, for he strongly suspected that the Hindus might even excel the Europeans in the subtleties of their dialectical ingenuity! (the words may not be quite exact, for we quote from memory). And what His Excellency said about dialectical skill, he might have said with still greater truth about Philology, Poetry and Religion. How extremely valuable were the achievements of the ancient Hindus in all these branches of knowledge, is well-known to every European who is acquainted with the *chefs-d'oeuvre* of the eminent savants who began their work of enlightenment (ex oriente lux!) a century ago under Jones and Colebrooke and are now so worthily represented by men like Max Muller and Albrecht Weber. Though transferred from one political slavery to another, India has nevertheless continued to dominate over by far the greatest part of Asia by the rare vigour and the abundant richness of her spiritual life. And what the Hindu mind has been doing for long long centuries for China Japan, Thibet, Mongolia and Siberia, for Burmah, Siam and some of the islands of the neighbouring Archipelago, it has now begun to do for Europe, if we are to interpret it by the influence which it has already exercised on some of her most cultured minds and acknowledged leaders of thought. Max-Muller never speaks of our Language—of its influence on Philological Science—of our "divine" grammarian Panini but in words of rapturous enthusiasm and those who would measure the influence of our Poetical Literature on some of the greatest poets and poetical philosophers of Europe need only recollect the well-known eulogic words of Goethe, Schlegel, Ruckert and the Humboldts, not to forget also the sanguine that noble Italian, Gorresio who, in his Introduction to the Ramayana evinces such a rare kinship to our pious and poetical ancestors. Passing by the voluminous works of the Orientalists themselves like Burnouf, Stanislas Julien, Foucaux and others—of popular expounders like Köppen and St. Hilaire, the influence of Buddhism on the religious and philosophical thought of Europe which has but just begun is best gauged by referring to the works of one solitary thinker who, whether we agree with his opinions or not, is certainly exercising a vast influence not only on the rising generation of his own land but on the civilised world. We mean of course

Arthur Schopenhauer whose pages abound with extracts from the Buddhist Literature and whose *Weltanschanung* seems to have been so considerably influenced by the teachings of the Prophet of Kapilavastu. Thus it is not Dialectics, nor Philology nor Poetry and Religion that we need; nay, as it would seem, we have enough of them not only for ourselves but even to spare a good deal for our neighbours. What then are our real and inevitable needs? Certainly that which Lord Lytton so wisely mooted in his Speech before the Convocation, namely: *Physical Science* Yes. Physical Science is that which we verily want, and let us add also: Commerce, Industry and Political Spirit. Now, could we be thrown into the contact of a nation worthier to supply us with all these? What other nation could boast of greater progress in Science, of more extensive and successful Commerce, of more efficient Industry and of freer Political Instutions more normally developed than England? What other nation, we ask, could count more universally acknowledged leaders of Science than Bacon, Newton, Darwin, (Charles), more successful representatives of Commerce than the Company which, beginning with small seacoast factories, gradually established an empire greater than even that of Asoka or Akbar, more efficient leaders of Industry than Arkwright, Watt and Stephenson, and worthier heroes of Political Liberty than the Fathers of the Magna Charta down to their worthy successors The Hampdens, the Pyms, the Elliots, the Miltons and the Sydneys of a later age? If such be our veritable needs and such the nation with which we have by a concourse of rare circumstances been brought into such intimate inextricable relations, what is it that we, the Hindus, should direct our efforts to do? Certainly to learn from our rulers and through them from the whole civilized world in a spirit of wise teachableness all that they have to teach us. And what England and Europe have to teach us is verily what we most lack of as has already been intimated. We should therefore do all we can to cultivate and master the Physical Sciences—make the most of those opportunities of acquiring them which have now been placed at our disposal. *In the first place* direct all our energies to be a *scientific* "nation" under the guidance of the master-minds of Europe and then we should have every thing else we want. The growth of Commerce and Industry shall go hand in hand with the growth of Science: they are twin-sisters—inseparable companions. And does not India of all countries in the world deserve it that her children should particularly occupy themselves with Science—should know the vast incomparable physical resources she possesses most that these might be developed and utilised as much as possible? What other country has ever been so proverbial on account of the fertility of its soil and the exuberance of its natural productions? What other country could boast of minerals, plants and animals more precious, more abundant and more diversified—of rivers wider and more navigable, mountains higher in altitude and richer in productions—coasts more extensive or more suited to the establishment of trading factories and efficient shipping? The material resources of our country, its fabulous richness, "the wealth of India" has been attracting foreign nations, either as merchants or invaders from time beyond mind. The first Mahometan conquerors measured away its gold and diamonds in *maunds* and not *in pieces*. We therefore owe it to our rarely gifted country to study the Physical Sciences, to know what physical resources she has, utilise them as much as possible and thus open the way to the highest development of our commercial and political interests. And in the broad day-light of scientific research shall pass away those gloomy spectres which now cause so much terror and agony to our now utterly wretched mind. Pestilence and Famine, Yellow Fever and Epidemic, with their attendant evils, shall pass away. No less shall those grim superstitions and ghastly usages pass away which are hardly less fatal in their consequences than the evils mentioned above. And if there be further any truth in the assertion made by almost all great Orientalists without exception that the Hindus have a mystical, unpractical tendency of mind, nothing is so likly, to cure us of the same as a thorough acquaintance with the physical phenomena of Nature and the orders of sequence which they invariably follow. Thus Science—that which our present wise and beneficent Ruler has already proposed seems

to be the chief remedy—yea—the panacea to say to all the frightful maladies which our dear country is so intensely suffering from. Following then his advice, let us direct our efforts to a thorough cultivation, and as much as possible to a wide diffusion of Science. It is Science—it is "Culture" in the German sense of that word that should now engage our best energies inorder that we may in due time reap its golden fruits which are: National Prosperity, National Liberty and, as the full mature outcome of all, a free, vigorous and noble National Literature. Do you think if we *deserve* Liberty, that is to say, if we have slowly but surely developed those conditions which alone entitle a nation to that grand golden privilege, England would be willing to withhold us from it? England—the land of free political institutions—the home of noble, heroic patriots? Then must she be untrue to the deepest, the holiest instincts of her soul—then must she be utterly faithless to the noblest of her traditions and the most cherished of her spiritual experiences If she might indeed ever go down so low—if foregoing all that which makes her voice to-day so much respected in all countries—infuses such strong confidence in all nations fallen or about to fall, she might one day be so despicably corrupt—such a *blagueur* as the French say, oh! then should she be no more capable of holding us in bondage than the later Roman emperors their Asiatic Empire or the statesmen of George the Third's reign a century ago their noble heroic Puritanic brothers across the Atlantic? We should then assert our just rights in spite of all English Caesars and certainly with the living sympathy of the whole civilised world for us and its unmitigated execrations for them! Let us then in the first place do all we can—make use of all our present opportunities to *deserve* Liberty and we *will—must* have it. But if instead of trying to *deserve* Liberty by the adoption of those practical means which we have indicated above, we would permit ourselves to indulge in vituperative, scurrilous journalism or in seditious incendiary brochurism—in descanting with frothy, extravagant grand-eloquence on the supposed dotage and the consequent imbecility of England, we should only provoke our rulers—we should only tighten our chains—we should only deserve to be treated as all conquered and disloyal races have ever been. They might treat us as our Aryan fathers treated the aborigines of India (Sudras), as the Dorian Conquerors treated the original inhabitants of Greece (Helots), as the Romans treated their foreign, and especially their Asiatic, prisoners (Slaves and Gladiators), as Charlemagne otherwise so humane was compelled to treat the Saxons under Wittikind, as the Anglo-Saxons treated the Britons, as the Normans treated the Anglo Saxons, and the compound of both, that is to say, the English treated not long ago the inhabitants of Ireland. Nay, the most significant as well as the most touching instance of the kind is afforded by a people who, gifted, courageous and patriotic beyond the ordinary run, have nevertheless ceased to have national existence and are now exiles and emigrants in all parts of Europe, if not of the whole world. We mean of course the Poles whose history is full of unmistakeable warning to All, especially to us in our present circumstances. Our "Hindu Patriots" should seriously reflect on all these instances especially on the last to draw lessons of wise conduct from them. If they are silly enough to fancy that the British Lion has grown old and therefore imecile, they should, at the some time, never forget that a Lion even on his deathbed is capable of putting to flight nay, tearing to pieces whole herds of sheep and cows—of cowards and dastards who have neither the strengh of individuality nor the power of unanimity. It is not the number but the quality of that number which makes a nation. The number of men who founded the Athenian, the Roman and the Florentine Republics—the number of men who fought for and developed the English Constitution, would sink into utter insignificance before those vast, unwieldy masses which encumber the fertile plains of India. Compare only the 200,000,000 of your Indian population and the 20,000,000 of that brave energetic people who inhabit England (we except Wales). An American hero (of course of the North) once said that one Socrates was worth all the South Carolina States! one

Rajpoot, one Sikh, one Hindoostani or one Maharatta is more worth than one thousand of your *typical* Bengali Baboo in his *costume du chef de cuisine*—fit only to make brilliant speeches and write seditious feuilletons! *Ten and seven horsemen* under an ill-formed fanatical slave came in by the front-door, and your *bonafide* Bengali Rajah went out *in peace (Santis!)* by the back-door inorder that no injury might be done to any living creature—no disturbance might take place in the feeling of *universal Maitre*! What a glaring humiliating contrast to those deeds of stirring heroism which our Ramayana and our Mahabharata celebrate, as does no less our Chand——the greatest and the noblest of our modern Hindu Poets—in his immortal Poem! Read—read those grand Epics of old and the "Prithiraj Charita" and you will see how low—how despicably low you are fallen*!

We should therefore try to improve the quality of our number, for of *quantity* we have enough to spare. If then we have the real interests of our country at heart—if we are not mere declamatory lip-patriots but patriots in the sense in which Hampden was once in England, Washington a century ago in America, Thiers but yesterday in France, Bismarck now is in Germany, we should direct all our present efforts to master the Physical Sciences—to develope the vast and the various resources of our gifted country as much as possible—to learn and introduce from Europe its Science, Industry, Commerce Political Spirit—to remedy all those grave flaws which are to be detected in the most diversified ramification of our National Life [illegible] we have slowly but surely (for the [illegible] every process of development must [illegible] slow, developed all those inevitable conditions which alone entitle a nation to Liberty, we *will have* it, because we *deserve* it. Until that time we must be content with such definitions of justice or rather of England's justice to India as Sir F. J. Stephen in his late long letter to the "Times" condescended to enunciate. We are children and must therefore be treated as such. If we would foolishly give ourselves the airs of manhood we should simply make ourselves ridiculous or worse still should be flogged back into surly obedience. Or if we be found quite incorrigible, we should be treated as all incorrigible children once were under the old Spartan Law—we should be utterly exterminated without even a trace to tell our wretched tale. That whole races can be exterminated is a fact quite credible to those who are acquainted with what great historians relate about the Red Indians of America, about the aboriginal inhabitants of Peru and Mexico. (See among others Draper's "History of the Intellectual Development of Europe.") and about many other races whose simple existence we are now able to conjecture only as the zoologists do that of those half-reptilian or half-aerial Mesozoic Sauria, or that gigantic Pigeon called Dodo (*didus ineptus*—the very name tells you why it was extinct) or that of those well-known Mammoths and Mastodons of the Tertiary Period. We should therefore be wise in due time if we are not to share a similar fate—we should constantly remember and act up to the old adage 'First *deserve* and then desire.'

A YOUNG HINDU.

Feb. 10. 1878.
Fontainbleau.

* Those who cannot understand the "Prithiraj Charita" in its grand original which is in [illegible] Hindi are requested to read by all means Tod's "Rajasthan" where considerable materials have been drawn from our great Bard's Poem—although it is curiously suggestive that so many of us should read English and some of us even French so well and our own Hindi or Hindui (hence its name) so ill or [illegible] not at all.

এ প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু একটি স্থানের সহিত আমরা ঐক্য হইতে পারি না; সেস্থান যেখানে লেখক ডারউইন সাহেবের মতের অনুমোদন করিয়াছেন। ডারউইনোক্ত নিয়ম অপেক্ষা আর একটি প্রবলতর নিয়ম আছে, সে নিরীহ ধর্ম্মের নিয়ম, যে নিয়মের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ইংলণ্ডে আদিম নিবাসী রক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমালোচন।

হিন্দু বিবাহ সমালোচন। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত, মেদিনীপুর মিলন যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯৩৫।

আমরা পূর্ব্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা করিয়াছিলাম। ভুবনেশ্বর বাবু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়া বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াছেন; দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার সেই যশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে।

ইনি বর্ত্তমান খণ্ডে বহুবিবাহ, অধিবেদন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, এবং বিবাহ-ব্যবস্থা সমালোচন করিয়াছেন। তিনি বহুবিবাহ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। বর্ত্তমান কৌলীন্য-প্রথা সমাজে আর প্রশ্রয় প্রাপ্ত না হয়। ইহাতে কৌলীন্য মর্য্যাদার ভাগে এক ব্যক্তির বহুদার গ্রহণ এবং এক পাত্রে বহু কন্যা দান নিবারিত ও নিষ্প্রয়োজন হইবে।

২। সমাজে কেহ ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবে না, করিলে সামাজিক ও রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আর ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাত সন্তানেরা উত্তরাধিকারিত্ব হইতে রহিত হইবে।

গ্রন্থকার অধিবেদন শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিশিষ্ট কারণানুরোধে ভার্য্যান্তর গ্রহণকে অধিবেদন বলে। ইহা যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বহুবিবাহের মধ্যে পরিগণনীয় নহে। গ্রন্থকার অধিবেদন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(ক) অধিবেদন-ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর ব্যভিচার ও চির-রুগ্নতা বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে রাজা ও সামাজিকগণ তাঁহার অধিবেদন অনুমোদন করিবেন।

(খ) তাদৃশ প্রমাণ প্রদর্শনে অক্ষম হইয়াও যদি কেহ পুনরায় বিবাহ করে তবে সে বিবাহ বহুবিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইবে। এবং তাদৃশ পরিণয়কারী তদুপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ক পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার বলেন "যেমন রোগ-ধ্বংশ অপেক্ষায় রোগ নিবারণ করা অপেক্ষাকৃত প্রশংসাপর সেই রূপ বৈধব্য ঘটিলে পুনরায় বিবাহানুষ্ঠান অপেক্ষা যুবতীর তাদৃশ অবস্থা না ঘটিতে পারে এরূপ প্রতীকার সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর বলিতেই হইবে। * * * আমাদিগের সামাজিকগণ যথোচিত যত্ন করিলে বর্ত্তমান সমাজের পুরুষমণ্ডলী হইতে প্রবল অকাল মৃত্যু কি বহু অংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না? না রমণীগণকে কুপাত্রে সম্প্রদান বশত উহাদিগের অচিরে বৈধব্য-দশা-প্রাপ্তি-সম্ভাবনা অনেক খর্ব্ব হইতে পারে না? বোধ হয় অবশ্যই হইতে পারে।"

অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন "সম ব্যবসায়ী বিভিন্ন শ্রেণী (যেমন তেলি, তাম্বলী, সদ্গোপ, স্বর্ণবণিক, তাঁতী ইত্যাদি) মধ্যে পরস্পর পরিণয় সম্বন্ধ ঘটিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অপিচ অধুনা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এবং কোন কোন শ্রেণীর নবশাখ সমাজে প্রায় তুল্যাবস্থা। ইহাদিগের আচার ব্যবহারেও তাদৃশ বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। * * * * অতএব এই সকল জাতি মধ্যে স্থল বিশেষে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্বোক্ত কোন অসুবিধার সম্ভাবনা নাই বরং তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদ্ভব হইতে পারে।" কিন্তু গ্রন্থকার হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে এরূপ অসবর্ণ বিবাহ সুসাধ্য না দেখিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতি মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্তঃ শ্রেণী বিভাগ উঠিয়া গিয়া পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের ব্যবস্থা দেন। তিনি বলেন "ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কান্যকুব্জ ও রাঢ়ীয় বরেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী এবং কায়স্থ জাতির মধ্যে ঐরূপ কান্যকুব্জ, রাঢ়ীয় (উত্তর ও দক্ষিণ) বঙ্গজ, বরেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী এবং তদন্তর্গত সম্প্রদায়ের নিচয় মধ্যে পরস্পর কন্যাদানাদান প্রচলিত হউক।"

গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে বিবাহ ব্যবস্থা বলিবার সময় মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহের বর্ণনা করিয়া বরপাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

(ক) স্বাস্থ্য।

(খ) অবয়ব।

(গ) ধাতু যথা বায়ু প্রধান, পিত্ত প্রধান ইত্যাদি।

(ঘ) সৌন্দর্য্য।

(ঙ) চরিত্র।

(চ) বিদ্যা।

(ছ) বুদ্ধি।

(জ) ধর্ম্ম।

(ঝ) বয়স।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন "বিবাহের মন্ত্র গুলি সংস্কৃত ভাষায় হইলেও তাহার অনুবাদ প্রচলিত ভাষায় হওয়া উচিত। কেন না তদ্দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য ও দাম্পত্য কর্ত্তব্য বর পাত্রী উভয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। আর কন্যাকর্ত্তাও বুঝিবেন তিনি কি রূপ গুরুতর কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেছেন।" গ্রন্থকার এস্থলে যে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন সেই কারণেই আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ পদ্ধতিতে সংস্কৃত মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার বিবাহ বিষয়ক প্রাচীন প্রথা সকল সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে চাহেন না অথচ উগ্র ত্বরিত বেগে সমাজ-সংস্কার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া হিন্দু সমাজ একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে অভিলাষী নহেন। তাঁহার মত সকল সুসঙ্গত, সুবিহিত, ও পরিমিততা-লক্ষণাক্রান্ত। তিনি এই গ্রন্থে হিন্দু শাস্ত্রে প্রতিপাদিত মতের প্রতি যুক্তি ও অধুনাতন বিজ্ঞানালোক নিয়োগ করিয়া সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পত্রে গ্রন্থকারের অসাধারণ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আয় ব্যয়

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯৪৫ ৸৶ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	১৬৭ [illegible]
সমষ্টি	১১১২ [illegible]
ব্যয়	৮৮০ ৶১৫
স্থিত	[illegible]

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২০১ ।৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৫৮ ৸৶১০
পুস্তকালয়	৪১ ৷৷৶১৫
যন্ত্রালয়	৪০৭
গচ্ছিত	৩৬ ৸৶ ৫
সমষ্টি	৯৪৫ ৸৶ ৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৫০ ৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩০০ ।০
পুস্তকালয়	৮৫ ।৶০
যন্ত্রালয়	২০৬ ৸৶১৫
গচ্ছিত	৩৭ ।৶ ৫
সমষ্টি	৮৮০ ৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
,, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
,, জানকীনাথ ঘোষাল	১০
,, আশুতোষ মল্লিক	১০
,, রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৫
,, কানাইলাল পাইন	২
,, শ্যামলাল সুর	২
,, দীননাথ অধ্যেতা	১
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	৬১

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র	১০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরের দান ...	২
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	১০৩৶০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	১২৶১৫
	[illegible]

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

[illegible] আদিব্রাহ্মসমাজ [illegible]

Registerd No 52.

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন ১৮০০ শক।
৪২২ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র।

বলীয়ান ঈশ্বর! অমর প্রেম! যাঁহার মুখ আমরা দেখিতে না পাইয়াও যাঁহাকে বিশ্বাস দ্বারা, কেবল বিশ্বাস দ্বারা, আলিঙ্গন করি, যাঁহাকে আমরা প্রমাণ করিতে না পারিয়াও যাঁহাতে বিশ্বাস করি, তোমারই এই আতপ, তোমারই এই ছায়া, তোমারই এই সকল জ্যোতিষ্ক মণ্ডল। তুমি দ্বিপদ ও চতুষ্পদে প্রাণ সৃজন করিয়াছ, তুমিই মৃত্যুর সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার মঙ্গলময় পদচিহ্ন শ্মশানে পতিত নর-কপালের উপর পরিলক্ষিত হয়। তুমি আমাদিগকে ধূলিতে পরিণত হইতে দিবে না; তুমি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছ, সে জানে না কি অভিপ্রায়ে তুমি করিয়াছ; কিন্তু তাহার এই বিশ্বাস যে সে একেবার নিধন প্রাপ্ত হইতে সৃষ্ট হয় নাই। তুমি তাহাকে সৃজন করিয়াছ; তুমি ন্যায়বান। আমাদিগের ইচ্ছা আমাদিগেরই, কিন্তু আমরা জানি না কিরূপে তাহা আমাদিগেরই; আমাদিগের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার অধীন হইবার জন্য আমাদিগেরই। আমাদিগের ক্ষুদ্র ধর্ম্মমত সকলের যতদিন পরমায়ু তাহারা ততদিন জীবিত থাকে এবং অবশেষে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহারা প্রত্যেকে তোমার জ্যোতির ভগ্নাংশ; তুমি, হে প্রভু! তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর। আমাদিগের কেবল বিশ্বাস আছে; আমরা কিছুই জানিতে পারি না, আমরা কেবল দৃশ্যমান পদার্থ জানিতে পারি তথাপি আমরা বিশ্বাস করি যে সেই জ্ঞান তোমার দ্বারা প্রেরিত। তাহা অন্ধকারমধ্যে একটি কিরণ মাত্র; সেই কিরণ বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি আমাদিগের অন্তরে অবস্থিতি করুক যে হৃদয় এবং বুদ্ধি সম্মিলিত হইয়া একতান হইবে কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে যে তান উৎপন্ন করে তাহা অপেক্ষা ঐ সম্মিলিত তান শ্রেষ্ঠতর। আমরা অজ্ঞ ও ক্ষুদ্র, যদি আমরা তোমাকে সমতুল্য মনে করিয়া তোমাকে ভয় না করি তাহা হইলে তোমাকে উপহাস করা হয়। নাথ! এই সকল অজ্ঞ সন্তানকে কষ্ট বহন করিতে সক্ষম কর, মোহময় অলীক-সুখাসক্ত জগৎকে তোমার জ্যোতি সহ্য করিতে সমর্থ কর। আমার পাপ সকল ক্ষমা কর, আমার যাহা গুণ তাহাও ক্ষমা কর। যে হেতু মনুষ্যের গুণ, হে

প্রভু! ভ্রান্ত মনুষ্য হইতে প্রাপ্ত, তুমি তোমার গুণ মনুষ্য হইতে প্রাপ্ত হও না। হে পরমাত্মন্! সত্য হইতে আমার প্রচ্যুতি ক্ষমা কর এবং তোমার জ্ঞানে আমাকে জ্ঞানী কর। হে প্রিয় সুহৃদ! তুমি দূরাৎ সুদূরে, তথাপি সুখদুঃখে নিকটে। যখন আমি বিবেচনা করি যে জগতে ক্রম আছে, তাহাতে উন্নততর এবং নিম্নতর আছে, তখন তোমার প্রতি আমার প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়। তুমি জ্ঞাত অথচ অজ্ঞাত! তুমি আমাদের এমন সুহৃদ, যাহার মৃত্যু নাই; তুমি আমার, আমারই, চিরকাল আমারই। হে আশ্চর্য্য বন্ধু! যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই বিদ্যমান! তোমাকে অন্তরতর এবং অন্তরতম রূপে প্রীতি করি কিন্তু তোমার কিছুই জানি না। এক্ষণে বিশ্বজনীন মঙ্গল অভিসন্ধি আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। যখন তাহা প্রতিভাত হয়, তখন তোমাকে সর্ব্বময় দেখি। তোমারই বল বহমান বায়ুতে, তোমারই বল প্রবাহিত স্রোতে। তুমি উদীয়মান সূর্য্যে দণ্ডায়মান, তুমি অস্তমান সূর্য্যে অতীব সুন্দর। তুমি কি? আমি বুঝিতে পারি না। কিন্তু যদিও তুমি নিরাকার এবং নক্ষত্র ও পুষ্পে পরিব্যাপ্ত তথাপি নিরাকার বলিয়া তোমাকে আমি অল্প ভালবাসি না। তোমার প্রেম আমার পূর্ব্বকার ক্ষুদ্র প্রেমকে গ্রাস করিয়াছে, আমার প্রেম এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছে। তুমি দূরে তথাপি চিরকাল নিকটে, এখানে তোমাকে আমি লাভ করিতেছি, এবং এখানেই সুখী, শান্ত ও বন্ধনমুক্ত হইতেছি। আমি তোমার বাণী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশই সম্পাদাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি, এক ঈশ্বর, এক নিয়ম, এক আদিভূত এবং এক সুদূর মহৎ ঐশী ঘটনা যাহার দিকে সমস্ত জগৎ চলিতেছে। তুমি চিরকাল বর্ত্তমান, তুমি চিরকালই প্রীতি করিতেছ। আমি মৃত্যুকালে তোমাকে কখনই হারাইব না।

নিষ্কাম প্রীতি।

মানুষ সহস্র পরিমাণে স্বার্থপর হউক, সে সহস্র পরিমাণে সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা ধন মান অথবা যশ প্রাপ্তির আশয়ে কার্য্য করুক, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে মানব প্রকৃতিতে নিষ্কাম প্রীতির ভাব আছে। পুত্র তাঁহার শেষ দশায় প্রতিপালন করিবে, কেবল এই আশায় কি পিতা তাঁহার পুত্রকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসেন? বন্ধু অর্থানুকূল্য প্রদান করিবেন বলিয়া কি তাঁহাকে আমরা এরূপ প্রীতি করি যে তাঁহার সমাগমে শূন্য পূর্ণ হয় এবং বিপদ সম্পদের ন্যায় প্রতিভাত হয়? মানব-হিতৈষী মহাত্মা কি কেবল যশের নিমিত্ত অবিশ্রান্ত মনুষ্যের হিত-সাধন-জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন? স্বদেশীয় লোক তাঁহাকে উচ্চপদ অথবা যথেষ্ট অর্থপ্রদান করিবে বলিয়া কি স্বদেশ-প্রেমাগ্নি-প্রজ্বলিত-চিত্ত মহাত্মা প্রাণের কিছুমাত্র শঙ্কা না করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য সমরক্ষেত্রে প্রধাবিত হন? কখনই নহে। হিতবাদী দার্শনিকেরা যাহা বলুন না কেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য-স্বভাবে নিঃস্বার্থ প্রীতির ভাব আছে। এই নিঃস্বার্থ ভাবের যতই আমরা উন্নতি সাধন করি ততই আমরা মহৎ নামের যোগ্য হই। সামান্য ব্যক্তি ধন মান যশের লালসায় মহৎ কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু সেই ব্যক্তি যথার্থ মহৎ যিনি নিঃস্বার্থ প্রীতি-ভাব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্য করেন।

নিষ্কাম প্রীতি তখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় যখন তাহা ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত হয়, যখন সেই পরম সুহৃদের অনুপম

গুণে—অনুপম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মন একান্ত তাঁহারই হয়, যখন আত্মা সেই বন্ধুর নিকট হইতে তাঁহা ব্যতীত তাঁহার নিকট হইতে আর অন্য কিছু প্রার্থনা করে না। ইন্ধন যেমন অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইলে তাহার সকলস্থান অগ্নিময় হয় সেইরূপ উক্ত অবস্থাতে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম প্রীতির ভাব দ্বারা আত্মার সকল বৃত্তি প্রদীপ্ত হয়। এই অবস্থাতে সাধক তাঁহার সকল মনন, সকল বাক্য, সকল কার্য্য ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়া এই পৃথিবীতেই অমৃতের অবস্থা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি ঐ প্রেম-প্রভাবে সাংসারিক দুঃখক্লেশ লাঘব করিয়া ও পাপ দমন করিয়া শাশ্বত সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থ ভাবে প্রীতি করা সাংসারিক দুঃখক্লেশ লাঘব করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যদি সেই প্রেমাস্পদ আমাদিগকে হত্যা করেন, তাহা হইতে আহ্লাদিত চিত্তে শির ও প্রদান করিতেই হইবে। যখন আত্মা সেই ঈশ্বর-প্রেমে নিমগ্ন হয়, তখন দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, তখন এই সংসাররূপ সংগ্রাম-ক্ষেত্রের কষ্ট আমরা অপরাজিত চিত্তে সহ্য করিতে পারি। পাপ-প্রবৃত্তি দমন করা মনুষ্য অত্যন্ত দুষ্কর বোধ করে। পাপ-প্রবৃত্তি কখনই উত্তমরূপে দমন হইতে পারে না, যদ্যপি ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম মনে প্রজ্জ্বলিত না হয়। পাপের পরাক্রম এমনি প্রবল যে তাহার একটি উপযুক্ত প্রতিপক্ষীয় শক্তি না থাকিলে সে পরাক্রমকে পরাজিত করিতে পারে না। পাপ যেমন একদিকে মনকে প্রবলরূপে আকর্ষণ করিতেছে তেমনি ঈশ্বর-প্রীতি আর একদিকে সেইরূপ প্রবল রূপ আকর্ষণ না করিলে মনুষ্য কেবল অধোগামী হইতে থাকে, কেবল নরক হইতে নিম্নতর নরকে অবতরণ করে। ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি এইরূপ দুঃখক্লেশ, পাপ ও ভয় পরাজিত করিয়া এই পৃথিবীতেই উচ্চতম স্বর্গের সুখ উপভোগ করেন। সূর্য্য অস্তমিত হইলে রজনীর অন্ধকার আসিয়া জগৎকে আচ্ছন্ন করে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সূর্য্য অস্তমিত হয় না ও অন্ধকার আগমন করে না। তাঁহার আত্মাতে নিত্য উজ্জ্বল দিবস প্রকাশিত রহিয়াছে।

যোগ।

মনুষ্য যতই কেন পাপতাপে অপবিত্র, এবং শোক মোহে অঙ্গীভূত হউক না, তথাচ তাহার জীবনকালমধ্যে সময়ে সময়ে এমন মঙ্গল-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, যৎকালে সে সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন পাইয়া এক এক বার কৃতার্থ হইয়া থাকে। মনুষ্য যতই কেন ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত বিদূরিত হইয়া অধোগতি লাভ করুক না, ঈশ্বর তাহার মোহান্ধ হৃদয়ে এক একবার বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া তাহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। বিষয় বিষে মানব-আত্মা যতই কেন বিচেতন ও বিহ্বল হইয়া পড়ুক না, করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে তাহার সেই বিষজ্বরিত আত্মাতে অমৃত-বিন্দু বর্ষণ দ্বারা তাহাকে জাগ্রত ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলেন। তাহার আত্মাতে বিবেক-বৈরাগ্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে কল্যাণ-চিন্তায় প্রবৃত্ত করেন। তাহার অন্তরাকাশে প্রকাশিত হইয়া অমৃতের স্বাদ-গ্রহণে সমর্থ করিয়া দেন।

যিনি আমারদের চিরকালের শরণ্য, চিরদিনের সুহৃৎ, অনন্তকালের উপজীবিকা, বিদ্যুতের ন্যায় এক একবার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আত্মা চির-পরিতৃপ্ত হয় না—চিরোন্নতি লাভ করিতে পারে না। একদিনের

ভোজন-পানে যেমন আমৃত্যু কখন শারীরিক বল স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না, তেমনই একবার মাত্র ঈশ্বরের দর্শন পাইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে, আত্মার অনন্ত উন্নতি সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নিত্য-নিয়মে পানভোজন করিলে যেমন ক্রমে শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে, তেমনই অবিচ্ছেদে ঈশ্বরের সহিত যুক্তাত্মা হইয়া তাঁহার জ্ঞান-প্রেম-অমৃত-সম্ভোগে নিযুক্ত থাকিলে, তবে আত্মা ক্রমে উন্নত পবিত্র ও প্রশস্ত হন। সেই পরম দেবের সহবাসে থাকিয়া আত্মা অল্পে অল্পে পুণ্যভাব দেবভাব উপার্জ্জন করিতে থাকে।

শরীর প্রাণে যতক্ষণ যুক্ত থাকে, ততক্ষণই যেমন মনুষ্য জীবিত, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যতক্ষণ যোগ থাকে, আত্মাও তেমনি ততক্ষণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ, জাগ্রত ও জীবন্ত। পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত হইলেই আত্মার স্ফূর্ত্তি-উদ্যম, সৌন্দর্য্য উন্নতি সকলই চলিয়া যায়। তাহার দেবভাব পুণ্যভাব তিরোহিত হয়। অমৃত-ধামের যাত্রী হইয়াও সে সংসার-কারাগৃহের বন্দী হইয়া পড়ে। বৃক্ষ-লতা যতদিন পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করিতে পারে, ততদিনই যেমন তাহারা পুষ্পফলে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, দুগ্ধপোষ্য শিশু যতকাল মাতার স্তন-দুগ্ধে পরিপোষিত হয়, ততকালই যেমন তাহার প্রকৃত শ্রী সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, অমৃতপায়ী আত্মাও তেমনি যতকাল ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার অমৃত পান করিতে পারে, ততক্ষণই তাহার উন্নতি এবং ততক্ষণই সে জীবিত।

বৃক্ষ লতা, পশুপক্ষীর ন্যায় আত্মা দুই দিন বা দশ দিন অথবা শত বৎসরের জন্যও সৃষ্ট হয় নাই। আত্মা অমর। আত্মা অনন্তকালের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। আত্মা কেবল পৃথিবীর অধিবাসী নহে, সে অমৃতধামের যাত্রী। পরব্রহ্মের সহিত যোগ-জনিত আনন্দ সম্ভোগের শক্তি সামর্থ্য, এ পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর কৃপা করিয়া জীবাত্মাকে কেবল এই উন্নত অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যোগসুলভ স্বর্গীয় উপাদানে মানব-আত্মাকেই তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জল জলের সঙ্গে, বায়ু বায়ুর সঙ্গে, মৃত্তিকা, মৃত্তিকার সঙ্গেই মিশ্রিত হইতে পারে। শরীর, শরীরের সঙ্গেই একত্রিত হইতে সমর্থ হয়, মন, মনের সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করিতে পারে, কিন্তু আত্মা পরমাত্মার সহিতই অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইতে সমর্থ হয়। সমধর্ম্মী না হইলে কদাচ যোগ হয় না। সেই জন্য প্রেমিক প্রেমিকের সঙ্গে, জ্ঞানী জ্ঞানীর সঙ্গে, সাধু সাধুর-সঙ্গে একপ্রাণ ও একহৃদয় হইয়া থাকেন। সেই কারণেই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে—সেই পরম সখার সঙ্গে অধ্যাত্ম-যোগে একাত্ম হইয়া থাকিতে পারে। যোগ কি? যোগ শব্দের অর্থ মিলন। ঈশ্বরের সঙ্গে, আত্মার এমন কি সাদৃশ্য আছে, যাহাতে সে তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতে পারে। ঈশ্বর অশরীরী, আত্মার আকার নাই। ঈশ্বর অমৃত-স্বরূপ, জীবাত্মা তাঁহার প্রসাদে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি পূর্ণ জ্ঞান, আত্মার জ্ঞান আছে, তিনি পূর্ণ-প্রেম পূর্ণমঙ্গল; জীবাত্মার প্রেম ও মঙ্গল ভাব আছে। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ, জীবাত্মার শিক্ষা সাধন তপস্যা প্রভাবে ক্রমে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভাব উপার্জ্জন করিবার অধিকার আছে। অতএব শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপের সহিত যুক্তাত্মা হইবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল হইবে।

যোগ-সাধনের জন্য যেমন আত্ম-প্রভাবের প্রয়োজন, তেমনই দেবপ্রসাদও একান্ত

প্রার্থনীয়। যতদূর আপনার বলে, আপনার যত্নে সম্পাদিত হয়, তাহা সংসাধন করিবে; তৎপরে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর-প্রসাদ প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কৃপা, তাঁহার সাহায্য ভিন্ন আমরা একপদও তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইতে পারি না। বালকের বল যেমন রোদন, সাধকের বল তেমনি প্রার্থনা। আমরা তাঁহার প্রার্থী হইলে, তিনি কখনই আমারদিগকে নিরাশ করেন না। সন্তান যেমন মাতাকে চায়, মাতাও যেমন সন্তানকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দান করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তেমনই সাধক যেমন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে, ঈশ্বরও তেমনি তাঁহার আত্মাতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে চান। তিনি যদি আমারদের আত্মাতে আবির্ভূত হইতে না চাহিতেন, তবে আমারদের এমন কি পুণ্যবল, ধর্ম্মবল যে আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিতাম। তিনি যদি আমারদিগকে প্রেমালিঙ্গন না দিতেন—আমারদের হৃদয়-কুটীরে আত্মা-আসনে আপনিই অবতীর্ণ না হইতেন, তবে আমারদের প্রাণের এমন কি মূল্য, যাহার প্রভাবে আমরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে পাইতাম। যিনি আমারদের ক্ষুদ্র চক্ষুকে এমনই বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে আমরা এক দৃষ্টিতে এক কালে নদী, গিরি সমুদ্র চন্দ্র সূর্য্য সম্বলিত অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতেছি, তিনিই আমারদের আত্মাকে এমনই অপূর্ব্ব উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন যে আত্মা ক্ষুদ্র পরিমিত হইয়াও এককালে তাঁহার অনন্ত পূর্ণ ও মহান্ ভাব প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতেছে। আত্মদর্শনে তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলরূপ সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাতেই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি যে আমারদিগকে তাঁহার সহচর অনুচর করাই তাঁহার একান্ত লক্ষ্য। ইহাতেই সুস্পষ্ট বুঝিতেছি যে তিনি আমারদেরই জন্য, আমরা তাঁহারই নিমিত্ত। এই পৃথিবীতে যদি কাহাকেও আমরা আত্মীয় শব্দে সম্বোধন করিতে পারি, তবে ঈশ্বর ভিন্ন আর আমারদের পরমাত্মীয় দ্বিতীয় নাই। তাঁহার শরণাগত অনুগত হওয়াই আমারদের শান্তি-মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহার সঙ্গে যুক্তাত্মা হওয়াই অনন্ত উন্নতি লাভের একমাত্র সোপান।

আমারদের জ্ঞান-স্রোতকে সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের সহিত যুক্ত করা, আমারদের প্রীতিকে তাঁহার প্রীতির সহিত যোগ করা, আমারদের মঙ্গল ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করা, সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরকে সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ অভ্রান্ত আদর্শ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীনরূপে তাঁহারই অনুকরণ করাই যোগ। অনিমেষ জ্ঞান-নেত্রে তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখার নামই অধ্যাত্ম যোগ। যে কৃতপুণ্য সাধু, এই অধ্যাত্ম-যোগে ঈশ্বরের সহিত যুক্তাত্মা হইয়াছেন, তিনিই সংসারের পাপ তাপ, হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই রমণ করেন এবং অকুতোভয়ে অপরাজিত উৎসাহে সেই প্রাণসখার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল থাকেন। তাঁহার কথা বলিতে, তাঁহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতে, তাঁহারই অমৃতময় তত্ত্ব ধ্যান ধারণা জল্পনা করিতেই তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই উৎসুক। তাঁহার কথা ভিন্ন অন্য কথা আর তাঁহার পক্ষে সুখকর আনন্দকর ও তৃপ্তিকর হয় না, সুতরাং ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া তিনি আর কোন কথাই কহেন না। প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি, বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও প্রেমযোগের সঞ্চার হই-

তেছে. কি লক্ষণ বা নিদর্শন দ্বারা সাধক তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ হয়? যখন ঈশ্বরের লক্ষ্যের সহিত আমার লক্ষ্যের মিল হয়, যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যখন তাঁহার মঙ্গল কামনার সহিত আমার কামনা একীভূত হয় তখনই প্রত্যক্ষ বলিতে পারি যে আত্মা তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত হইতেছে। যখন তাঁহার জগতের মঙ্গল আমার মঙ্গল, তাঁহার সত্যের জয়ে আমার জয়, তাঁহার জ্ঞানধর্ম্ম প্রচারে আমার আনন্দ অনুভব হইতে থাকে, তখনই প্রত্যক্ষ জানিতে পারি, তাঁহার সহিত আমার আত্মার যোগ হইয়াছে। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত, যখন আমারও তাহাই কামনা; তাহার যাহা লক্ষ্য, যখন আমার তাহাই কার্য্য হইয়া উঠে, তখনই প্রত্যক্ষ জানিতে পারি যে তাঁহার সহিত আমার আত্মার প্রকৃত যোগ নিবদ্ধ হইয়াছে। যখন আমার ইচ্ছা আর দ্বিধা ভাব ধারণ না করে, যখন আমার লক্ষ্য আর স্বার্থদূষিত না হয়, যখন আমার কার্য্য ফলকামনাশূন্য হয়, তখনই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে পরমাত্মার সঙ্গে আমার যোগ সঞ্চার হইয়াছে। তখন আত্মা কি মনোহর ভাব ধারণ করে! কি আশ্চর্য্য দেব-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়! তখন আত্মা অধোলোকের শিক্ষা সাধন উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়া, সত্য-স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিতে থাকে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

এই যোগই সাধকের লক্ষ্য, এই যোগই তাহার কামনা, এই যোগই তাহার কার্য্য। যাহাতে আত্মা এই যোগভ্রষ্ট না হয়, তৎপ্রতি সাধকের সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যোগসাধন যেমন বহু-আয়াস-সাপেক্ষ যোগ-রক্ষাও তেমনি বহুযত্ন ও বহু তপস্যাধীন। অতএব সাধক যোগের গাঢ়তা সম্পাদন জন্য, যোগ-বিঘ্ন-নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিবেন। অনন্যমনা হইয়া সর্ব্বক্ষণই তাঁহার বরণীয় জ্ঞান শক্তি চিন্তায় নিমগ্ন হইবেন।

হে পরমাত্মন্! আমরা পাপতাপে অপবিত্র হইলেও তুমি কৃপা করিয়া আমারদের আত্মাতে এক একবার দর্শন দিয়া এই অধোলোকেই আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছ। মুহূর্ত্তের জন্য তোমার সহবাস লাভ করিয়া আমারদের আত্মা যেরূপ সুখ সচ্ছন্দতা উপভোগ করে, আর কিছুতেই সে তাহার অনুরূপ শান্তি মঙ্গল, আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সেই এক এক নিমেষের যোগেই আমরা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি ভিন্ন আর আমারদের আরাম-স্থান নাই, তুমি ভিন্ন আর আমারদের শিক্ষাসাধন উন্নতির দ্বিতীয় সোপান নাই। তুমিই আমারদের "একায়নং"। যখন তুমি কৃপা করিয়া আমারদের আত্মাতে এক একবার দর্শন দিতেছ, তখন আর আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা পাপী তাপী হইলেও তোমার পুত্র ভিন্ন আর কাহারও নহি। আমরা দুষ্ট দুরাচার ও স্বেচ্ছাচারী হইলেও তোমার চিরাশ্রিত চিরভিখারী ভিন্ন আর কাহারও দ্বারস্থ নহি। হে ঈশ্বর! তুমি সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যাহাতে তোমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিতে পারি তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগকে এরূপ ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তোমার সন্নিধানে এইই আমারদের কামনা, কেবল এইই আমারদের আন্তরিক প্রার্থনা।

অসভ্য জাতিগণের সৌন্দর্য্যের ভাব।

সৌন্দর্য্যানুরাগ মনুষ্য-হৃদয়ের একটি অতি গভীর স্বাভাবিক বৃত্তি। সভ্য, অসভ্য, ধনী, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই সৌন্দর্য্য ভাল বাসে। কিন্তু সকলের সৌন্দর্য্যের ভাব এক নহে। সভ্য জাতিরা যাহা সুন্দর বলে, অসভ্য জাতিরা তাহা হয়ত সুন্দর বলে না। আমি যাহাকে সুন্দর বলি হয় ত আর এক ব্যক্তি তাহাকে কুৎসিত বলিবে। এই রূপ সকল জাতি এমন কি এক জাতীয় সকল মনুষ্যের সৌন্দর্য্যের ভাব সমান নহে। পৃথিবীর সভ্য জাতির সৌন্দর্য্যের ভাব হইতে অসভ্য জাতির সৌন্দর্য্যের ভাব কতদূর বিভিন্ন তাহা আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমেরিকা-নিবাসী অসভ্যেরা যে স্ত্রীলোকের প্রশস্ত চৌরস মুখ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু, উচ্চ অস্থিবিশিষ্ট কপোল, পিঙ্গলবর্ণ গাত্র, অপ্রশস্ত কপাল, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও স্থূল নাসিকা আছে তাহাকে পরমা সুন্দরী বলিয়া সমাদর করে। পর্য্যটক পেলাস বলেন, চীন দেশের উত্তর ভাগস্থ দেশ সমূহে প্রশস্ত নাসিকা ও দীর্ঘ কর্ণ সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। চীন দেশে ও জাপান দ্বীপে চক্ষুর বক্রদৃষ্টি সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ফিন্‌লেসন বলেন যে কোচিন চীন নিবাসীদিগের প্রায় গোলাকার মুখ দেখা যায়, এবং তাহারা যে সকল স্ত্রীলোকের মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার সেই সকল স্ত্রীলোককে সুন্দরী বলিয়া থাকে। হটেণ্টট্ নামক অসভ্য জাতির মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠ দেশ উন্নত তাহারা সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ জাতীয় পুরুষেরা উন্নত-পৃষ্ঠ-বিশিষ্টা অথবা কুব্জা স্ত্রীলোককেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী জ্ঞান করে ও এতাদৃশ রূপ-সম্পন্ন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে অনেকে প্রার্থী হয়। আফ্রিকা নিবাসী অসভ্য জাতিরা কৃষ্ণবর্ণকে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা ইংরাজদিগের গৌর বর্ণকে অতিশয় ঘৃণা করে। ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষ অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের বিবাহ হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। এক জনকে গৌর-বর্ণ-বিশিষ্ট বলা কাফির নামক আফ্রিকাস্থ অসভ্য জাতি মধ্যে নিতান্ত অপমানসূচক বাক্য। জুলু নামক দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ অসভ্য জাতীয় রাজার "কৃষ্ণবর্ণ" অত্যন্ত সম্মান-সূচক উপাধি। জাবাদ্বীপবাসীদিগের মধ্যে কোন বালিকা ও যুবতী পীতবর্ণা হইলে সে অনুপম সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি অসভ্য জাতিরা দীর্ঘ কেশপাশ সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করে। যাহার মস্তকের কেশ যত দূর দীর্ঘ তাহাকে তত সুন্দর বা সুন্দরী বলিয়া জ্ঞান করা হয়। ঐ দেশের ক্রোউ নামক জাতি মধ্যে যে ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা কেশ দীর্ঘ তাহাকে রাজপদে অভিষেক করা হয়। এক জন ইংরাজ পর্য্যটক বলেন যে একদা ঐ জাতির কোন বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে তাহারা আপনাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকেশযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা ও অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করে ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তির কেশপাশ ৭ হস্ত দীর্ঘ ছিল। কুইচ ও অমর নামক দক্ষিণ আমেরিকার জাতিদ্বয়ের মধ্যে মস্তকের সুদীর্ঘ কেশ সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হয়। মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া দেওয়া তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার অসভ্য জাতিগণ মস্তকের সুদীর্ঘ কেশ সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শ্মশ্রু ধারণ অসৌন্দর্য্যের কারণ বিবেচনা করে। পেরাগুয়ে নিবাসী অসভ্যেরা মুখে একটিও কেশ থাকিলে তাহা নিতান্ত কদর্য্য জ্ঞান করে। এই জন্য ইহারা চক্ষুর পাতার ও ভ্রূযুগলের কেশ সকল উৎপাটন করিয়া ফেলে। ক্যালমক্ জাতি ও পোলিনেসীয়া নিবাসীদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়। জাপানদ্বীপ-বাসীদিগের বিশ্বাস এই যে গোঁপ রাখিলে কুৎসিত দেখায়। ইংরাজেরা গোঁপ রাখিয়া থাকে দেখিয়া তাহারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। নিউজিলণ্ড-বাসীরাও মুখের কোন স্থানে একটিও কেশ রাখে না। তাহাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে কেশাবৃত মুখবিশিষ্ট পুরুষের বিবাহ অসম্ভব। পোলিনেসিয়া, নিউজিলেণ্ড, এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থ টঙ্গা ও সেমোয়া নামক দ্বীপদ্বয় নিবাসী ও কেলমক জাতি স্বভাবতই শ্মশ্রুবিহীন, তজ্জন্যই বোধ হয় ইহারা শ্মশ্রু নিতান্ত কুৎসিত ও কদর্য্য বিবেচনা করে। আবার আফ্রিকার মকনলো জাতি ও ফিজিয়ানেরা সুদীর্ঘ শ্মশ্রু সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন জ্ঞান করে।

আমেরিকার কোন কোন অসভ্য জাতি চৌরস মস্তক এবং কোন কোন জাতি উচ্চ মস্তক সৌন্দর্য্যের চিহ্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। যাহারা উচ্চ মস্তক সৌন্দর্য্যের লক্ষণ জ্ঞান করে তাহারা নানা উপায়ে মস্তক মন্দিরের ন্যায় উচ্চ করিয়া থাকে। আরাকান নিবাসীরা প্রশস্ত, নিম্ন, ও চৌরস কপাল সুন্দর বিবেচনা করে এবং যাহারা স্বভাবতঃ অপ্রশস্ত ও উচ্চ কপাল-বিশিষ্ট তাহারা আপনাদিগের কপাল সুন্দর অর্থাৎ নিম্ন ও চৌরস করিবার জন্য এক খণ্ড সীশার ভারযুক্ত পাত বাল্যকাল হইতে কপালে বাঁধিয়া রাখে। টাহিটি ও সুমাত্রা দ্বীপ ও ব্রেজিলরাজ্যনিবাসিগণ এবং আফ্রিকার হটেণ্টট ও নিগ্রো জাতিরা দীর্ঘ নাসিকাকে অতি সুন্দর জ্ঞান করে। চীন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ক্ষুদ্র পদ অতিশয় সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বোধ করে, এবং ঐ দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্ষুদ্র পদদ্বয় নানা কৃত্রিম উপায়ে আরও ক্ষুদ্র করিয়া থাকে।

আফ্রিকার কোন কোন জাতি চক্ষুর পাতা কৃষ্ণবর্ণে ও নখরের উপরিভাগ পীত বা ধূম্রবর্ণে রঞ্জিত করা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বিবেচনা করে। কোন কোন অসভ্যজাতি মুক্তা-পংক্তির ন্যায় শুভ্র দন্তকে কুৎসিত বিবেচনা করিয়া তাহা কৃষ্ণ কিম্বা নীল বর্ণে রঞ্জিত করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী কর্ডোফান ও ডরফুর নামক প্রদেশনিবাসীরা নানা কৃত্রিম উপায়ে শরীরের কোন কোন স্থান আবের ন্যায় স্ফীত করিয়া থাকে। যাহার গাত্রের অনেক স্থল ঐরূপ স্ফীত থাকে সে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বা সুন্দরী বলিয়া সকলের নিকট আদৃত হয়। পুরাকালীন ইহুদিরা ও ব্রীট-নেরা উল্কী ধারণ বিশেষ সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক মনে করিত। বর্ত্তমান কালে উত্তর সাগর হইতে নিউজিলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এমন একটি প্রধান দেশ নাই যদ্দেশবাসীরা উল্কী না পরিয়া থাকে অথবা উল্কী পরা সৌন্দর্য্যের চিহ্ন জ্ঞান না করে। উত্তর নাইল-তীরবাসী জাতিরা সম্মুখস্থ চারিটী কুক্কুর-দন্ত অতি কদর্য্য ও সৌন্দর্য্যের হানিকর বিবেচনা করে এবং তজ্জন্য তাহা উৎপাটন করিয়া ফেলে। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা-নিবাসী অসভ্য জাতিরা উপরের কিম্বা নিম্নের ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া থাকে। আফ্রিকার বটকুদ জাতীয় লোকেরা নিম্ন ওষ্ঠ এত দীর্ঘ করিয়া বিদ্ধ করিয়া থাকে যে তাহার মধ্য দিয়া ৪ ইঞ্চি

ব্যাসের একটি কাষ্ঠখণ্ড অনায়াসে রক্ষিত হয়। মধ্য আফ্রিকা নিবাসী অসভ্য স্ত্রীলোকেরা নিম্ন ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটি দোদুল্যমান লম্বা অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; বাক্যালাপ সময়ে তাহা এরূপ ভাবে দুলিতে থাকে যে তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আফ্রিকার অন্তঃপাতী লেটুকা নামক প্রদেশের অধীশ্বরী বিখ্যাত ইংরাজপর্য্যটক সার সামুয়েল বেকরকে বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যদ্যপি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিম্ন ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে লম্বা দোদুল্যমান অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার সৌন্দর্য্য অনেক বর্দ্ধিত হইবে। লেটুকা প্রদেশের দক্ষিণস্থ মাকালল নামক প্রদেশস্থ স্ত্রীলোকেরা উপরকার ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে বংশ-নির্ম্মিত কিম্বা কোন ধাতুনির্ম্মিত এতদ্দেশ-ব্যবহৃত নথের ন্যায় গোলাকার এক প্রকার অলঙ্কার পরিধান করে। ইহারা এই অলঙ্কারকে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বিবেচনা করিয়া থাকে। এই অলঙ্কারের নাম পেলিলি। ঐ দেশের পুরুষেরা বলে যে শ্মশ্রু যেমন পুরুষের সৌন্দর্য্যের একমাত্র কারণ সেইরূপ পেলিলি অলঙ্কার স্ত্রীলোকের একমাত্র সৌন্দর্য্যের কারণ।

পশুদিগের মানসিক বৃত্তি।

আমাদিগের মধ্যে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পশুদিগের স্বাভাবিক অন্ধ সংস্কার ভিন্ন বুদ্ধি, বিবেচনা, ও স্মরণ শক্তি এবং স্নেহ, দয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কোমল মানসিক বৃত্তি নাই। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক এবং প্রাণিতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধী। পশুরা যে স্বাভাবিক অন্ধ সংস্কার ব্যতীত কতকগুলি মানসিক বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা আমরা এই প্রস্তাবে পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পশুদিগের যে অল্প পরিমাণে বুদ্ধি-শক্তি আছে, তাহারা যে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, এবিষয়ে প্রাণিতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকগণের দ্বিধা মত নাই। গৃহ-পালিত কিম্বা বন্য সকল-প্রকার পশুকেই কোন রূপ কার্য্য-প্রবৃত্তির অগ্রে কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাব অবলম্বন ও বিবেচনা পূর্ব্বক সুদৃঢ় সংকল্পে কার্য্য করিতে দেখা যায়। রেঙ্গার (Rengger) নামক ইউরোপীয় কোন সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার পালিত বানরদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পর্কে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য উদাহরণ দিয়াছেন। রেঙ্গার যখন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার একটি বানরকে হংস-ডিম্ব খাইতে দেন তখন সে উহা ভাঙ্গিতে গিয়া এক কালে চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য ঐ ডিম্বের অনেক সার অংশ নষ্ট হয়। পরে ঐ বানরকে খাইবার জন্য যত ডিম্ব দেওয়া হইত সে তাহা প্রথমে একটি দৃঢ় পদার্থে অতি ধীরে ধীরে আঘাত করিত এবং উহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ফুটা করিয়া পরে হস্ত দ্বারা ইহার ছাল উঠাইয়া ফেলিত ও খাইত। একবার একটি বানর এক খানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় শরীরের একস্থান কাটিয়া ফেলিয়াছিল, এই ঘটনার পরে তাহাকে যদি যখন কোন অস্ত্র দেওয়া হইত সে তাহা ভয়ে ভয়ে সাবধানে ব্যবহার করিত। রেঙ্গার তাঁহার গৃহ-পালিত বানরদিগকে সর্ব্বদাই কাগজের মোড়কের মধ্যে করিয়া মিছরির টুকরা দিতেন। একদা তিনি পরীক্ষার্থ একটা বানরকে ঐরূপ কাগজের মোড়ক করিয়া মিছরির টুকরার পরিবর্ত্তে একটি জীবন্ত বোলতা দেন। বানর মিছরি মনে করিয়া যেমন ঐ কাগজের মোড়ক

খুলিল বোলতা তৎক্ষণাৎ আঘাত পাইয়া তাহাকে গিয়া সক্রোধে দংশন করিল। এই ঘটনার পরে রেঙ্গার যখনই কাগজের মোড়ক করিয়া কোন খাদ্য সামগ্রী দিতেন ঐ বানরটি তাহা অতি সাবধানে উঠাইয়া লইত এবং তন্মধ্যে বোলতা কিম্বা অন্য কোন জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা জানিবার জন্য তাহা কর্ণের কাছে ধরিয়া তাহার ভিতর কোন শব্দ হইতেছে কিনা তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া পরে তাহা খুলিত। কলকোহন নামক কোন ইংরাজ শিকারী একদা এক নদী-তীরে দুইটি হংসকে গুলি করেন; হংসদ্বয় পক্ষপুটে আহত হইয়া নদীর পর পারে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকে। এই অবসরে শিকারী কলকোহন তাঁহার কুকুরকে সঙ্কেত করিলেন। কুক্কুর সঙ্কেত পাইবামাত্র সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া এককালে দুইটি হংসকে আনিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইল না। ঐ দুইটি হংস তখনও পর্য্যন্ত জীবিত আছে, তাহা দেখিয়া কুক্কুর একটিকে আনিতে আর একটি পলাইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় দুইটিকে বধ করিল এবং দুইবারে দুইটিকে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। কর্ণেল হচিনসন্ বলেন যে একদা তিনি এক যোড়া তিত্তিরী পক্ষীকে গুলি করেন। তন্মধ্যে একটি হত হয়, অপরটি পক্ষপুটে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হয়, এবং দৌড়াইয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তদ্দণ্ডেই তাঁহার সমভিব্যাহারী শিকারী কুক্কুর বেগে গিয়া উহাকে ধরে; সে যখন উহাকে লইয়া প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করে, তখন দেখিল পথিমধ্যে হত পক্ষীটি পড়িয়া আছে। সে তাহাকে উঠাইয়া লইতে চেষ্টা করিল কিন্তু তখন বুঝিল যে উহাকে লইতে গেলে আহত পক্ষীটি পলাইবার সুযোগ পায়, তখন সে আহতকে এককালে বধ করিল, পরে দুইটি পক্ষীকে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। বিচক্ষণ প্রাণিতত্ত্ববিদ গার্ডনার (Gardner) বলেন যে একদা তিনি কোন এক নদী-তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ-কালে দেখিলেন তথায় একটা কাঁকড়া গর্ত্ত খুলিতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া ঐ গর্ত্তের দ্বারে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। এক খণ্ড প্রস্তর গর্ত্তের ভিতর গিয়া পড়িল, আর তিন চারি খণ্ড উহার মুখের নিকট পড়িয়া রহিল। তখন কাঁকড়াটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে গর্ত্ত মধ্যে পতিত প্রস্তর খণ্ডগুলি উঠাইয়া গর্ত্তের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। কিন্তু যখন দেখিল যে আরও কয়েক খণ্ড প্রস্তর গর্ত্তের মুখের নিকট রহিয়াছে, তাহা ভিতরে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা, তখন সে সেই গুলি তথা হইতে দূরে রাখিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্ত খুলিতে লাগিল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রাণিতত্ত্ববিৎদিগের বর্ণিত, এই সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে পশুদিগের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি আছে।

কল্পনাশক্তি মনুষ্যের একটি প্রধান মানসিক বৃত্তি। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন পশুদিগের যে কল্পনা-শক্তি আছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কল্পনা-শক্তি না থকিলে স্বপ্ন দেখা অসম্ভব হইত। স্বপ্ন দেখা কল্পনাশক্তির কার্য্য। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কহেন কুক্কুর, বিড়াল, ঘোটক, প্রভৃতি পশুরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে।

পশুদিগের যে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি আছে, সকলেই আপনাদিগের পালিত পশুদিগের নিকট তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তথাপি কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। উত্তমাশা অন্তরীপে সার এণ্ড স্মিথ্ নামে কোন বিখ্যাত

ইংরাজের এক বানর ছিল; কোন কার্য্য বশত তিনি তথা হইতে দেশান্তর প্রস্থান করেন এবং নয় মাস পরে তথায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ বানর এই দীর্ঘ কাল ব্যবধানেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডারউইন সাহেবের এক কুক্কুর ছিল। সে আপনার প্রভু ভিন্ন আর কাহারও নিকট যাইত না। একদা ডারউইন তাহার স্মরণশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পাঁচ বৎসর ছয় মাসকাল কোন এক দূরস্থ গ্রামে রাখিয়া আইসেন এবং ঐ দীর্ঘ কালের পর তিনি পুনর্ব্বার তাহার নিকট যান। সে তখন তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল এবং তিনি যাহা আজ্ঞা করিতে লাগিলেন তাহা করিতে লাগিল। পিয়ার হিউবর (Pierre Huber) নামক সুবিখ্যাত পিপীলিকাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে পিপীলিকাগণের আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি আছে। তিনি বলেন এক দল পিপীলিকা অন্য একটি দল পিপীলিকা হইতে চারি মাস কালের জন্য স্থানান্তর হইয়াছিল, পরে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তাহাদের আকার ইঙ্গিতে অনুমান হইল যে এত দিনের পরেও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছে।

বিষয়ে মনঃসংযোগের শক্তি মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির প্রধান উপায় বলিতে হইবে। পশুদিগেরও যে মনঃসংযোগ করিবার শক্তি আছে তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন একটি বিড়াল পাখী কিম্বা ইন্দুর শীকার করে তখন সে লক্ষ্যে কতদূর স্থিরতা ও মনঃসংযোগের সহিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহা ধরিবার চেষ্টা করে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুসকল শীকার করিবার সময় লক্ষ্যের প্রতি এত দূর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে যে ঐ সময় অবাধে তাহার নিকটে গিয়া অনায়াসে তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বধ করা যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাহারা বানরের ক্রীড়া প্রদর্শন করাইয়া বেড়ায় তাহারা বানর ক্রয় করিবার সময় যে বানরগুলি অধিক কাল মনঃসংযোগ করিতে পারে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অধিক মূল্যে ক্রয় করে, কারণ তাহারাই অল্প সময়ের মধ্যে নানারূপ ক্রীড়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

মনুষ্যের অনুকরণ-শক্তি তাহার উন্নতির অনেক সহায়তা করে। দেখা যায় কোন কোন পশুরও বিশেষ অনুকরণ-শক্তি আছে। এক জন প্রাণিবিদ্যাবিৎ বলেন যে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুইটি ব্যাঘ্রশাবক কোন এক স্ত্রীজাতীয় কুক্কুর দ্বারা পালিত হইয়াছিল। ঐ দুইটি ব্যাঘ্র-শাবক বড় হইলে কুকুরের ন্যায় চিৎকার করিত। ডারউইন সাহেব কোন কোন শৃগালকেও কুকুরের অনুরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়াছেন। বানরের অনুকরণ-শক্তি সকল-পশুর অপেক্ষা অধিক। ইহারা যে অনায়াসে মনুষ্যের অনুকরণ করিয়া থাকে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পক্ষিজাতি অনুকরণে বিশেষ পটু। কতকগুলি বিশেষ জাতীয় পক্ষী অন্যান্য পক্ষীর শব্দ ও সঙ্গীতধ্বনি অবিকল রূপে অনুকরণ করিতে পারে। শুক, টিয়া ময়না প্রভৃতি পক্ষীর অসামান্য অনুকরণশক্তি আছে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বঙ্গদেশে ভীমরাজ অথবা ভৃঙ্গরাজ নামে এক জাতীয় পক্ষী আছে। উহারা যে শব্দ শুনিতে পায় তৎক্ষণাৎ অবিকল তাহা অনুকরণ করিয়া থাকে।

কোন একটি নূতন ও অসামান্য বস্তু দেখিলে মনুষ্য যেমন বিস্মিত হয় তেমনি পশুরাও কোন নূতন ও অসামান্য বস্তু দেখিলে

বিস্মিত হয় এরূপ দেখা গিয়াছে। কোন কোন পশু নূতন বস্তু দেখিবার কি জানিবার জন্য মনুষ্যের ন্যায় কৌতূহল পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্রেম (Brehm) নামক সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলেন এক সময়ে তাঁহার আশ্রয়ে কয়েকটি বানর ছিল। উহারা সর্পকে অত্যন্ত ভয় করিত। একদা তিনি একটি বাক্সে পরীক্ষার্থ কতকগুলি সর্প রাখিয়াছিলেন। বানরেরা জানিত যে ঐ বাক্সে সর্প আছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহারা এতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হইত যে কখন কখন তাহারা একে একে ঐ বাক্সের ডালা উঠাইয়া সর্পগুলিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। একদা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ডারউইন সাহেব লণ্ডনের পশ্বালয়ের যে গৃহে বানর থাকে সেই গৃহে একটি মৃত সর্প লইয়া গিয়া তাহাদিগের সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। সর্প দেখিয়া বানরগুলা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল। পরিশেষে যখন দেখিল যে উহা স্পন্দহীন নির্জ্জীব তখন তাহারা সাহস আশ্রয় করিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একে একে তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া অতি মনোযোগের সহিত তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ডারউইন সাহেব বানরদিগের কৌতূহল-বৃত্তি পরীক্ষার্থ কখন কখন উহাদিগের মধ্যে মৃতমৎস্য, ইন্দুর, বা অন্য কোন ক্ষুদ্র প্রাণী নিক্ষেপ করিতেন এবং প্রতিবারেই বানরেরা সমান আশ্চর্য্যের ভাব ও কৌতূহল প্রকাশ করিত।

কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানসিক বৃত্তিও কোন কোন পশুদিগের মধ্যে দেখা যায়। অনেকে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি স্নেহ ও দয়ার বিশেষ নিদর্শন পাইয়াছেন। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রণীত প্রাণি-বৃত্তান্তে নানা পশু ও পক্ষীর স্নেহ দয়া প্রভৃতি গুণের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা এক্ষণে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। কাপ্তেন ষ্টানসবরি সাহেব দেখিয়াছেন, আমেরিকার উটা নামক স্থানে কতক গুলি পেলিকান পক্ষী একটি বৃদ্ধ চলৎশক্তি-বিহীন অন্ধ ভক্ষ্য-আহরণে অপারগ একটি পেলিকান পক্ষীকে প্রত্যহ আহার যোগাইত। ব্লিথ সাহেব বলেন যে তিনি যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন তখন দেখিয়াছেন, কোন স্থানে কতকগুলি কাক একটি অন্ধ বৃদ্ধ কাককে আহার দিতেছে। গৃহপালিত কুক্কুটদিগের মধ্যেও এই রূপ দয়া ও স্নেহের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডারউইন সাহেব বলেন "একটি বিড়াল ও একটি কুকুরের পরস্পর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। একদা ঐ বিড়ালটি পীড়িত হইয়া কিছুকাল চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়ে, তৎকালে কুকুরটি সর্ব্বদা ঐ বিড়ালের নিকট যাইয়া তাহার গাত্র লেহন করিত এবং তাহার প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করিত। গৃহপালিত কুকুরের প্রভুভক্তির অনেক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আছে। প্রভুকে কোন মনুষ্য কিম্বা কোন জন্তু আক্রমণ করিলে কুকুর তাহাকে যথাসাধ্য তাহার প্রতিফল দিতে ত্রুটি করে না। বানরদিগেরও দয়া ও স্নেহের নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা বিলাতের পশ্বালয়ের একটি গৃহে দুইটি বানর রক্ষিত হয়, একটি আমেরিকা দেশীয় ক্ষুদ্র বানর, অপরটি আফ্রিকার বৃহদাকার বানর। ইহাদিগের একজন রক্ষক নিযুক্ত ছিল। ক্ষুদ্র বানরটি রক্ষকের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। একদিন বৃহদাকার বানরটি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রক্ষকের গলদেশ সাংঘাতিকরূপে কামড়াইয়া ধরে। ক্ষুদ্র বানরটি ইহা দেখিয়া বৃহদাকার বানরকে এ প্রকার আঁচড়াইতে ও কামড়াইতে লাগিল যে, সে জ্বালায় অস্থির

হইয়া রক্ষককে ছাড়িয়া দিল। কোন সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় ললনা লিখিয়াছেন "আমার ইয়ারিকো নাম্নী একটী কুকুটী ছিল। যখন এক বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাহার প্রায় দশ বারটি শাবক হইয়াছিল। ইয়ারিকো শাবকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে বাস করিত। আমি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতাম ও তাহাকে আহার দিতাম। এক দিন প্রাতঃকালে গিয়া দেখি একটা শৃগাল ইয়ারিকোর শাবকগুলি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ইয়ারিকো তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া শৃগালের সম্মুখে পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইল যেন সে শৃগাল-হস্তে আপনার জীবন হারাইবে তথাপি প্রাণাধিক শাবকগুলিকে লইতে দিবে না। আমি তৎক্ষণাৎ আমার কুক্কুরকে ইঙ্গিত করিলাম। কুক্কুর মহাবেগে গিয়া শৃগালকে ঐ দুঃসাহসের উপযুক্ত প্রতিফল দিল এবং ইয়ারিকো ও তাহার শাবকগুলির প্রাণরক্ষা করিল। এই ঘটনার পরে দেখিলাম ইয়ারিকোর সহিত আমার কুক্কুরের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইয়াছে। ইয়ারিকো কুক্কুরের নিকট এই উপকার-সূত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ। এই সময় হইতে উভয়ে এক সঙ্গে আহার করিত, এবং এক সঙ্গে ভ্রমণ করিত। কিছু কাল পরে ইয়ারিকোর শাবকেরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন তাহারা ঐ উপকারক কুক্কুরের বাস-স্থানে দিবারাত্রি পড়িয়া থাকিত। ইয়ারিকো ও আমার কুক্কুরের মধ্যে যে দৃঢ় সদ্ভাব, প্রীতি ও ভালবাসা হইয়াছিল তাহা তাহাদিগের ভাবব্যঞ্জক তরল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইত।" এই বৃত্তান্তটী পাঠ করিয়া পশুদিগের মধ্যে যে স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব ও প্রণয় নাই একথা বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। হেনকক্ নামক কোন এক প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলেন যে, হঙ্গারফার্ডে নগরে একদা কোন ভদ্রলোক নিজ ভদ্রাসনের প্রাঙ্গণের মধ্যে শকট পরিচালনা করিতেছিলেন। অসাবধানতা নিবন্ধন তাঁহার পালিত কুক্কুরটির পদের উপরিভাগ দিয়া শকটের চক্রনেমি চলিয়া যায়। তখন তিনি কুক্কুরকে এক স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। কুক্কুরটি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। তাহার এই যন্ত্রণা দেখিয়া একটি কাক তাহার নিকটে আসিয়া করুণকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল। এই কাকটি প্রত্যহ ঐ কুক্কুরকে ভক্ষণার্থে মাংসপিণ্ড ও অস্থিখণ্ড আনিয়া দিত। এদিকে ক্রমশঃ কুক্কুরটির মৃত্যুকাল আসন্ন হইতে লাগিল। তখন ঐ কাক আহারান্বেষণ ব্যতীত কিয়ৎক্ষণের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইত না। একদা সন্ধ্যার পর কাকের আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, ইত্যবসরে কুক্কুররক্ষক গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। কাক ইহার অব্যবহিত পরে আসিয়া দেখিল গৃহ-দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তখন সে দ্বারের নিম্নভূমি ঠোঁট দিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ঠোকরাইতে লাগিল এবং একটি বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময়ে রক্ষক আসিয়া উপস্থিত। সে এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে নিম্নশ্রেণী পশুদিগের দয়া, মমত্ব, করুণা, প্রভৃতি মানব মনের শ্রেষ্ঠ গুণ সকল নিশ্চয়ই আছে।

দুর্ভিক্ষ ও দুর্গোৎসব।

সকলেই জানে ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসবিনী। প্রকৃতির যা কিছু সম্পদ এই স্থানেই তাহা বিশেষরূপ বিতরিত হইয়াছে। মৃত্তিকা কোমল, হল-কর্ষণের কষ্ট নাই, অশিক্ষিত

কৃষকেরা বীজ-মুষ্টি নিক্ষেপ করে এবং যথাকালে রাশি রাশি শস্য পায়। তাহাদের পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অল্প। পরিমিত ক্ষেত্রের পূর্ণ শস্য একটী গৃহস্থ সংসারের পূর্ণ সম্পদ। তবে কেন এই স্থানে ব্যাপক কাল দুর্ভিক্ষ থাকে। যাহারা ভারতলক্ষ্মীর সুকোমল ক্রোড়ে সুখে প্রতিপালিত তাদের আজ কেন অন্নাভাব উপস্থিত।

ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমত আমাদের রাজার উপর দৃষ্টি পড়ে। এখনকার রাজা বিদেশীয়। ইহাঁরা বাণিজ্যসূত্রে এই দেশ অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে শাসন ও বাণিজ্য এই দুইটিই ইহাঁদের কার্য্য। এই ভারতবর্ষ এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজার হস্তগত হইয়াছে বটে কিন্তু কোন রাজাই শাসনের সঙ্গে বাণিজ্য লইয়া আইসেন নাই। সেই সমস্ত রাজার অধিকারকালে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত, দেশের শস্য দেশেই থাকিত, কিন্তু এখন এই বণিক রাজাদিগের সময়ে অর্থ ও শস্য ভারে ভারে বিদেশে যাইতেছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই বাণিজ্য-প্রভাবে এতদ্দেশীয় শস্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইয়াছে তন্নিবন্ধন অনেকে কিছু স্বচ্ছল, কিন্তু এই স্বচ্ছলতা শ্রেণী-বিশেষের, সকলের নহে। যেখানে অন্ন সাধারণের অনায়াসলভ্য হইল না, সেখানে দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের রাজত্ব। ফলত এই বৈদেশিক বাণিজ্যই এতদ্দেশে সেই ভীষণ রাজত্ব গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে এইরূপ নিয়ম ছিল, যে, রাজা দেশ জয় করিতেন, এবং বর্ষে বর্ষে বা এক কালীন কিঞ্চিৎ করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া তদ্দেশীয়ের হস্তেই শাসনভার সমর্পণ করিতেন। এইটী এখানকার চিরন্তন সভ্যতম রীতি। কিন্তু এখন ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আমরা দেখিতেছি শাসন এই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের একটী ব্যবসায়। ইহাঁরা দিন দিন দলে দলে দুর দেশ হইতে আসিতেছেন। ইহাঁদের লক্ষ্য এই যে রাজকার্য্যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া কবে স্বদেশে প্রতিগমন পূর্ব্বক সেই অর্থ নিরুদ্বেগে ভোগ করিবন! এই জন্য যাঁহারা এতদ্দেশীয় উপাদানে নির্ম্মিত, যাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের প্রকৃতি পত্রে পত্রে পাঠ করিয়াছেন, দেশীয়েরা যাঁহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার একান্ত পক্ষপাতী, দেশীয়েরা যাঁহাদিগকে উচ্চ-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে এখনও দেবভক্তিতে পূজা দিতে প্রস্তুত আছেন, সেই সমস্ত সুযোগ্য লোককে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা স্বয়ং শাসনভার লইতেছেন। বলিতে কি, এইটি যার পর নাই স্বার্থগন্ধী দূষিত ব্যবহার। ইহার ফল এই এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত লোকের জ্বলন্ত উৎসাহে নিরুদ্যমবারি প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, এতদ্দেশীয় অর্থে বিদেশীয় ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, এবং এতৎদেশ ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

যে দেশের অর্থ ও শস্য গেল তথায় আর রহিল কি? দেশ ত ছারখার হইল। যা কিছু আছে লোকে রাজ-দ্বারে লালায়িত হইয়া যা কিছু সঞ্চয় করিতেছে, রাজা প্রকারান্তরে তাহাও লইতেছেন। এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রধান শস্য তণ্ডুল, ইহা কোটি কোটি লোকের ধন ও জীবন। এই তণ্ডুল নিয়ত অমিত ভারে দেশান্তরে যাইতেছে, এবং ইহা দ্বারা মদ্য প্রস্তুত হইয়া পুনর্ব্বার এই স্থানে আসিতেছে। রাজা ধর্ম্মরক্ষক, কলুষিত ধর্ম্মনীতি তাঁহার উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। খৃষ্ট তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, নিষিদ্ধ পান বিষবৎ পরিত্যাগ কর, কিন্তু এই বণিক রাজা সেই বাক্যে উপেক্ষা করিয়া কেবল স্বার্থের

প্রবর্ত্তনায় ঘৃণিত সৌণ্ডিক-বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগকে ধনে প্রাণে মজাইবার জন্য কলশে কলশে মদ্য আনিতেছেন এবং তল্লব্ধ শুল্কে রাজ-কোষ পূরণ করিতেছেন। এতদ্দেশীয় লোক কাল-মহিমায় যদিও নিঃস্ব কিন্তু উষ্ণপ্রধান-দেশ-মাহাত্ম্যে আমোদপ্রিয়। ইহাঁরা যথাসর্ব্বস্ব বিনিময় করিয়া এই তীব্র মাদক ক্রয় করিতেছেন। এদিকে তাঁহাদের গৃহ-লক্ষ্মী ছিন্নবসনা অন্নাভাবে দীনা ও মলিনা, ক্রোড়ের অবোধ শিশু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কাঁদিতেছে, কিন্তু এই বলদেবের শিষ্যগণ নিতান্ত হতচেতন, স্ত্রী পুত্রের অন্নকষ্টে ভ্রূক্ষেপও করেন না। ফলত এদেশে দুর্ভিক্ষের যা কিছু অবশেষ এই মদ্যই তাহা আনিয়া দিল।

পূর্ব্বে এখানকার এইরূপ রীতি ছিল যে কি ধনী কি গৃহস্থ শস্যের বার্ষিক ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া যা কিছু অবশেষ থাকিত তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু এখন আর তাহা থাকে না। এখন শস্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছে সুতরাং অর্থ-লোভে সকলেই শস্য বিক্রয় করেন। একেত অর্থ কৃচ্ছ্র, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আবার অনেক সময় শস্য পাওয়া যায় না, সুতরাং দেশের সর্ব্বত্রই অন্নকষ্ট উপস্থিত।

এখন বিজ্ঞান-বল পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুলভ-সঞ্চার করিয়া দিতেছে। চক্ষের এক পলকে বহু দিনের পথ পর্য্যটন করা যায়। মনে কর, বিদেশে দুর্ভিক্ষের অনল জ্বলিয়া উঠিল। তজ্জন্য এই ভারতবর্ষ হইতে বাষ্পীয় যানে প্রচুর পরিমাণে শস্য চলিল, কিন্তু বলিতে কুণ্ঠিত হই, যে দেশের বালকেরাও ভিক্ষুককে স্বয়ং মুষ্টিভিক্ষা দিয়া শৈশব কাল হইতেই দয়া শিক্ষা করে, সে দেশের লোক এত অনুদার নয়, এত স্বার্থপর নয়, যে এক স্থানে কোটি কোটি লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিবে, আর ইহারা পরম সুখে মুখে অন্নের গ্রাস তুলিবে। যাক্, তথায় এতদ্দেশের শস্য গিয়া সকলের দুর্ভিক্ষ দূর করুক। ভারতের শস্য এত সুপ্রচুর যে এদেশে পর্য্যাপ্ত হইয়া বিদেশকেও রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু একটা কথা বলি, ভারতবর্ষের তণ্ডুল ইউরোপে গিয়া যে অসংখ্য অসংখ্য শূকরের উদরপূরণ করিতেছে, এবং সেই তণ্ডুলে যে সাক্ষাৎ কালকূটস্বরূপ তীব্র মাদক প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে আমাদের বিশেষ লাভ কি।

যাহাই হউক, এক্ষণে এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এতৎব্যতীতও দুর্ভিক্ষের স্থানীয় কএকটী কারণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশই হ্রাস হইয়া থাকে। ফলত এইটি অকাট্য কথা। কোন এক ক্ষেত্র যদি ক্রমান্বয়ে কএক বৎসর ব্যবহার করা যায় তাহাতে শস্য ক্রমশই অল্প হইবে। কিন্তু যেরূপ সময় উপস্থিত কেহ সাহস করিয়া ক্ষেত্রে বিরাম দিতে পারেন না; ভূমির যে তেজটি নষ্ট হইল তাহার পুনঃসঞ্চয়ে আর কেহই কালবিলম্ব করিতে পারেন না। এদিকে এদেশের সকল স্থলে ভূমিতে সার দিবারও তাদৃশ ব্যবস্থা নাই, সুতরাং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইতেছে। যেমন ভূমির শক্তি হ্রাস হইতেছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং এতদ্দেশে দুর্ভিক্ষ যে ক্রমশঃ স্থায়িতর আকার ধারণ করিবে এখন তাহার সূত্রপাত।

দ্বিতীয় জলাভাব। আমাদের দেশ দেবমাতৃক। রাজা আজিও ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বত্র কূপাদি খনন করিয়া দেন নাই। সুতরাং আমাদিগকে চাতকের ন্যায় প্রায়ই মেঘের প্রতীক্ষা করিতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ জলাভাবের একটী কারণ অনুমান করেন। তাঁহারা কহেন

যে, এক্ষণে ভারতবর্ষের নিবিড় অরণ্য সকল লোকালয় হইতে বহুদূরে, নিকটের অধিকাংশই নির্ম্মূল হইয়াছে। যে সকল ভূমি ঘনীভূত বনে আচ্ছন্ন ও আর্দ্র তাহা হইতে বাষ্পরাশি অনবরত উত্থিত হইয়া মেঘ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বন বহুদূরবর্ত্তী তজ্জন্য আর তাদৃশ মেঘ দেখা যায় না সুতরাং এতদ্দেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি।

তৃতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাব। বিধি-নিষেধ পালন করাই নিষ্ঠা; ইহাই ধর্ম্মের জীবন। কিন্তু এখন দেখা যায় লোকের আর তাদৃশ ধর্ম্মনিষ্ঠা নাই। নিষিদ্ধ গমন ও নিষিদ্ধ পানভোজনে অনেকেই প্রবৃত্ত। এই দুঃস্বভাবে অনেক পরিবার ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, অনেক পরিবার ছারখার হইতেছে। যিনি বিকশিত মল্লিকা পুষ্পের ন্যায় সৌরভে সকলকে পুলকিত করিতেন এই দুঃস্বভাব তাঁহাকে মসৃণ ও ম্লান করিতেছে! তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশ তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে, সুতরাং তিনি অবসন্ন!

এক্ষণে এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। হিন্দুদিগের ব্যবহার-শাস্ত্র পাঠে দেখা যায়, যে রাজদোষে এতদ্দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যেখানে প্রভুত্ব ও শক্তি সেইখানেই স্বার্থ; এই কারণে সর্ব্বাধিপতি রাজা স্বার্থপ্রিয় হইয়া থাকেন। শাসন ও স্বার্থসাধন তাঁহার কার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়। এই ব্যভিচারের কারণ এতদ্দেশীয় সংহিতাকার। তাঁহারা জানিতেন যেখানে প্রভুত্ব ও শক্তি সেই খানেই স্বার্থ; এই জন্য তাঁহারা শাসনের সহিত ধর্ম্মের একটী দৃঢ়তর যোগ স্থাপন করিয়া দেন। কিন্তু মানবপ্রকৃতি স্বার্থপ্রবণ; সে সময়ে সময়ে ধর্ম্মসেতু লঙ্ঘন করে। সংহিতাকারেরা এই জন্য প্রাড়্বিবাককে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন। এই প্রাড়্বিবাক ব্রাহ্মণ ব্যবহার-কালে রাজার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতেন, ইনি রাজার ধর্ম্মদৃষ্টি বর্দ্ধন করিতেন এবং প্রজাবাৎসল্য শিক্ষা দিতেন। ফলত এই ধর্ম্মের শাসন-বলেই হিন্দুরাজা নিঃস্বার্থ ছিলেন। তিনি সহস্র গুণ দিবার নিমিত্ত প্রজার নিকট যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন এবং আত্মসুখ অপেক্ষা প্রজার সুখে অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। এই জন্য এই ভারতবর্ষে রাজদোষে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত না।

কিন্তু আজ এই ভারতের কি দুরবস্থা! সমুন্নত হিমাচল যাহার শিরোদেশ, কাশ্মীর যাহার শ্রবণাবতংস, সিন্ধু যাহার আনন্দাশ্রু-ধারা, গঙ্গা ও নর্ম্মদা যাহার হৃদয়-ধমনী, গলকণ্ঠ-হীরকখনি যাহার মেখলা—স্বর্ণময়ী লঙ্কা যাহার পাদ-শিঞ্জিনী—এবং পদ্মপবিমলই যাহার বদন-সুরভি, সেই ভারতলক্ষ্মীর ক্রোড়ে আজ সকলে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। এক পদ বহির্গত হও দেখিবে, চতুর্দ্দিকে কেবলই শোকতাপের দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্ষুধাতৃষ্ণার আর্ত্তস্বর। কোন স্থানে কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া আছে, কেহ স্তব্ধ শূন্যগৃহে মৃতপ্রায়, কেহ পাণ্ডুবর্ণ অস্থিসার দেহ লইয়া শয়ান; সে ক্ষীণ ও অবশ হস্তে ভক্ষ্যলোলুপ শৃগাল কুক্কুরকে একএক বার তাড়াইতেছে। মনুষ্য মনুষ্যের মাংসে ক্ষুধার জ্বালা শান্তি করিতেছে। স্থানে স্থানে মৃত মনুষ্যের কঙ্কাল-রাশি যেন এই কাল-সঙ্কটের স্মৃতিস্তম্ভ। বৃক্ষলতা পত্র শূন্য এবং প্রান্তর মরুভূমির ন্যায় ধূধূ করিতেছে। ভারতের চতুর্দ্দিকে কেবলই এই শোচনীয় দৃশ্য। এখন দুর্ভিক্ষ ক্রমশই ব্যাপক হইতেছে। এই জ্বলন্ত চিতানলের উষ্মা সকল দেশ স্পর্শ করিতেছে। প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড ত্রাসকম্পিত

দীপ-শিখার ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে। ভবিষ্যৎ ঘনান্ধকার, দুর্ভিক্ষ দুর্নিবার, ইহা বর্ষে বর্ষে ঘটিতেছে, ইহা বর্ষে বর্ষেই ঘটিবে।

"কালরজনী আঁধারিল এ ভারত; এ ঘোর বিপদে দেখ চেয়ে করুণানিধান।

দিবারাত জলে ঘোর শোকানল, রাশি রাশি চিতা সঙ্গে, দেখ চেয়ে করুণানিধান।"

সম্মুখে দুর্গোৎসব। এ সময় হিন্দুজাতির মন পূর্ণকল শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছ ও সবল। চিত্তের সুকোমল বৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়াছে। কেহ অতি স্নেহে সকলের প্রতি বৎসল, কাহারও কৃপাদৃষ্টি পরদুঃখে তরল। সকলের ভক্তিবৃত্তি উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, কার্য্য ঔদার্য্যব্যঞ্জক, স্ব-পর-চিন্তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। হরিশ্চন্দ্র ও রঘুর পবিত্র রক্ত যে জাতির শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত, এখন সেই জাতি অনাথ দীন দরিদ্রে মুক্তহস্ত হইবে, এবং নির্ব্বিশেষে দয়া ও দাক্ষিণ্য বিতরণ করিবে। দুর্ভাগ্যের ক্রীড়নক অসহায় দরিদ্র সকল দ্বারে দ্বারে সাদরে প্রবেশ পাইবে। এখন মঙ্গল-তূর্য্যে ভারতের দুঃখ-রজনী সুপ্রভাত হইল, এই পবিত্র ক্ষেত্রে এখন ধর্ম্মোৎসব। এই প্রশংসনীয় ব্যাপার সম্পদের বিলাস নহে ইহা হৃদয় ও সাধু ইচ্ছার বিকাশ। আমরা সর্ব্বাংশেই এই সৎভাব টুকুর অনুমোদন করি। কিন্তু মনুষ্যের স্বাভাবিক অন্ধ ভাব সকল-কার্য্যে শ্রী সৌন্দর্য্য রাখিতে পারে না। সুতরাং সময়ে সময়ে স্পৃহনীয় পবিত্রতাও অপকলঙ্কে মলিন হয়। যে মহোৎসব হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত একটী জাতিকে মাতাইয়া তুলে,* যে মহোৎসব দিবসত্রয় মাত্র স্থায়ী হইলেও সংবৎসরকাল একটি জাতির ধর্ম্ম ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে, তাহা স্থানবিশেষে কুৎসিত ও কদর্য্য আকার ধারণ করিতেছে। দেখিতেছি যেখানে কেবল মাত্র ধর্ম্মের নির্জ্জীব মূর্ত্তি বিরাজমান, সমাজশাসন নামমাত্র সেই সমস্ত স্থানে ধর্ম্মোৎসব ব্যপদেশে কেবলই অবৈধ অনুষ্ঠান হয়। কে কোথায় জানে যে দুর্গোৎসবে মদ্যের সদাব্রত দিতে হইবে, কে কোথায় জানে যে দৈব কার্য্য অশ্লীল নৃত্যগীত ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হয় না, কে কোথায় জানে যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই ধর্ম্মোৎসবের লক্ষ্য। বর্ষে বর্ষে সকলকে চমকিত করিয়া বহ্বাড়ম্বরে এই সমস্ত অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এই জন্য এই শারদীয় ধর্ম্মোৎসবে দুঃখিত, এই জন্য প্রাণ ভরিয়া ইহার প্রশংসা করিতে পারি না। এখন ঘরে ঘরে ক্ষুধা তৃষ্ণার আর্ত্তনাদ, যদি এক দিনের জন্যও এই অর্থ লোকের জঠর-জ্বালা শান্তি করে, তবে তাহার ফল অনন্ত, তাহার ফল স্বর্গ, তাহার ফল মোক্ষ।

* ভারতবর্ষের নানা স্থানে দুর্গোৎসব ও যেখানে মূর্ত্তি পূজা না হয় সেখানে নবরাত্রি বলিয়া একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন।

৪২১ সংখ্যক পত্রিকায় ৮৭ পৃষ্ঠার পর।

আরবেরা কঠোর দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলনেই বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এজন্য যে কাব্য প্রভৃতি সাধারণ সাহিত্যের অন্তর্ভূত সরস ও সুকোমল বিষয়ের আলোচনা করিতেন না তাহা নহে। স্পেন দেশীয় আরবদিগের মধ্যে সকলে কবিতা রচনা করিতে পারিত; এমন কি, করডোবা ও গ্রানাডার শাসনকর্ত্তা হইতে সামান্য কৃষকের পর্য্যন্ত ঐ শক্তি ছিল। তৎকালে বীররসাত্মক কবিতা ও নাটক লিখিবার প্রথা ছিল না তজ্জন্য তাঁহাদিগের কবিতা গভীর ও মহদ্ভাবপূর্ণ হইত না বটে কিন্তু তাহা অতিশয় সুকুমার, মনোরম, করুণ ও শ্রুতিমধুর হইত। আরবেরা গ্রীক কবিদিগের গ্রন্থ অধিক পাঠ

করেন নাই বলিয়া, কাব্য শাস্ত্রে সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। কেরো ও ডামাস্কাস নগরের প্রস্তরময় অট্টালিকা যে সকল গীত দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন প্রতিধ্বনিত হইত তাহা এই কালের বহু পূর্ব্বে ভীষণ আরব মরুভূমিতে যে সমস্ত গীত গীত হইত তদপেক্ষা অধিক উন্নত ও পরিমার্জ্জিত ছিল না। আরবদিগের বিরচিত অসংখ্য আখ্যায়িকা ও উপন্যাস কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আরব্য উপন্যাস নামক বিখ্যাত পুস্তক তাহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ। এই আরব্য উপন্যাস যদিচ অত্যুক্তি দোষে দূষিত কিন্তু সুরসিকতা ও সুকল্পনায় লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আরব পুরাবৃত্ত লেখকেরা যেরূপ সংখ্যায় অধিক সেরূপ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন না। কেবল স্পেন দেশে যে সকল পুরাবৃত্ত-লেখক জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদিগের সংখ্যা ত্রয়োদশ শত। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থে বিচার শক্তি ও কার্য্যকারণ অনুসন্ধানের অভাব, গুণশালী ব্যক্তিদিগের অপরিমিত চাটুবাদিতা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত অনুদারতা ভূরি পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ফলতঃ তাঁহারা রাজগণের সামান্য স্তুতিবাদক মাত্র ছিলেন, এই সকল কারণে আধুনিক পাঠকেরা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠে কোন আমোদ প্রাপ্ত হন না।

যে সকল ব্যবহারিক শিল্প দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতা সাধিত হয়, বিজ্ঞান-চর্চার উদ্যম সেই সকল শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধনের হেতু হইয়া উঠে। ভূমির উর্ব্বরতা ও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য স্পেন দেশে জলসেচন কার্য্য অতি পরিপাটী ও সুপ্রণালী ক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে স্পেনের যে সকল স্থান আদিম মরুভূমিতে পরিণত দৃষ্ট হয় তৎসমুদায় তদ্দেশবাসী বহুসংখ্যক লোকের উপজীবিকার উপায় হইয়াছিল। খর্জ্জুর, কার্পাস, ও ইক্ষু প্রভৃতি অতি উপকারী বৃক্ষ সকল আরবেরা স্পেনে প্রথম রোপণ করেন, এবং আফ্রিকা মহাদেশে ও স্পেনস্থ এণ্ডালুসিয়া প্রদেশে অত্যুৎকৃষ্ট আরব্য ঘোটক তাহারদিগেরই দ্বারা আনীত হইয়া ক্রমে তত্তৎদেশে স্বভাবজাত পশু-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উঠে। কাসিরি নামক এক আরব পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টিয়ানেরা যখন বারুদের ব্যবহার জানিয়াছে তাহার দুই শতাব্দী পূর্ব্বে আরবেরা তাহার ব্যবহার জানিত; তুলা ও শণের প্রস্তুত কাগজ খ্রীষ্টিয় শকের ১০০৯ এবং ১১০৬ অব্দে তাঁহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। টোলিডো, ফেজি ও দামাস্কসের তরবারি, গ্রানাডার কার্পাস ও কৌশেয় বস্ত্র, এবং কর্ডোবা ও মরোক্কোর শোভন চর্ম্ম মাধ্যমিক কালে অদ্বিতীয় রূপে পরিগণিত হইত। খনি-খনন কার্য্যে স্পেন দেশীয় আরবেরা অতিশয় পটুতা লাভ করেন। এক্ষণে কেবল জেয়েন নামক ক্ষুদ্র প্রদেশে পঞ্চ সহস্র খনির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্পেন দেশীয় কালিফদিগের রাজকোষ এই খনিজ স্বর্ণও রৌপ্যে কিরূপ স্ফীত হইয়াছিল তাহা ইহাতেই বিলক্ষণ অনুমিত হইতে পারে।

প্রত্যেক নৈসর্গিক সুবিধার শ্রমসাধ্য উন্নতি সাধনে এরূপ ধন-সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল যে যদি তৎকালিক পুরাবৃত্ত লেখকেরা তাহার সাক্ষ্য প্রদান না করিয়া যাইতেন তবে তাহা আমাদিগের কল্পিত বলিয়া বোধ হইত। বোগদাদের কালিফ মহাধর্ম এলমানসর তাঁহার সকল যুদ্ধকার্য্য এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণ পরিসমাপ্ত করিয়া পরিশেষে মৃত্যুকালে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা রাখিয়া যান। কিন্তু কএক বৎসরের পর এই প্রভূত ঐশ্বর্য্য তাঁহার সন্তানদিগের পুণ্য অথবা পাপে সমগ্র নিঃশেষিত হয়। তাঁহার পুত্র মেহদী একবার

তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ষাট লক্ষ মোহর ব্যয় করেন। বোগদাদ হইতে মক্কা প্রায় সাঁড়ে তিন শত ক্রোশ ব্যবধান; এই সুদূর পথের স্থানে স্থানে তিনি পান্থনিবাস ও জলপ্রস্রবণ প্রস্তুত করিয়া দেন। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিই এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক সুতরাং ইহা নিন্দনীয় নহে। কিন্তু একবার তুষারবাহী অসংখ্য উষ্ট্র কেবল গ্রীষ্ম-প্রধান আরব দেশের লোককে বিস্মিত করিতে এবং রাজভোগ্য ভোজের ফল মূল ও মদ্য সুশীতল করিতে প্রচুর ব্যয়ে লইয়া যাওয়া হয়। আলমামুন মেহদীর পৌত্র। তিনি একদা অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে একটি প্রদেশের লক্ষ করের পঞ্চমাংশের চতুর্থাংশ চব্বিশ লক্ষ মোহর বিতরণ করিয়াছিলেন। এরূপ বদান্যতা কেবল তাঁহার চাটুকারগণ দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ঐ রাজার বিবাহকালে কন্যার মস্তকে এক সহস্র স্থূল স্থূল মুক্তাফল বর্ষিত হইয়াছিল, এবং অসংখ্য ভূমিখণ্ড ও বাটী সরতি দ্বারা প্রদত্ত হইয়া ভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অব্যবস্থিততা ও অস্থৈর্য্য মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল।

আমরা কেবল স্পেন রাজ্যের অবস্থা অবগত হইলে, ইহা যে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল সেই সাধারণ আরব সাম্রাজ্যের অবস্থারও কিঞ্চিৎ জানিতে পারিব। দ্বিতীয় হাকেমের রাজত্ব কালে স্পেনের কর্ডোবা নগরে দুই লক্ষ বাটী, ছয় শত মসজিদ এবং নয়শত স্নানাগার ছিল। এই সমস্ত মসজিদের মধ্যে যেটী সর্ব্ব-প্রধান তাহার এক সহস্র স্তম্ভ বহুমূল্য প্রস্তরে প্রস্তুত ছিল; এবং উহার ছাদও কারুকার্য্যে আশ্চর্য্যরূপ চিত্রিত ও সুগন্ধি কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে প্রার্থনার সময় উহাতে দুই সহস্র বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইত। ঘাট, জলপ্রণালী, প্রস্রবণ, চিকিৎসালয় যাহা কিছু স্পেন রাজ্যের তৎকালীন রাজধানীর সৌন্দর্য্য ও তৎনগরবাসীর সুখ-সচ্ছন্দতা সম্পাদন করিত তাহা ওমিয়াবংশীয় কালিফদিগের অর্থে প্রস্তুত হইত। কর্ডোবা নগর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে এক সুরম্য উদ্যানের মধ্যে জাহারা নামক একটী রাজবাটী ছিল। ঐই রাজবাটীতে বহুমূল্য প্রস্তরের অসংখ্য খিলান ছিল, এবং ইহার মধ্যস্থিত সভাভবন স্বর্ণ ও মণি মুক্তায় খচিত ছিল। এই বাটীর মধ্যে মহোজ্জ্বল পারদের প্রস্রবণ দৃষ্ট হইত। ফলতঃ এই রাজবাটী আরব ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ছিল। কিন্তু হায়! তাহা এক্ষণে ক্ষণকালস্থায়ী কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হইয়াছে। স্পেনের পশ্চিমস্থ কালিফের শাসনে আশিটী বৃহৎ নগর এবং তিন শত উপনগর ছিল। গোয়ালকুইবার নদীতীর দ্বাদশ সহস্র গ্রাম ও উপগ্রামে পরিপূর্ণ ছিল; এই কালিফের বার্ষিক আয় প্রায় ছয়কোটি টাকা এবং তাঁহার শরীররক্ষার্থে দ্বাদশ সহস্র সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত ছিল।

ক্রমশঃ

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪২১ সংখ্যক পত্রিকার ৯২ পৃষ্ঠার পর।

(১১০)

(রিপুদমন ও ধর্ম্মসাধন বিষয়ক)

ইহা একটী মহৎ সংগ্রাম, ইহা একটী দেবোচিত কার্য্য, ইহা স্বাধীনতা এবং একটী রাজ্য লাভ জন্য চেষ্টা। এক্ষণে ঈশ্বরকে কেষ্টর এবং পোলক্স * নামক দেবতাদ্বয়ের সাহায্য যেমন প্রার্থনা করে তেমনি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর।

ইপিক্টিটস

* গ্রীক অশ্বিনীকুমার।

(১১১)

হে পরমাত্মন্! যাহা তোমার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই দিকে আমাকে লইয়া যাও, আমি প্রফুল্লচিত্তে তোমার অনুগমন করিব। অত্যন্ত অনিচ্ছু হইলেও যখন সেই দিকে যাইতেই হইবে তখন আহ্লাদিত চিত্তে কেন না যাইব?

ঐ

(১১২)

সকল বস্তু ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, এবং ঈশ্বরের সাহায্য ও প্রভাবশূন্য হইয়া যদ্যপি একাকী থাকে তাহা হইলে কোন বস্তু স্বকীয় প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারে না।

ডিমণ্ডো নামক গ্রন্থ প্রণেতা

(১১৩)

যেমন রাজনিয়ম নিজে নিশ্চল হইয়া পৌরজনদিগকে পরিচালন পূর্ব্বক সকল বিষয় নিয়মিত করে সেই রূপ ঈশ্বর নিজে নিশ্চল হইয়া সকল বস্তু পরিচালিত করেন।

ঐ

(১১৪)

ঈশ্বর ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করেন অর্থাৎ পরিমাণ-অনুসারে সকল কার্য্য করেন।

প্লুটার্ক

(১১৫)

সঙ্গীতের নিয়মানুসারে সকল বস্তু ঈশ্বর দ্বারা কৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য সকলে সম্পূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য দেখা যায়।

ঐ

(১১৬)

ঈশ্বর সৌন্দর্য্য-সমুদ্র।

প্লেটো ও প্লুটার্ক

(১১৭)

যেমন বিজ্ঞ নাবিক জাহাজকে পরিচালনা করে, তেমনি সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বর সমস্ত দ্যুলোক ও মর্ত্ত্যলোক পরিচালনা করিতেছেন।

ডায়োমক্যানইসিসট।

(১১৮)

ঈশ্বর সমস্ত কালের প্রভু, তিনি সারাৎসার।

ঐ।

(১১৯)

সর্ব্বনিয়ন্তার বিষয়ে কি বর্ব্বর কি সুসভ্য গ্রীক, সকলের মনে স্বাভাবিক ভাব সংস্থিত আছে, তাহা কোন মানবীয় শিক্ষকের নিকট হইতে তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই।

ঐ।

(১২০)

প্রকৃত ধর্ম্ম বলিদান অথবা গন্ধদ্রব্য প্রদানের উপরে নির্ভর করে না, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণা নিজে স্বীকার করা, এবং তৎপরে তাহা অন্যের নিকট ঘোষণা করার প্রতি নির্ভর করে। ঈশ্বর ঈর্ষাপরবশ না হইয়া যে বস্তুকে যত উৎকৃষ্ট করিতে পারেন, সেইরূপ উৎকৃষ্ট করিয়া যখন জগৎকে সুশোভিত করিয়াছেন, তখন তিনি কূটস্থ রূপে মঙ্গল স্বরূপ ইহা প্রমাণিত হইতেছে, অতএব তিনি মঙ্গলময় বলিয়া আমাদিগের দ্বারা কীর্ত্তিত হউন। এবং সকল বস্তু কি প্রকারে শোভন হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা যখন তাঁহার আছে, তখন তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং সঙ্কল্পিত বিষয় সকলকে সাধন করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে

গেলেন।

ক্রমশঃ

Registerd No 52.

নবম কল্প

চতুর্থ ভাগ

কার্ত্তিক ১৮০০ শক।

৪২৩ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা
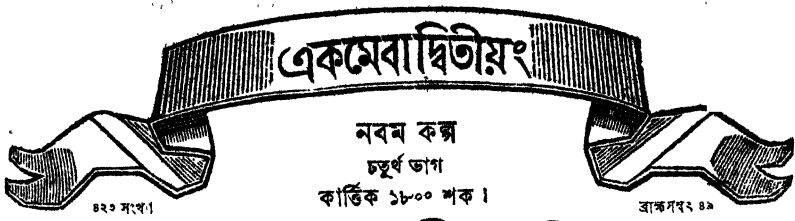
ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা।

ঈশ্বর আমাদিগের স্রষ্টা, তিনি আমাদিগের পিতা, অতএব মনুষ্য স্বভাবতঃ তাঁহাকে প্রীতি করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? যাঁহা হইতে উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে, যিনি আমাদিগের পিতা, তাঁহাতে প্রীতি না থাকা, ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যিনি আমাদিগের মনে প্রীতিবৃত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাঁহাকে প্রীতি করিব না তবে কাহাকে করিব? নদী যেমন সিন্ধুর অভিমুখে স্বভাবতঃ ধাবিত হয়, পুষ্প যেমন স্বভাবতঃ গন্ধ প্রদান করে তেমনি মোহান্ধকার তিরোহিত হইলে মন স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে চায়। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে যে কেবল মনের স্বাভাবিক বৃত্তি চরিতার্থ হয় এমন নহে, সেই প্রীতির উপকারিত্ব অসীম। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন না করিলে এই ভয়াবহ সংসারে আমাদিগের আর নিস্তার নাই। ঈশ্বর-প্রীতি সাংসারিক সকল ভয় ও উদ্বেগ হইতে মনকে মুক্ত করিয়া শাশ্বত সুখ প্রদান করে। সেই প্রীতি যদি যথার্থতঃ মনে উদিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ স্বর্গ, তৎক্ষণাৎ মুক্তি, কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম আমাদিগের মনে উদিত হয় কৈ? ধনের প্রতি, আহারের প্রতি আমাদিগের যেরূপ প্রীতি সেরূপ প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি উদিত হয় কৈ? অনেকে এই প্রীতির দাবিদার আছে কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী কয় জন? প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম যদি মনে উদিত হয় তবে তখনি ত সকল জ্বালা নিবৃত্তি হয়, তখনি ত সকল সুখ সম্পদ প্রাপ্ত হই, তখনি ত সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হই। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম মনে কখন উদিত হয় না। কোন কোন ব্যক্তির মনে একেবারেই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম উদিত হয়, তাঁহাদিগের আর এ বিষয়ে আয়াস পাইতে হয় না। কেন যে ঈশ্বর সেই সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির প্রতি একেবারেই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার কার্য্য কে বুঝিবে? ঈশ্বরের কার্য্য ঈশ্বরই বুঝেন। কিন্তু যাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বর এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে কবে অনুগ্রহ করিবেন এই প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহারা তাঁহার দ্বারে

মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে স্বাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু তাঁহাদিগের আত্মার উপর কখন পতিত হইয়া প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি রূপ অমূল্য মুক্তাফল উৎপাদন করিবে, এই আশাতে চাতকের ন্যায় আশান্বিত থাকেন। তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিলে তিনি এক সময়ে না এক সময়ে অবশ্যই অনুগ্রহ করিবেন ইহা নিশ্চয় কথা। কিন্তু এই অধ্যবসায় কয় জন লোকের আছে? হে মন! যাঁহার বন্ধুর নিকটে যাইবার ইচ্ছা আছে তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি অধ্যবসায়ারূঢ় হন। যে ব্যক্তি অধ্যবসায়ারূঢ় হয় সে অবশ্য তাহার ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন।

ধর্ম্ম হইতে মানবাত্মা বিযুক্ত হইয়া কতই পাপাচরণ না করিতেছে ও তন্নিবন্ধন কতই দুঃখক্লেশ না ভোগ করিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখ মনুষ্যের পাপ-জনিত। পৃথিবীতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত কোন না কোন পক্ষের অন্যায়াচরণ হইতে সেই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কোন জাতি নিরুপদ্রবে আপনাদিগের ধনধান্য ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়া আর এক জাতির লোভের উদয় হইল। সেই লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য সেই জাতি প্রথমোক্ত জাতির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। মনুষ্য অন্য মনুষ্যের শরীর অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের চক্ষে আর কষ্টকর দৃষ্টি নাই। সকল মনুষ্য এক পিতার সন্তান ও পরস্পর ভ্রাতা স্বরূপ। কোথায় তাহারা সদ্ভাবে কাল যাপন করিবে, তাহা না করিয়া পরস্পরের প্রতি অত্যাচার ও পরস্পরকে হত্যা করিতেছে। কোন অসভ্য জাতি আপনাদিগের স্বভাবতঃ উর্ব্বর দেশ অল্পায়াসে কর্ষণ পূর্ব্বক তজ্জাত শস্য লাভ করিয়া, তাহা উপভোগ করিতেছে এবং নিরুদ্বেগে আপনাদিগের কুটীরের সম্মুখস্থ তরুচ্ছায়াতে উপবিষ্ট থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত আমোদে কাল যাপন করিতেছে, এমন সময়ে কোন সভ্যাভিমানী জাতি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের দেশ অধিকার করিয়া লইল, তাহা অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ করিল, এবং যে পর্য্যন্ত না সেই অসভ্য জাতি একেবারে ধ্বংশ হইল সে পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিল না। পৃথিবীতে একজন আর একজনের সম্পত্তি অন্যায় পূর্ব্বক অপহরণ করিতেছে, একজন আর এক জনের প্রতি অত্যাচার ও তাহাকে পীড়ন করিতেছে এই প্রকার সংবাদ সর্ব্বদাই শ্রুতিগোচর হইয়া মনকে নিরতিশয় ব্যথা প্রদান করে। কত মনুষ্য লম্পটতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পশুবৎ ব্যবহার করিয়া আপনার পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিতেছে। কত লোক স্পষ্ট অত্যাচার অপেক্ষা সহস্র গুণ দোষাবহ সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা করিয়া অন্যের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে। কত স্থানে নির্গুণ পাষণ্ড ধনী গুণবান ধার্ম্মিক নির্ধনের প্রতি গর্ব্বিতাচরণ করিয়া তাঁহাকে যার পর নাই মনস্তাপ প্রদান করিতেছে। পৃথিবীতে নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও উপদ্রবের আর সীমা নাই। এই সমস্তের কারণ কি? ইহার কারণ মানবাত্মা ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যে পর্য্যন্ত না উহা ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য পবিত্র পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইবে সে পর্য্যন্ত এই সকল বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতে থাকিবে। যদ্দ্বারা এই শুভ ঘটনা সম্পাদিত হইবে তাহা মনুষ্যেরা যেরূপ যথার্থ মঙ্গল-সাধক, তাহা ঈশ্বরের যেরূপ মনঃপূত ও প্রিয় এমন অন্য কোন পদার্থ নহে। অনেকে এই কথা বলেন যে

সভ্যতাই মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি ও সুখসাধনের একমাত্র উপায়। কিন্তু এক্ষণে যে সভ্যতা পৃথিবীর সভ্যতম দেশ সকলে প্রবল তাহা তত ধর্ম্মোন্নতিসাধক নহে, যত বিলাস-সাধক। লৌহবত্ম, তাড়িতবার্ত্তাবহ, দূরশ্রবণী* প্রভৃতি সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা-সাধক যন্ত্র যত আবিষ্কৃত হইতেছে, তত যদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক মনুষ্য হত্যা করা যাইতে পারে, এমত সকল যন্ত্রও সৃষ্ট হইতেছে। এদিকে যেমন সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি ওদিকে লম্পটতাচরণ, প্রবঞ্চনা ও দরিদ্রতাও বৃদ্ধি হইতেছে। লণ্ডন মহানগরে লর্ডদিগের ইন্দ্র ভবন-তুল্য প্রাসাদে ইন্দ্রিয়-সুখ ও বিলাসের সীমা নাই। তাহার বহির্ভাগে রাজপথে গৃহহীন রথ্যাবাসী বালক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। এখনও পৃথিবীর কোন দেশে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয় নাই। ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। যে সভ্যতাতে শারীরিক ও সাংসারিক সুখ-সাধক উপকরণ সকলই থাকে কিন্তু তাহার উপভোগ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। সূত্রধর ও বস্ত্রসীবকেরা সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। এমন আশা করা যায় যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের অনুশাসনে পৃথিবীতে সেই প্রকৃত সভ্যতা ক্রমে অভ্যুদিত হইবেক। বর্ত্তমান বিলাস ও স্বার্থপরতার সভ্যতারূপ পঙ্ক হইতে ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতারূপ পদ্মের প্রকাশ হইবে তাহার চিহ্ন এখনই কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। এমন এক সময় ছিল যখন নরমাংস ভক্ষণ ও নরবলিপ্রদান-প্রথা সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ক্রীত দাস রাখিবার প্রথাও এক সময়ে ঐরূপ ছিল। ক্রীত দাস রাখিবার প্রথাও এক্ষণে সভ্যতর দেশ সকল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মগ্রন্থ এক বাক্য হইয়া বলেন যে এমন এক সময় অবশ্য আগমন করিবে যখন পৃথিবীতে ধর্ম্মের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইবে এবং তাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয় হইবে। কবিরাও সেই অবস্থা প্রতীক্ষা করেন এবং শোভন উজ্জ্বল পদাবলীতে তাহার বর্ণনা করেন। কবে এই ধর্ম্মরাজ্য পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইবে, কবে অত্যাচার পরপীড়ন রহিত হইবে, কবে মনুষ্যগণ সৌভ্রাত্র-সূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের উপকার সাধনে সতত যত্নশীল থাকিবে? হে জগদীশ্বর! সেই দিন শীঘ্র আনয়ন কর।

"শান্তিসুধা সর্ব্বভুবন বিস্তার,
ইচ্ছা তোমারই হউক সফল হে,
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত
পুণ্য-সলিল বরিষ বরিষ অমৃত।"

* Telephone.

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

ঋগ্বেদ সম্যক সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বৈদিক সময়ে বিজ্ঞানশাস্ত্রে ধর্ম্মতত্ত্বে এবং সাংসারিক জীবন-প্রণালী বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। যথা "ক্ষেত্রমিব বিমমু" ১।১১০।৫ ঋক। "মান-দণ্ডের দ্বারা যেরূপ ভূমির পরিমাণ করা যায়, সেইরূপ পরিমাণ করিয়াছিল।" সূত্রধর এবং শকট-নির্ম্মাণকারীদিগের অত্যন্ত আদর ছিল। পথ প্রস্তুত করিবার প্রথা এবং পথি মধ্যে পান্থ-নিবাসরূপ বিশ্রাম স্থানের অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তত্তৎ স্থানে পথিকদিগের নিমিত্ত খাদ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইত। অনেকস্থলে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর নাম ও তন্নির্ম্মিত সামগ্রী সকল উল্লি-

খিত আছে। বধ্রিমতী নামে কোন রাজর্ষির পুত্রিকা ক্লীব-ভর্ত্তৃকা হইয়া পুত্রলাভার্থ অশ্বিনদেবকে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে হিরণ্যহস্তাখ্য পুত্র দান করিয়াছিলেন।১।১১৬ ১৩। আর ১।৩৩।৮ ঋক "হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানা" অর্থাৎ স্বর্ণযুক্ত কণ্ঠবাহু প্রভৃতির মণ্যাদি আভরণ দ্বারা শোভমানা।

ঋগ্বেদের সময়ে বৈদ্যশাস্ত্রও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। জল, বায়ু এবং উদ্ভিজ্জের নানাবিধ স্বাস্থ্যকর উৎকৃষ্ট গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সোম ওষধিদিগের পতি এবং পীড়ার শান্তিদায়ক (১।২২ ; ১।৯১) অশ্বিনেরা দেববৈদ্য। ইহাদিগকে বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে এবং বধিরত্ব অন্ধত্বাদি উৎকট রোগ আরোগ্য করিতে দেখা যায়। তাঁহারা অন্ধ কণ্বকে চক্ষুদান ও বধির নৃষদপুত্রকে শ্রবণ-শক্তি দান করিয়াছিলেন। রুদ্রদেবও স্বাস্থ্যদাতা এবং বিবিধ পীড়োপশমকারক ওষধি-দাতা। প্রাচীন আর্য্যসমাজে চিকিৎসাশাস্ত্র যে উৎকর্ষ ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ উত্তম রূপে রোগ নির্ণয় এবং রোগের সূক্ষ্ম লক্ষণ সমস্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। পথ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অত্রি-প্রণীত আত্রেয়ী সংহিতা প্রথম। হারীত স্বগুরু অত্রিকে রোগের উৎপত্তি এবং চিকিৎসার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে অত্রি প্রায় ১৫০০ শ্লোকে উত্তর দিয়াছিলেন। ইহা আত্রেয়ী সংহিতা। এই সংহিতা অরিষ্টক, চিকিৎসা প্রভৃতি ষড়ভাগে বিভক্ত এবং নানারূপ ব্যাধির নির্ণয় ও প্রতিবিধান বিস্পষ্ট ভাষাতে বিন্যাস করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, চরক সংহিতা। ইহা অষ্টবিভাগে এবং ১২০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ত্রিংশ অধ্যায় শ্লোকস্থান, অষ্টাধ্যায় নিদানস্থান, অষ্টাধ্যায় বিমানস্থান, অষ্টাধ্যায় শারীরস্থান, দ্বাদশাধ্যায় ইন্দ্রিয়স্থান, ত্রিংশদধ্যায় চিকিৎসা স্থান, দ্বাদশাধ্যায় কল্পস্থান এবং দ্বাদশাধ্যায় সিদ্ধিস্থান, এই অষ্ট বিভাগ। চরক বলেন তিনি এই বিদ্যা আত্রেয়-শিষ্য অগ্নিবেশের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। চরকসংহিতা অতি সুন্দররূপে গ্রথিত এবং মনোরঞ্জক। ইহা হইতে বহুবিধ উদ্ভিজ্জের গুণ, রোগের নির্ণয় এবং তত্তৎচিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা করিতে পারা যায়।

তৃতীয় সুশ্রুতকৃত আয়ুর্ব্বেদ। সুশ্রুত বিশ্বামিত্র-পুত্র ও চরকের শিষ্য কিন্তু তিনি গুরু অপেক্ষা শল্য এবং শালাক্য বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অন্তর্ব্বিদ্ধ বাহ্যিক পদার্থের অস্ত্রাদি কোন উপায় দ্বারা বহির্নিঃসারীকরণকে শল্য কহে। চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চিকিৎসার নাম শালাক্য। সুশ্রুতের গ্রন্থে ধাতুনির্ম্মিত সপ্তবিংশতি প্রকার শস্ত্রের নাম আছে। সুশ্রুতের মতে শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যতীত চিকিৎসাতত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। বাগ্‌ভট আয়ুর্ব্বেদের টীকাকার। ইনি লিখিয়াছেন যে, শস্ত্রগুলি ছয় ইঞ্চ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গুলী প্রমাণের অপেক্ষা দীর্ঘতর ছিল না। ওয়াইসের হিন্দু মেডিসিন নামক গ্রন্থে বিংশতি প্রকার শস্ত্রের প্রতিরূপ চিত্রিত আছে। এই সমস্ত সত্ত্বেও আত্রেয়, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ যে কোন্ সময় ভারত উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিনিগমনা করিতে পারা যায় না। তথাপি ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র যে অতিপ্রাচীন কাল হইতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল তাহার সংশয়াভাব।

বৈদিক সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রেরও সম্যক আলোচনা ছিল। আর্য্যঋষিগণ নক্ষত্র গ্রহ

সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং ক্রমে জ্যোতিষবেত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবির্ভাব হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যের অদৃষ্ট এবং রাজ্যাদির শুভাশুভ গণনা করিতে পারা যায়। ঋগ্বেদে চন্দ্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সোম নক্ষত্রদিগের ক্রোড়ে স্থাপিত আছেন (৮।৩ সূক্ত) চন্দ্র ও তন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহের গতিপথ এবং আকারের যে তৎকালে সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ হইত তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে এবং ব্রাহ্মণে নক্ষত্রদিগের অনেক উপাখ্যান আছে। প্রজাপতি এবং রোহিণীর পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হয়। আর একটী নক্ষত্র রোহিণীকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রজাপতির পৃষ্ঠে এক ত্রিপর্ব্বযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে। সেই হেতু অদ্যাপি প্রজাপতি নক্ষত্রে তিনটী তারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে ইংরাজীতে "ওরিয়ন্‌স বেল্ট" বলে। অনেক স্থলে মলিম্লুচ অর্থাৎ মলমাসের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা সৌর ও চান্দ্র বৎসরের গণনার মিল রাখা যায়। আর্য্যগণ যে অমাবশ্যা এবং পূর্ণিমার বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে সময়-নিরূপণের জন্য রাত্রি, চন্দ্র, হিমকাল প্রভৃতি মানরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক বেদেরই এক এক জ্যোতিষ আছে। জ্যোতিষ বেদের ষড়ঙ্গের একটী অঙ্গ। ইহা বৈদিক কর্ম্মের কালনিরূপণের উপযোগী। জ্যোতিষ বেদের চক্ষুস্বরূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে সূর্য্যের উদয়ও হয় না, অস্তও হয় না কিন্তু দিবসান্তে ইহা দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ কার্য্য করে অর্থাৎ এক স্থানে দিবা ও অন্য স্থানে রাত্রি, সুতরাং যে স্থানে রাত্রি হয় সে স্থানের লোকেরা মনে করে যে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর অনেক স্থলে জ্যোতিষ বিষয়ক বৃত্তান্ত আছে। সুতরাং আর্য্যগণ যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা সুপ্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে আর্য্য জাতীয় জ্যোতিষের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন নক্ষত্র শব্দটী চীন দেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত কিন্তু সেটী বিষম ভ্রম। চীন ভাষাতে সিইউ শব্দে একটী মাত্র তারা বুঝায় কিন্তু সংস্কৃত নক্ষত্র শব্দ তারাসমূহবাচী। জ্যোতিষ বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রথম। পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা মধ্যে ইহার এক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আকাশে চন্দ্রের ভ্রমণ-পথ সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশি ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরিতেছে। এই গতি বশত নক্ষত্র গ্রহমণ্ডলকে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করিতে বোধ হয়। দ্বিতীয় আর্য্যভট্টসূত্র। আর্য্যভট্ট খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পাটনার নিকট কুসুমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁকে ভারতবর্ষের অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রধান উন্নতিসাধক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। দশগীতিক বা দশগীতিসূত্র এবং এক শত অষ্ট সংখ্যক শ্লোক-বিশিষ্ট আর্য্যাষ্টশত। আর্য্যভট্ট পৃথিবীর গোলত্ব এবং আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন। "এই পৃথিবী মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূত-নির্ম্মিত, কদম্বের ন্যায় গোলাকৃতি। যেরূপ জাহাজগামী কোন ব্যক্তি নিজের গমন অনুভব করিতে না পারিয়া পার্শ্বস্থিত বৃক্ষাদির দ্রুতগতি দেখিতে পান, তদ্রূপ এই পৃথিবী ঘুরিতেছে

কিন্তু স্থির আকাশস্থ নক্ষত্রবর্গ আমাদিগের চক্ষে দ্রুতগতি-বিশিষ্ট বোধ হয়। ভপঞ্জর (নক্ষত্র সমূহ) স্থির আছে কিন্তু এই পৃথিবী আপনার মেরুদণ্ডে ঘুরিয়া তাহাদিগের দৈবসিক গতি সম্পাদন করিতেছে।” আর্য্যভট্ট রাহুকে গ্রাহ্য করেন না এবং গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার মত নির্ভুল। তিনি বলেন চন্দ্র এবং গ্রহ উপগ্রহগণ স্বজ্যোতির্ব্বিহীন কিন্তু সূর্য্যের প্রতিফলিত জ্যোতিতে সকলেই জ্যোতির্ম্ময়। আর্য্যভট্টের পর জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের অবনতি আরম্ভ হইল। বরাহমিহির এবং ভাস্করাচার্য্য তাঁহার পরবর্ত্তী দুই জন জ্যোতিষবেত্তা ও অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ। বরাহমিহির এক জন মাগধ ব্রাহ্মণ। ইঁহার গ্রন্থের নাম বৃহৎসংহিতা। ইনি গ্রীক শব্দ অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা জাতক বা জন্ম, যাত্রা বা স্থানান্তরে যাত্রা (বা যুদ্ধযাত্রা), বিবাহ প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভক্ত। ভাস্করাচার্য্য উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন এবং বীজগণিত, পাটীগণিত এবং পরিমিতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত আর এক জন অঙ্কশাস্ত্রবিৎ। ইহাঁর গ্রন্থের নাম ব্রহ্মগুপ্তসিদ্ধান্ত। ইনি রাহুকে ভিন্ন একটী গ্রহ মনে করিতেন কিন্তু গ্রহণের যেরূপ তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন তাহা ভ্রমাক্রান্ত নহে। ইহাঁর গ্রন্থে অনেক কুসংস্কার-দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে আমাদিগের অঙ্কশাস্ত্র ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। বারাণসী, দিল্লী (ইন্দ্রপ্রস্থ) মৎস্যদেশ (জয়পুর) প্রভৃতি স্থানে অনেক জ্যোতিষিক বৃহৎ গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিংহের মানমন্দির জয়পুরে প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায় এ বিষয়ে এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রের বর্ণনা আছে। শ্রীপতির রত্নমালা গ্রন্থে রাশিচক্র প্রভৃতির অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ উইলিয়ম জোন্‌স পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রীকে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদাহরণ পূর্ব্বক আমরা এই জ্যোতিষ সমালোচনার উপসংহার করিব। “জোন্স জিজ্ঞাসা করিলে পর পণ্ডিত শাস্ত্রী এই উত্তর করিলেন, পৌরাণিকেরা বলেন পৃথিবী গোলাকার নহে, কিন্তু অষ্টপর্ব্বতাবৃত এবং সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য; শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র এবং হিমালয় এই অষ্ট পর্ব্বত। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিস্, দধি, দুগ্ধ, এবং জল সমুদ্র এই সপ্তসমুদ্র। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা; জম্বু, প্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলি, শাক, পুষ্কর এবং কুশ এই সাতটী দ্বীপ। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ আমাদিগের বাসস্থান। জম্বুদ্বীপ আবার নববর্ষে বিভক্ত; কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, রুমন্বকবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ, কেতমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, চিনারবর্ষ এবং ভারতবর্ষ। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদ্বীপ ব্যতীত আর একাদশটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহাদিগকে উপদ্বীপ বলে। যদিও পৃথিবী সপ্তদ্বীপা বলিয়া খ্যাত তথাপি উপদ্বীপবর্গ সমেত অষ্টাদশদ্বীপা। ভূমধ্যভাগে সুমেরু পর্ব্বত দেদীপ্যমান এবং প্রকাণ্ড হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করিয়া এক দেবমূর্ত্তি এই অষ্ট লোক রক্ষা করিতেছেন। কেতুর মস্তক রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে বলিয়াই চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু আমরা (পৌরাণিক নহি) বিশ্বাস করি যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের ন্যায় গোলাকার কেবলমাত্র লবণাম্বু-চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিত এবং অসংখ্য দ্বীপ এবং উপদ্বীপপুঞ্জে শোভিত। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে পথ দ্বারা ভ্রমণ করে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে পথ দ্বারা ভ্রমণ করে এই দুই গমনীয় পথ দুই স্থানে পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছে; তাহাদিগের

উচ্চতরটীকে পৌরাণিকেরা রাহু এবং অপ-টীকে কেতু বলে। এই দুই স্থলে চন্দ্র উপস্থিত হইলেই গ্রহণ হইতে পারে।" উচ্চতর সংযোগস্থান (রাহু) কে ইংরাজীতে চন্দ্রের Asending Node এবং নিম্নতর (কেতু) কে Descending Node কহে।

এই সমস্ত দ্বারা সুব্যক্ত হইতেছে যে আর্য্যদিগের জ্যোতিষশাস্ত্র বৈদিক সময় হইতেই প্রসিদ্ধি এবং প্রামাণিকতা লাভ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

অদ্যাবধি পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে প্রায় সে সকল গুলিই তাহাদিগের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পরে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অনেকের সংস্কার এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে সম্প্রদায় নাই। এই সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে না হউক কিন্তু কিছুকাল পরে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যেরা রাজ-গৃহ নামক স্থানে একটী সভা স্থাপন করেন। ঐ সভায় পাঁচ শত প্রধান প্রধান বুদ্ধশিষ্য তাঁহাদিগের গুরুর প্রচারিত মত ও নিয়ম সকল নির্ণয় করেন এবং এরূপ স্থির করেন যে যাহারা ঐ সকল মতে বিশ্বাস এবং ঐ সকল নিয়মানুসারে কার্য্য না করিবে তাহারা ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্য হইতে দূরীভূত হইবে। এই ঘটনার পর এক শতাব্দী কাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে মতবিভেদ ঘটে নাই। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর কতকগুলি পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তাব করিলেন। ইহাঁরা বলিলেন যে যদ্যপি তাঁহারা কাহার নিকট হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করেন, যদ্যপি তাঁহারা জলবৎ তরল কোন রূপ মাদকদ্রব্য সেবন করেন, যদ্যপি তাঁহারা মধ্যাহ্ন কালের পর জল, দুগ্ধ ও দধি পান করেন, যদ্যপি তাঁহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করেন, এবং যদ্যপি তাঁহারা মঠ ভিন্ন লোকের ভদ্রাসনে দীক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধর্ম্ম-দোষে দোষী বলা যাইতে পারিবে না। ইহাঁদিগের এই প্রস্তাবে অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা সম্মত হইলেন না। কিছুকাল দুই দলে বিলক্ষণ বাকৃবিতণ্ডা হইতে লাগিল, পরিশেষে এই সকল পরিবর্ত্তনপ্রিয় বৌদ্ধ অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র হইলেন, এবং কাকন্দক নামে এক জন বিখ্যাত বৌদ্ধের পুত্র যসকে গুরুর পদে বরণ করিলেন। ইহারা ঐ সময়ে বৈশালি নামক স্থানে ইহাঁদিগের মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের একটি সভা স্থাপন করেন। সভাস্থলে প্রায় ৭০০ শত বৌদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় ইহাঁরা ধর্ম্ম-মত ও ধর্ম্ম-নিয়ম স্থির করিয়া সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন ও তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় হইল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধ দেবের মতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। বিনয়পেটক* নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের দীপবংশ নামক পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে এই নূতন বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের উপদেশের বিপরীতাচরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম কলুষিত ও বিপর্য্যস্থ করিতে চেষ্টা পায়। কালে এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। এই অষ্টাদশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে

* সংস্কৃত—বিনয়পেটক।

মতভেদ ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু এই সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যে বিশেষ মতভেদ ঘটিয়া ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিব্বত দেশীয় লামা উপাসক-দল একটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়। তিব্বতদেশের নিকটবর্ত্তী নেপালরাজ্যে খ্রীষ্টীয় ছয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। ৬৩২ খৃঃ অব্দে তিব্বতের রাজা বৌদ্ধ হন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সকল লইয়া যান। এই সময়ে রাজার দৃষ্টান্তে তিব্বতদেশবাসী অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের একটি বিশ্বাস আছে যে তাহাদের গুরুর আত্মায় বুদ্ধদেবের আত্মার আবির্ভাব থাকে। এই বিশ্বাস তিব্বত দেশে বিশেষ রূপে প্রচলিত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তদ্দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা তাহাদিগের লামা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান গুরুর আত্মায় স্বয়ং বুদ্ধদেব সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকেন এইরূপ বিশ্বাস করিতে লাগিল এবং রোমান কেথোলিকেরা যেরূপ পোপকে জ্ঞান করে সেইরূপ তাহারা লামাকে অমোঘ, দুঃখ কষ্টের অতীত, পাপশূন্য, পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, বিবেচনা করিতে লাগিল। ক্রমশ যতই লোকে লামাকে বুদ্ধদেবোচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল, ততই লামা আপনার আধিপত্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ১৪১৯ খৃঃঅব্দে লামা তিব্বত দেশের রাজা ও তদ্দেশবাসীদিগের গুরু উভয় পদই অধিকার করিলেন। এই রূপে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রচারিত হইয়া লামার উপাসনার আকার ধারণ করিল, এবং ইহা একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

জৈন আর একটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় ৬০০ খৃঃঅব্দে অভ্যুদিত হয় এবং ১২০০ খৃঃঅব্দ হইতে অবনতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই সম্প্রদায় অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী। ইহাতে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কতকগুলি মত আছে তেমনি হিন্দুধর্ম্মেরও দুই একটি মত আছে। অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, প্রভৃতি দেবতার পূজা ও উপাসনা করিয়া থাকে। জৈনধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের কতক গুলি মত সংস্কৃত ও কতকগুলি মত বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। এই ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ের কোন রূপ প্রসঙ্গ করা এস্থলে আর আবশ্যক বোধ হইল না।

ধর্ম্মনীতি সহজ-জ্ঞানসিদ্ধ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরকালের অস্তিত্ব, পাপীর দণ্ড ও ধার্ম্মিকের পুরস্কার প্রাপ্তি ধর্ম্মবিষয়ক এই সমস্ত সত্য সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ ইহা তত্ত্বজ্ঞানিরা ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরোপকার একটি ধর্ম্ম; পরস্ত্রীগমন একটি মহাপাপ, পরস্বাপহরণ একটি অধর্ম্ম এই সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতি যে সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য যেরূপ সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ, ধর্ম্ম-নীতিও সেইরূপ সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ। ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য জানিবার জন্য যেমন বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক করে না, ধর্ম্মনীতি জানিবার জন্য সেইরূপ জ্ঞান কিম্বা বিদ্যা আবশ্যক করে না। নিরক্ষর মূর্খেরা যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার পবিত্র পূর্ণ স্বরূপ ও পরকালের অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্যে বিশ্বাস

করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদের মার্জ্জিত জ্ঞানের সহকারিতা আবশ্যক করে না ; তেমনি তাহারা বিদ্যা বা জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত সহজে ধর্ম্মনীতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ধর্ম্মনীতি যে সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ তাহার একটি প্রমাণ এই যে তাহা মনুষ্যের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আবদ্ধ নহে; উহা বিদ্যা-বুদ্ধি-নিরপেক্ষ ও ব্যাপক। এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে, যে অনেক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খ, অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান অপেক্ষা সমধিক দৃঢ়তা, তৎপরতা ও আগ্রহের সহিত ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উকুনি নামক প্রদেশে এক বর্ব্বর জাতি বাস করে। ইহাদের ব্যবহার পরীক্ষা কর তাহাতে সভ্যতার সামান্য উপকরণও পাইবে না। ইহারা ফলমূল ও পশুমাংসে দিনপাত করিয়া থাকে। এই জাতি চৌর্য্যবৃত্তি ও ব্যভিচার প্রভৃতি কার্য্য অত্যন্ত দোষাবহ জ্ঞান করে এবং ঐ সকল দোষে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে কঠিন ও গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক কাপ্তেন গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলেন যে, তিনি যখন উকুনি প্রদেশে ভ্রমণ করেন তখন তথাকার এক গ্রামের এক ব্যক্তি ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। গ্রাণ্ট স্বচক্ষে দেখিয়াছেন গ্রামবাসীরা ঐ দোষী ব্যক্তিকে বন্ধন পূর্ব্বক বেত্রাঘাত করিতে করিতে তাহার পৃষ্ঠের চর্ম্ম উৎপাটন করিয়া ফেলে*। তৎ প্রদেশে ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত ব্যক্তির কখন কখন প্রাণদণ্ডও হইয়া থাকে। ঐ স্থানে নরহত্যায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। আমরা যে সকল কার্য্য ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ ও পাপ জ্ঞান করি, আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী কারাগু নামক প্রদেশ নিবাসী অসভ্য জাতি প্রায় সেই সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ ও পাপ জ্ঞান করিয়া থাকে। এই জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইলে তাহার কর্ণদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়, এবং যদি কোন ক্রীতদাস ঐ দোষে লিপ্ত হয় তাহার অপেক্ষাকৃত গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি নর হত্যা করে তাহার সমস্ত বিষয় বিভব হত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রকে প্রদান করা হয়, এবং তাহার চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তাহাকে এক উচ্চ শৈলশিখর হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কাপ্তেন গ্রাণ্ট বলেন যে কারাগুনিবাসীরা হত্যা ও ব্যভিচার-দোষকে অতিশয় ঘৃণা করে এবং ঐ সমস্ত দোষে লিপ্ত ব্যক্তিকে উল্লিখিত প্রকার দণ্ড প্রদান করিয়া থাকে তজ্জন্য ঐ প্রদেশে জনসমাজ এক প্রকার সুশাসিত, এমন কি, ক্রীত দাস ব্যতীত অন্যান্য লোকের মধ্যে ঐ দুইটি দোষ একান্ত বিরল। গ্রাণ্ট সাহেব আরও বলেন যে, ইংলণ্ডে ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ দোষ সকল সংশোধনার্থ যে সকল দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তদপেক্ষা কারাগু প্রদেশে হত্যা প্রভৃতি অপরাধের দণ্ড অতিকঠোর নহে তথাপি ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয় যে সুসভ্য ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ দোষ যেমন অধিকতর দেখা যায় বর্ব্বর কারাগুবাসীদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অংশে কম*। কারাগুবাসীদিগের মধ্যে কেহ চৌর্য্য-দোষে লিপ্ত হইলে চারিটী ছিদ্রযুক্ত একখণ্ড কাষ্ঠে তাহার হস্তপদাদি প্রবেশ করাইয়া অপরাধের গৌরব ও লাঘব অনুসারে তাহাকে দশ মাস পর্য্যন্তও রাখা হয়। গ্রাণ্ট সাহেব বলেন একদা একজন কারাগুবাসী রাত্রিযোগে এক দল বণিকের বাণিজ্য দ্রব্য অপহরণ করে। তদ্দেশের অধিপতি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া আ-

* A Walk Across Africa By Captain J. P. Grant P. 107.

* A Walk Across Africa P.182.

নিয়া চিরদাসত্ব রূপ দণ্ড প্রদান করেন এবং বণিকদিগের যে সকল দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল তাহার পূরণার্থ তিনি স্বীয় কোষাগার হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করেন। কারাগুবাসীদিগের মধ্যে কেহ বিনাকারণে কাহাকে প্রহার করিলে দোষী ব্যক্তিকে দশটি ছাগ দণ্ড দিতে হয়। কেহ অপর কোন লোককে শরাঘাত করিলে বিচারে তাহার সম্পত্তি আক্রমণ করা হয় এবং ঐ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ রাজার ও অপরার্দ্ধ আহত ব্যক্তির প্রাপ্য হইয়া থাকে। আফ্রিকায় উগান্দা, কারি, ও উয়াকুঙ্গ নামক তিনটি প্রদেশ আছে। তথাকার নিয়ম অতি সুন্দর। যাহাতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা হয় তদ্বিষয়ে সাধারণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আছে। এমন কি তৎপ্রদেশে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা স্ত্রীলোকদিগের একটি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তথায় ব্যভিচারের দণ্ড অতি গুরুতর। কাপ্তেন গ্রান্ট কোন এক ব্যভিচার-দোষ লিপ্ত ব্যক্তির কর্ণদ্বয় ও হস্তের অঙ্গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ঐ সকল প্রদেশে কর্ণহীন মনুষ্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা একদা ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত ছিল। আফ্রিকায় করগ্না নামক একটি প্রদেশ আছে। তথায় যে অসভ্য জাতি বাস করে তাহাদিগের মধ্যে সতীত্বের বিশেষ আদর ও স্ত্রীলোকের প্রতি বিশেষ সম্মান দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোকের অবমাননা করিলে কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে অধিকাংশ লোক ঐ স্ত্রীলোকের পক্ষ অবলম্বন করে এবং ঐ দুরাচার পামরের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। কাপ্তেন গ্রান্ট স্বয়ং এইরূপ একটি ঘটনা দেখিয়াছিলেন। আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী বারি নামক প্রদেশনিবাসী বর্ব্বরেরা ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যে আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে হত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি দোষের উপযুক্ত দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। জাঞ্জিবার প্রদেশে ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ দোষে কঠিন ও নিষ্ঠুর দণ্ডের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বিশ্বস্ত সত্যপরায়ণ পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায় যে কেবল আফ্রিকাখণ্ডে নহে, পৃথিবীস্থ অন্যান্য নানাস্থানের অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদিগেরও ধর্ম্মনীতির পরিস্কার ও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে।

অনেকে কহেন যে জনসমাজের উপকার ও অপকার বিবেচনায় ধর্ম্মনীতি স্থির হইয়া থাকে। এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। ধর্ম্মনীতি যদি জনসমাজের উপকার ও অপকার ধরিয়া নির্ণীত হয় তাহা হইলে যে সমস্ত অসভ্যজাতি প্রকৃতির সদ্যোজাত শিশু, যাহাদের চিন্তাশক্তির কিছু মাত্র উন্মেষ হয় নাই, তাহাদের মধ্যে সমাজের উপকারিতা ও অপকারিতা-বোধ কি প্রকারে হইবে। আমরা বলি এই সত্যটি সহজ-জ্ঞান-লব্ধ এবং ইহা এই জন্যই বিশ্বজনীন।

ধ্যান ধারণা।

মাতৃ-ভক্ত সন্তান, যত মাতার অকৃত্রিম স্নেহ-প্রেমের বিষয় আলোচনা করেন, ততই যেমন সেই মাতার প্রতি তাঁহার চিত্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিভরে অধিকতর রূপে অনুরক্ত হয়, কুল-পাবন সৎপুত্র যত পিতার অকপট প্রীতির বিষয় চিন্তা করেন, ততই যেমন তাঁহার পিতার প্রতি অনুরাগ বদ্ধ-মূল হয়, অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ, যত তাঁহার হৃদয়-বন্ধুর গুণ-গ্রাম সমালোচনা করেন, ততই যেমন সেই বন্ধুর প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রেম-প্রবাহ প্রবলতররূপে প্রবাহিত হয়, তেমনই

সেই পিতার পিতা, মাতার মাতা, চিরকালের সুহৃদ্-বন্ধু সখা পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রীতি, স্নেহ-করুণা, ও মহিমার বিষয় যত চিন্তা করা যায়, তাঁহার বরণীয় জ্ঞান-শক্তি যত ধ্যান করা যায়, ততই তাঁহার প্রতি আত্মা অনুরক্ত হয়, ততই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি তাঁহার প্রতি অধিকতর রূপে ধাবিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ-সম্মিলনের গাঢ়তা হইতে থাকে। সেই জন্য ধ্যানপরায়ণ হওয়া সাধক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পিতাপুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক অকাট্য সম্বন্ধ থাকিলেও পুত্র যদি বাল্যাবস্থা হইতে দূর দেশবাসী হন, পিতামাতার নিত্য-স্নেহে প্রতিপালিত হইতে না পারেন, প্রতি দিন তাঁহারদের অকপট প্রেমের অভিনয় প্রত্যক্ষ দেখিতে না পান, তাহা হইলে যেমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি অধিকাধিক রূপে স্ফূর্ত্তি পায় না; তেমনই ব্রহ্ম পিপাসু আত্মা যদি ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা-পরায়ণ না হন, তাহা হইলে দিন দিন ঈশ্বরের নবতর কল্যাণতর জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত না হওয়াতে ক্রমে তাহার অনুরাগ মন্দীভূত হইতে থাকে, ক্রমে তাহার আধ্যাত্মিক-যোগবন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। উন্নতিশীল আত্মা কোনরূপেই এক ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। একবিধ অন্ন পানে বর্দ্ধন-উন্মুখ আত্মার জ্ঞান-ক্ষুধা প্রেম-তৃষ্ণা কদাচ নিবারণ হয় না। সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশুর অবস্থা-ভেদে কাল-ভেদে কত প্রকার অন্নপানের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে সে কালক্রমে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া যৌবন-শ্রী ধারণ করে। তাহাকে যদি কেবল মাতৃ-দুগ্ধে আমৃত্যু পালন করা যায়, তাহা হইলে তাহার শরীর অচির-কাল মধ্যেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। তেমনই আত্মা যদি কেবল ঈশ্বরের একরূপ জ্ঞান প্রেম প্রতীতি করিয়াই নিরস্ত থাকে, আর যদি স্বীয় জ্ঞানের উন্নতি,—প্রেমের প্রশস্ততা, মঙ্গলভাবের আকার আয়তন বৃদ্ধি করিতে না পারে; তাহা হইলে সে আপনার অন্ধতা অজ্ঞতা বশত ঈশ্বরের এক প্রকার পরিমিত ভাব দেখিয়া আর তৃপ্ত হয় না। ক্রমে তাঁহার প্রতি তাহার আস্থা অনুরাগ মন্দীভূত হইতে থাকে। তাহার কৌতূহল চরিতার্থ হইলে সে একমাস না হয়, একবৎসর; না হয় দশবৎসর পরেও হয় তো তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার-গতিকে প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ের ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে ঈদৃশ শোচনীয় ঘটনা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে যৌবন-সুলভ উৎসাহ অনুরাগে কত শত ব্যক্তিকে আগ্রহের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায়—ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, যত দিন না কৌতূহল চরিতার্থ হয় ততদিন কেমন নিয়মিত রূপে উপাসনাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। আচার্য্য উপাচার্য্যের যত্ন চেষ্টায় আদেশ উপদেশে তাঁহারদের যতদূর উন্নতি হইবার তত দূর হইলেই তাঁহারদের উৎসাহ-অনল ক্রমে নির্ব্বাণ-উন্মুখ হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহারা আত্ম চেষ্টা-বিহীন হইয়া গভীরতর বিষয়ে চিত্ত-সন্নিবেশ করিতে পারেন না, আত্মজ্ঞান-শূন্য হইয়া কেবল শব্দ সংগীতে ব্রহ্ম-লাভের চেষ্টা করেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া ভগ্নহৃদয়ে উপাসনা-ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান-উদ্দীপক ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দগুলি পুরাতন হইলে আর তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে না। তাঁহারা নূতন কথা শুনিবার জন্য কিছুকাল ইতস্তত ধাবিত হন, নূতন প্রণালী সংস্থাপনের জন্য বিব্রত হইয়া ভ্রাম্যমান হইতে থাকেন। "পুরাণ" ঈশ্বরের প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। কালক্রমে সেই নূতন বাক্য,

নূতন পদ্ধতি নূতন বক্তা পুরাতন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারদের অনন্তকাল-প্রতিপাল্য মহাব্রত প্রায়ই অকালে উদ্যাপিত হইতে দেখা যায়।

যিনি প্রকৃত-ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া উপসনা-ক্ষেত্রে গমন করেন,তাঁহাকে আর শূন্য-হস্তে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মদর্শী তিনি সর্ব্বত্রই সকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে দর্শন করেন। যিনি আত্ম-দর্শী, তিনি জ্ঞান-প্রসাদে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া আত্ম-রূপ নিভৃত নিলয়ে সুরম্য নিকেতনে সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন। সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু সাধকের নিকটে ঈশ্বরের সত্তাতে সকলই নূতন। তাঁহার নবতর কল্যাণতর উৎসাহ—অনুরাগ-প্রভাবে সকলই তাঁহার চক্ষে নূতন ভাবেই প্রতীয়মান হয়। শব্দ সংগীত প্রভৃতি উপলক্ষ্য লইয়া যে তিনি ব্যস্ত বিব্রত নহেন, তিনি পরম লক্ষ্য পরমেশ্বরের জন্যই ব্যাকুল। কোন মনুষ্য ত তাঁহার আদর্শ নহে যে, তাহার দোষাদোষে তিনি মুগ্ধ বা উৎফুল্ল হইবেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই" তাহার আদর্শ। তাঁহার উন্নততম আদর্শকে কেহই কলঙ্কিত করিতে পারে না। তাঁহার উপরে কালের অধিকার নাই, ঘটনারও আধিপত্য নাই। যিনি 'সন সাধুনা কর্ম্মনা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্,, তিনিই সেই সাধকের আশ্রয় ও অবলম্বন। তিনিই তাঁহার নেতা ,বিধাতা মুক্তিদাতা সকলই। তাঁহাকে লাভ করাই সেই উপাসকের ইচ্ছা ও আকিঞ্চন। তিনি তো উদাসীন পথিকের ন্যায় ভ্রমণ করেন না, যে ,সকলই তাঁহার নিকটে অর্থশূন্য শোভাশূন্য তাৎপর্য্যবিহীন হইবে। তিনি প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু সত্যসন্ধ ব্রহ্মপিপাসু হইয়া সর্ব্বত্র গমন করেন, সুতরাং সকল পদার্থ সকল বস্তু সকল বাক্যই তাঁহার সন্নিধানে নূতন তত্ত্ব নূতন ভাব নবতর সত্য প্রকাশ করে। কবির চক্ষে যেমন কঠোর পর্ব্বত,ভীষণ সমুদ্র,নিবিড় অরণ্য,জ্বলন্ত সূর্য্য, কলঙ্কিত চন্দ্র প্রভৃতি মনোহর-ভাব-পূর্ণ কোমল ভাবে প্রকাশ পায়, তেমনই তত্ত্বরসার্দ্র-চিত্ত সাধুর নিকটে সকলই সুধাময় অমৃতময় জ্যোৎস্নাময়। তাঁহার প্রস্ফুটিত জ্ঞানচক্ষুর সমক্ষে কিছুই কঠোর, কোন বস্তুই নীরস নহে—সকলই ব্রহ্মজ্ঞানামৃতরসে রসাল, সকলই প্রেমার্দ্র, সকলই পরমার্থ তত্ত্বে পরিপূর্ণ। অন্যের যেখানে সহস্র শব্দে চিত্ত-উত্তেজিত হয় না, সহস্র অনুপ্রাস উপমায় শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত হয় না, তিনি সেখানে শিশুমুখ-বিনির্গত ঈশ্বরের প্রথম নাম ওঁঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র রোমাঞ্চিত শরীরে স্তম্ভিত হৃদয়ে ঈশ্বরের পূর্ণভাব উপলব্ধি করেন। তিনি এই একটী মাত্র শব্দে যে গভীর ভাব প্রাপ্ত হন; তাহা তাঁহার আত্মাকে সমস্ত জীবন স্বচ্ছন্দে পোষণ করিয়া থাকে। তিনি ওঁঙ্কার অর্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের নিত্য নূতন সত্য নূতন জ্ঞান নবতর মঙ্গল ভাবের পরিচয় পাইয়া—আত্মাকে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত করিয়া ওঁকার শব্দ কেন যে "প্রণব" বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তাঁর আত্মা যে ওঁকার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের সত্তা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতেছে, তাঁর মানস-রসনা যাহাঁর মাহাত্ম্য সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেছে, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতে অহর্নিশি যে সেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক অনাহত গভীর নিনাদ উত্থিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি নাদ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করত কৃতার্থ হয়েন।

ধ্যান ধারণা পক্ষে যত শব্দ আড়ম্বর অল্প হয় ততই মঙ্গল, সেই পরম লক্ষ্য সা-

ধন বিষয়ে ব্রহ্মযোজিত পরিণত আত্মার পক্ষে উপলক্ষ্য-মাত্র। যত সংক্ষেপ হয় ততই শ্রেয়। যে অল্পমাত্র শব্দে পরব্রহ্মের সত্য জ্ঞান অমৃত ভাব গাঢ়তর রূপে নিহিত আছে, যাহাতে ঈশ্বরের সুমহান্ পূর্ণ ভাব বিশেষ রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার সন্নিধানে অধিকতর আদরণীয়। সেই জন্যই যোগ-প্রধান পুণ্য-ক্ষেত্র আর্য্য-ভূমি মধ্যে গায়ত্রীর এত সম্মান সমাদর। সেই জন্যই ওঁঙ্কার শব্দ হিন্দুসমাজ মধ্যে এত আদরের ধন। সেই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর অর্থ মাহাত্ম্য লইয়া রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সেই নিমিত্তই মনুসংহিতা ওঁঙ্কার ব্যাহৃতি এবং ত্রিপাদ গায়ত্রীকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য বোধের নিমিত্ত প্রতি দিন নিরলস হইয়া বর্ষত্রয় প্রণব-ব্যাহৃতি-যুক্ত ত্রিপাদ গায়ত্রী জপকেই ব্রহ্মলাভের অদ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিধি দিয়াছেন। সেই নিমিত্তই ওঁঙ্কার অমূল্য ধন, গায়ত্রী ত্রিবেদসার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই যে কার্য্যের মন্ত্র নাই, গায়ত্রীই তাহার মহামন্ত্র। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; ব্রহ্মচিন্তার অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ গায়ত্রী-জপই তাহার মহা প্রায়শ্চিত্ত। যে কর্ম্মহীন সাধন-বিহীন ব্যক্তির আর গতিমুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই, ওঁঙ্কার গায়ত্রীই তাহার অমৃত লাভের এক মাত্র সোপান বলিয়া বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থই এক বাক্যে বিধি দিতেছেন। "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" "সেই ওঁঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও"।

শুদ্ধ উপনিষৎ কেন, সাধন-সৌকর্য্যার্থে পুরাণ-তন্ত্রও ব্রহ্মবীজ ওঁঙ্কার শব্দের আদর্শে বহুবিধ অর্থপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত শব্দ সংগঠন পূর্ব্বক দেব দেবীর ধ্যান ধারণা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বীজমন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যেরূপে যে প্রকারে যত বীজই কেন গঠিত হউক না, ব্রহ্মবীজ, প্রথমনাম ওঁঙ্কারই তাহার এক মাত্র আদর্শ। বস্তুত প্রণব ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী মধ্যে সাধকের প্রয়োজনীয় যেরূপ অমৃত-সার নিহিত আছে, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গায়ত্রী ধ্যান ধারণার যে প্রকার উপযোগী, এমন দ্বিতীয় মন্ত্র আর প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না! সেই জন্যই গায়ত্রী আর্য্যজাতির সর্ব্বস্ব ধন। সেই কারণেই শঙ্কর ব্যাস ও মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণ গায়ত্রীর এত অনুরাগী হইয়াছিলেন। এক ওঁঙ্কার শব্দ কি সার-গর্ভ! কি সহজ উচ্চার্য্য! পরব্রহ্মের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব ভাব এক শব্দেই অভিব্যক্ত হইতেছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিই সমুদায় বিশ্বজ্ঞাপক। "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" গায়ত্রীর এই প্রথম পাদ। (জগৎ-প্রসবিতার সেই বরণীয়) "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" দ্বিতীয় পাদ। (তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করি) "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" তৃতীয় পাদ। (যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন)। ইহাতে ঈশ্বরের কেমন মহান্ ভাব ব্যক্ত হইতেছে। সেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার কেমন স্রষ্টা সৃষ্ট, আশ্রয় আশ্রিত, দাতা গৃহীতা, উপাসক ও উপাস্য ভাব বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আত্মার কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার প্রতি তাঁহার কেমন অকপট-পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ প্রদর্শিত হইতেছে। যিনি অসীম আকাশে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে,

জ্বলন্ত সূর্য্যে বর্ত্তমান ; তিনি আমার আত্মার মধ্যে বিরাজমান। যিনি একাকী অনন্ত চরাচর শাসন করিতেছেন, যিনি বজ্রে বল, বায়ুতে শৈত্য, জলেতে তৃপ্তি, চন্দ্রে কান্তি, সূর্য্যে জ্যোতি বিধান করিতেছেন ; তিনি আমার আত্মাতে থাকিয়া আত্মাতে ধর্ম্মবল ও শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, কি মনোহর ভাব! কি উৎসাহকর বাক্য! ধ্যান ধারণার কি মহত্তর উপলক্ষ্য। যোগের গাঢ়তা সম্পাদন জন্য সাধক ধ্যান-ধারণা-পরায়ণ হইবেন। কদাচ উপাসনাবিহীন হইবেন না। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি মহিমা চিন্তনে নিযুক্ত থাকিলে ক্রমে আত্মাতে নূতন সত্য —তাঁহার নবতর কল্যাণতর স্নেহকরুণা প্রকাশ পাইতে থাকে। ক্রমে ধৃতি সমাধি-শক্তি বর্দ্ধিত হইলে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি আরো অধিকতর রূপে তাঁহার প্রতি উদ্দীপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অটল নির্ভরের ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

তিনি আমাতে বর্ত্তমান, আমি তাঁহাতে সংস্থিত রহিয়াছি, ইহা অহর্নিশি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা তখন আত্মার সহজ ভাব হইয়া উঠে। সুতরাং পাপচিন্তা বিষয়-লালসা আপনা হইতেই দূরীভূত হয়। সকল আবরণ আচ্ছাদন তিরোহিত হইয়া যায়। তখন জ্ঞান-চক্ষু কেবল তাঁহার প্রতিই উন্মীলিত থাকিয়া তাঁহার অনুপম জ্যোতি অতুলন মহিমাই নিরীক্ষণ করিতে থাকে, প্রেম-প্রবাহ কেবল তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়, মানস-রসনা নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার অমৃত রস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ও বিক্ষেপ-আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া যায়। সেই জ্বলন্ত-জ্যোতি—সেই উজ্জ্বল প্রেম হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিলে বিষয়-প্রলোভন, ইন্দ্রিয়-সুখের আকর্ষণ আর চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না প্রত্যুত সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া আত্মাকে সম্পূর্ণ মুক্তিইচ্ছু করিয়া তোলে।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন

৪০২ সংখ্যক পত্রিকার ১১৯ পৃষ্ঠার পর।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরবদিগের সামান্য গ্রানাডা রাজ্য একটি পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়া ছিল। জেনোয়ানিবাসীরা গ্রানাডার রাজধানী দর্শন করিয়া তাহার একটী বিবরণ লিখিয়া যায়। উহারা বলে যে তাহারা যত দুর্গ বেষ্টিত নগর দেখিয়াছে তন্মধ্যে গ্রানাডা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ নগরের সুদৃঢ় প্রাচীর এক সহস্র গুম্বজে রক্ষিত। তথায় যে দুইটি দুর্গ ছিল, তন্মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাতে চল্লিশ সহস্র সৈন্যের স্থানসঙ্কুলান হইত। ধনীগণের বাসভবন নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে খচিত ছিল। রাজপথ সকল প্রস্তরনির্ম্মিত ও আলোকমালায় সুশোভিত ছিল। উন্নতির এই দুইটি চিহ্ন ইহার বহুদিন পরে দক্ষিণ ইউরোপে পরিলক্ষিত হয়। দেশ দেশান্তর হইতে বহুসংখ্যক লোক গ্রানাডার বাজারে আসিয়া নানাবিধ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিত। তত্রত্য অধিবাসীদিগের মধ্যে বিশ্বাস এমনি প্রবল ছিল যে, তাহারা মুখে যাহা স্বীকার করিত, তাহা এখনকার সুসভ্য রাজ্যের লিখিত অঙ্গীকার-পত্র অপেক্ষা অটল। গ্রানাডার প্রত্যেক যুবরাজের প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় ছিল। ইহাঁরা বহু সংখ্যক বিদ্যালয় চিকিৎসালয় জলপ্রণালী, ও পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া দেন। যুদ্ধের উপযোগি বস্তু সকল তথায় প্রচুর রূপে সঞ্চিত ছিল। শান্তিকালেই

শত সহস্র সৈন্য বহু বেতনে নিযুক্ত থাকিত। এখন সমস্ত স্পেনে যতগুলি দুর্গ আছে তখন কেবল এক গ্রানাডা রাজ্যে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক দুর্গ ছিল। মালাগা ও আলমিরা আরবদিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এই দুইটি প্রদেশ প্রায় গ্রানাডার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।

আমরা উপরে মধ্যকালে আরবদিগের অবস্থার বিষয় যাহা উল্লেখ করিলাম তাহা এক প্রকার অসম্পূর্ণ, কিন্তু তথাচ উহা দ্বারা তৎকালে আরবেরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা প্রায় সকল বিষয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে আরবদিগের সহিত ইউরোপীয় জাতিগণের কতদূর সংশ্রব ছিল। সিসিলি রাজ্য দুই শত এবং স্পেন দেশের অধিকাংশ স্থান সাত শত আশি বৎসর আরবদিগের শাসনাধীন ছিল। ইটালীর অন্তঃপাতী আমাল্‌ফি নামক নগরের সহিত স্পেনদেশীয় আরবদিগের বাণিজ্য চলিত। বিখ্যাত ইংরাজ পুরাবৃত্তকার হ্যালাম বলেন যে দ্বাদশ শতাব্দীর একজন গ্রন্থকর্ত্তা ইটালীর অন্তঃপাতী পিসা নগরে আরব বনিকদিগের প্রাদুর্ভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হ্যালাম আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে বিনিসের ন্যায় ইউরোপের অন্য কোন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রধান রাজ্য মুসলমানদিগের সহিত এত গাঢ় যোগ সংস্থাপন করে নাই। বিনিস নগরীর বনিকেরা আরবদিগের অধিকারভুক্ত একার ও আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিত। কিন্তু এই সংশ্রব নিবন্ধন বিনিসনগরবাসীরা আরবদিগকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিদ্বেষ করিত না। জেনোয়াবাসীদিগের গ্রানাডা রাজ্যে কতকগুলি বাণিজ্যাগার ছিল, এবং তাহারা এই সূত্রে তথাকার কালিফের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া ছিল। ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজধানী ফ্লরেন্স নগরীর বনিকেরা গ্রানাডা হইতে প্রচুর পরিমাণে রেসম আনয়ন করিয়া স্বদেশে বিক্রয় করিত। ফ্লরেন্স ও ইটালীর অন্যান্য নগরবাসীরা স্পেনদেশীয় আরবদিগের নিকট শিল্প কার্য্য শিক্ষা করে। তত্রত্য আরবজাতির সহিত তদ্দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের কি যুদ্ধ কি শান্তি সকল অবস্থাতেই বিশেষ প্রীতি ছিল। ফ্রান্সের অন্তঃপাতী প্রভিন্স নামক প্রদেশবাসীদিগের সহিত আরবজাতির সামান্য সদ্ভাব ছিল না। ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধর্ম্ম, এবং পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ এই সমস্ত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব, ইটালী স্পেন ও প্রভিন্সনিবাসী খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের সহিত এসিয়া এফ্রিকা এবং আন্দালুসবাসী আরবদিগের ততদূর সদ্ভাব ছিল। যদিও ইটালী প্রভৃতি দেশবাসীরা আরবদিগের জনতাপূর্ণ নগর, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, উর্ব্বর ভূমি ও উৎকৃষ্ট শিল্প এই সমস্ত বাহ্য উন্নতিকে ভয় ও ঈর্ষার সহিত দেখিত, তথাপি উহারা তাহাদিগের নিকট ঐ সকল বিষয়ে সম্যক শিক্ষা লাভ করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মেনী হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র স্পেনে আরবদিগের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হইত। তথায় সুবিদ্বান আরব অধ্যাপকেরা আরিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র, ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং আর্কমিডিসের বৈজ্ঞানিক উপদেশ ব্যাখ্যা করিতেন। ইউরোপের নানা স্থানের সামুদ্রিক ব্যবসায়ীগণ স্পেনে আসিয়া তথায় পশুচর্ম্ম উর্ণা ও বসার বিনিময়ে ভারতবর্ষীয় গন্ধ দ্রব্য ও মণিমুক্তা, ডামাস্কসের অস্ত্রফলক এবং গ্রানাডার রেশম লইয়া যাইত। শান্তির সময়ে অনেক নাইট স্পেনদেশীয় কালিফদিগের রাজসভায় বহু সমাদরে গৃহীত হইতেন এবং তথায় নানা প্রকার যুদ্ধবিদ্যায়

আপনাদিগের দক্ষতা ও সাহস প্রদর্শন করিতেন।

সকল ইতিহাসলেখকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে অজ্ঞানান্ধকারের কাল শেষ হয় এবং তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানসূর্য্যের জ্যোতি তথায় বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী চার শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে ধীরে ধীরে ধনের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নগর সকল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, এবং শিল্প কার্য্য ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইল। ইটালী, প্রভিন্স ও স্পেন প্রভৃতি যে সমস্ত দেশের সহিত আরবদিগের বিশেষ যোগ ছিল, এই সমস্ত পরিবর্ত্তন তথায় সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। ইহা দ্বারা ইউরোপে যে অনেক বিষয়ে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইল তাহাতে আরবদিগের ক্ষমতাই স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। ইহাদের প্রচারিত দর্শনশাস্ত্র আন্দালুস হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই দর্শন অনেক খ্রীষ্টিয়ানকে স্বধর্ম্মে বিদ্রোহী করিয়াছিল। শেষ এই দর্শন সাধারণ জন দ্বারা এতদূর আদৃত হইতে লাগিল, যে খ্রীষ্টধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাড়না ও নিগ্রহ দ্বারা ইহার প্রচার রোধ করিতে চেষ্টিত হইলেন। আরিস্টটলের দর্শন শাস্ত্র খ্রীষ্টধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া ইউরোপের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে স্থানপ্রাপ্ত হইল; এবং পরিশেষে যে খ্রীষ্টীয়ানেরা ইহার প্রচারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বয়ংই ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। আরবদিগের দ্বারা প্রচারিত দর্শন ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বস্থানে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল; আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা হইতে গণিত শাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ ইউরোপীয় অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইল। বর্ত্তমান ইউরোপে সর্ব্ব প্রথমে সেলার্নো নগরে এবিসেনার এক জন ইটালীয় ছাত্র একটি চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন। ঐ ছাত্র প্রাচ্যদেশে ৩৯ বৎসর চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। স্পেনের ইতিহাস লেখক প্রেসকট বলেন যে স্পেনের কাষ্টাইল ও ফ্রান্সের প্রভিন্স প্রদেশের সাহিত্য গভীর ও স্থায়িতর রূপে আরবী আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। গথিক নামক স্থাপত্য প্রণালীর উদ্ভব-স্থান বিষয়ে যে কএকটি মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে মত পূর্ব্ব দেশকে ইহার উদ্ভব ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত। সূচীর ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র খিলান এই গথিক প্রণালীর একটি প্রধান লক্ষণ। নবম শতাব্দীতে কেরো নগরে যে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে ঐ প্রকার একটি খিলান দৃষ্ট হয়। গৃহনির্ম্মাণে রঞ্জিত কাচ ব্যবহার, গবাক্ষোপরি সূক্ষ্ম কারকার্য্য, জ্যামিতি-বিবৃত আকৃতি সকলের ন্যায় শ্রমসাধ্য নানা রূপ চিত্র গথিক ও আরবীয় স্থাপত্যে দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ড্রেপার স্বপ্রণীত "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সিভালরি* প্রথা সর্ব্ব প্রথমে স্পেন দেশীয় আরবদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া ইউরোপে প্রচলিত হয়, একথা কতদূর যথার্থ আমরা বলিতে পারি না কিন্তু এই প্রথা স্পেনদেশীয় আরবদিগের মধ্যে অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

* মহত্ত্ব ও বীরত্ব সূচক কার্য্য করত দেশ পর্য্যটন স্ত্রীলোকের প্রতি গভীর সম্মান ও অনুরাগভাব প্রভৃতি গুণ জন্য অতীব গৌরবাস্পদ নাইট উপাধি প্রাপ্ত শিবালরি প্রথার প্রধান লক্ষণ ছিল।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪২২ সংখ্যক পত্রিকার ১২২০ পৃষ্ঠার পর।

(২২১)

ঈশ্বরকে কখন বিপদে পড়িতে হয় নাই, পড়িতে হইবেও না।

এরিষ্টাইডিস নামক সফিষ্ট।

(১২২)

যেমন পুত্র পিতা অপেক্ষা প্রধান নহে কিম্বা শিল্প-কার্য্য শিল্পকর অপেক্ষা প্রধান নহে তেমনি কোন বস্তু ঈশ্বর অপেক্ষা প্রধান নহে। তিনি আদি ও প্রধান পুরুষ এবং সকল ভূতের রাজা। তিনি আপনি আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহ বলিতে পারে না কখন তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। কারণ তিনি প্রথম অবধিই আছেন এবং চিরকালই আপনার পিতা আপনি থাকিবেন। তিনি এত মহৎ যে অন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন না।

ঐ

(১২৩)

ঈশ্বর সকল বস্তুর আদি এবং সকল বস্তু তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি অকাল পুরুষ, কাল জগতের সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে।

ঐ

(১২৪)

সকল বস্তু তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ আছে এবং তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতেছে। তিনিই প্রথমে প্রীতি ও নিয়ম এই দুই প্রবল বস্তু-বিধারক পদার্থ সৃষ্টি করিলেন যে সকল বস্তু তদ্দারা দৃঢ় সম্বন্ধে বিধৃত থাকিবে।

ঐ

(১২৫)

এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া রহিয়াছে, দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ সকল বস্তু তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর করিতেছে।

প্লোটাইনস

(১২৬)

যদ্যপি চিত্রকর, ভাস্কর, কবি এবং দার্শনিক এই রূপ বিভিন্ন বৃত্ত্যাবলম্বী লোকের একটী সভা আহ্বান করা যায় এবং তাহাদিগকে ঈশ্বর বিষয়ে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বলিতে অনুরোধ করা যায় তাহা হইলে তুমি কি মনে কর যে চিত্রকর এক রূপ বলিবে, ভাস্কর অন্যরূপ বলিবে, কবি অন্য রূপ বলিবে, দার্শনিক অন্য রূপ বলিবে, এমন কি, শক কিম্বা গ্রীক কিম্বা পৃথিবীর উত্তর সীমান্তবাসী অন্যরূপ বলিবে? অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্য পরস্পর বিরোধী বাক্য বলে. কাহার সহিত কাহারও ঐক্য নাই, কিন্তু এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সকলের রাজা ও পিতা, এই বিষয়ে দেখিবে সমস্ত পৃথিবীর এক মত। কি গ্রীক, কি বর্ব্বর, কি মহাদ্বীপবাসী, কি সমুদ্র উপকূলবাসী, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞ, সকলেই এই কথা বলিবে।

মেক্সিমস্ টাইরিয়স্।

(১২৭)

দেব দেবী আছে এবং জগতের উপর সেই সকল দেবতাদিগের নিয়ন্তৃত্ব আছে ইহা সকল সম্প্রদায়ে* বিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি তাহারা এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকারণকে স্বীকার করে এবং সকল স্থানের মনুষ্য বিপদ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দেবতা ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করে ইহার কারণ এই যে বহুত্ব অপেক্ষা একত্ব তাহাদিগের নিকট আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রোক্লস

(১২৮)

ঈশ্বর আরাধনার সময়ে আমরা তাঁহাকে

* লেখকের সময় পৃথিবীর এই ভাব ছিল।

এই প্রকারে প্রার্থনা করিয়া থাকি "প্রভু। আমাদিগের প্রতি করুণা কর।"

এপিকটিটস।

(১২৯)

যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, ভূমি, সমুদ্র, পৃথিবীর সকল স্থানের সাধারণ বস্তু কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে তেমনি এই সকল বস্তুর ব্যবস্থাকারী জ্ঞান স্বরূপ পদার্থ এবং সকল বস্তুর বিধানকর্ত্তা নিয়ন্তা পুরুষ এক, তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পূজার নিয়মানুযায়ী পৃথিবীর সকল স্থানে পূজিত হইয়া থাকেন।

প্লুটার্ক।

(১৩০)

এই বৃহৎ শোভন অট্টালিকারূপ জগৎ উহার স্রষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে অথবা তাঁহার স্বরূপ হইতে বিভিন্নভাবে স্থিতি করিতেছেন; তিনি এখনও সতন্ত্র ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার উপর নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন।

ঐ।

(১৩১)

ঈশ্বর তিনি যাঁহার সম্বন্ধে আমরা মনুষ্য কখন নীরব নহি. যাঁহা দ্বারা সকল বস্তু পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি সকল স্থানে আছেন ও সকল পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তাঁহার করুণা আমরা সর্ব্বদা উপভোগ করিতেছি যেহেতু আমরা তাঁহার সন্তান।

এরেটস্।

(১৩২)

তিনি জগতের চমৎকার পদার্থ এবং মনুষ্যের পরমার্থ।

ঐ।

(১৩৩)

ঈশ্বর সন্তোষ অধিরাজ। ঈশ্বর শান্ত স্বরূপ ও আশুতোষ।

ডিমডোনামক গ্রন্থ প্রণেতা।

(১৩৪)

ঈশ্বর সকল বস্তুর আদি, অন্ত ও মধ্য ধারণ করিতেছেন।

প্লেটো।

(১৩৫)

ঈশ্বর সকল মনুষ্যের এবং সমস্ত জগতের রাখাল।

অর্কিউস।

(১৩৬)

(ঈশ্বর স্ত্রীরূপে বর্ণিত)

সেই দেবাই ঈশ্বর, যিনি তোমাকে আমাকে এবং সকল মনুষ্যকে লালন করিতেছেন এবং যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সখ্যভাবে মিলিত করিয়া একত্রে কার্য্য করাইতেছেন।

ইউরিপাইডিস্।

(১৩৭)

আমি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিতেছি যে শরীর ও আত্মার পরস্পর বিচ্ছেদ অপেক্ষা তাহাদিগের সংযোগ কখন শ্রেয়স্কর নহে।

প্লেটো।

(১৩৮)

আমরা যে মনুষ্য, কেবল আমাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এমত নহে কিন্তু আমাদিগের উপরে দেবতাদিগের সঙ্গে এবং নিম্নে পশুদিগের সঙ্গেও আমাদিগের সম্বন্ধ আছে। যেহেতু একমাত্র পুরুষ শরীরস্থ আত্মার ন্যায় সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তাঁহার সকল অংশ এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

সেক্‌শটস এম্পিরিকিসোক্ত
পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ের মত।

(১৩৯)

পশুদিগের প্রাণ অথবা আত্মার কারণ কে? যে মহৎ পুরুষ সূর্য্য গ্রহ তারকাগণ বিশিষ্ট সমস্ত দ্যুলোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই তাহার কারণ।

এরিষ্টটেল।

ক্রমশঃ

EXTRACT.

INDIAN SYSTEM OF CASTE.

TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."

DEAR SIR,—With reference to the remarks which you made in your issue of Sunday last upon the paper of Babu Nobo Gopal Mitra on "Caste," lately read before the Social Science Association, and in which you recommend the absolute necessity of abolishing caste altogether, I deem it neccessary to make the following observations.

Caste must exist in one form or other in every country. A rich merchant of England will not dine with, or marry his daughter to, an artisan, however well-to-do, honest, virtuous and pious the latter may be. Even a rich goldsmith of England will not dine with a very poor one, though a member of his own trade, on terms of social equality which is however not the case in India. Here a rich goldsmith will gladly dine with his caste-men, however poor the latter may be. It is, therefore, evident that caste must exist in some shape or other in every country, if not in the form in which it exists in India, at least in the form of the *caste of wealth*, whose demands are no less rigorous and exacting than those of the Indian system of caste. The American ladies in Dickens' novel, who had been all along honoring Martin Chuzzlewit as a great man, uttered a shriek of horror when they heard that he had come as a deck-passenger on board the ship in which he had sailed over from England to America. The influence of the caste of wealth is ably illustrated by the powerful pen of Dickens in this story. If caste must exist in a certain form in every country, what objection there could be to the Indian system of caste, which is founded on the feeling of respect and veneration for learning, piety and virtue? That the Indian system of caste is founded on such respect and veneration is evident from pious and learned Brahmins being more respected than those who betake themselves to worldly occupations. The learning taught or acquired by Brahmins in India, may not be of the same character as is cultivated in Europe. The present race of Brahmins may be more degraded than that of ancient times. Europeans may consider the piety of a Brahmin to be of a superstitious character, but they must still recognize as noble the *principle* on which the Indian system of caste is founded, that is, the principle of paying respect to piety and learning. Inordinate respect for wealth makes the mind mean and sordid, while such respect for piety and learning ennobles it. I admit that some evil consequences have resulted from the institution of caste in India, but still the foundation on which the superstructure is built must be considered to be nobler than that on which the caste system of Europe rests. No country, I repeat, can exist without distinctions of caste. If we abolish our present system of caste, it is sure to be succeeded by a worse one, that is, the caste of wealth, from the evils of which Europe and America are now suffering. Certainly the aristocracy of piety and learning is preferable to the aristocracy of wealth. We can improve the present system of caste, but should not abolish it altogether. As society improves, the Brahmins of India may be gradually expected to improve also as a class. If proper encouragement be held out to students of *toles*, they may be expected to combine vernacular learning with Sanskrit. Vernacular learning of the present day will give them an insight into the history, the science and the philosopy of Europe. As Theism makes progress in the country, learned Brahmins may be expected to make a full profession of Brahmoism, they being now half Brahmos, the name of Brahma being used in almost all the *mantras* repeated by th
especially the *Gayatri*. You must admit the
advantages of the existence in the country of a class of men solely devoted to the profession of religion and learning. If the existence of such a class be necessary, why not improve the indigenous one already
em
is paid to Brahmins, is gradually disappearing with the progress of education and enlightenment. The reforms which I have mentioned above have already begun to manifest themselves, though in a faint degree, in that body, I know of some learned Bhattacharyas being good vernacular scholars and of others giving theistic *mantras* to their *sishyas*. For the reasons stated above, the necessity of a learned *caste* in the country to counteract the effects of the *caste* of wealth, which will undoubtedly arise in it with the influx of European civili-

zation, must be admitted. The Brahmins, from their antecedents, pursuits and superior intelligence to the rest of the community of which more anon, are entitled to constitute, and already do constitute, that caste.

Proceeding on Darwin's Theory of Natural Selection, Galton, the learned author of the "Theory of Development," recommends the introduction of the custom of intelligent men marrying intelligent women with the view of preventing the occurence of dearth of talent in a country, which is now complained of by Englishmen as having already set in in theirs. In our country the custom already exists, men of the higher castes being the intelligent among the people, and invariably marrying into their own caste We find men of the higher castes succeed in obtaining the university degrees of India, and those England-going Natives, who obtain success in the examinations in England, are also generally high caste men. High caste men are generally found to rise to the highest posts in the service of Government, through the natural buoyancy of their hereditary genius and talents. The most successful Pleaders of the High Court are all high-caste men. The greatest religious and social reformers of our country, as well as the most eminent English scholars, have been Brahmins Chaitanya was a Brahmin, Rammohun Roy was a Brahmin, Debendra Nath Tagore is a Brahmin, Iswara Chunder Vidyasagar is a Brahmin, Ram Tanu Lahiri is a Brahmin, and Krishna Mohun Banerji is a Brahmin. When we want to abolish caste altogether, we should consider the mischief that we might commit by abolishing a system that prevents the occurrence of dearth of talent in a country.

Caste might be used as a powerful instrument for the moral improvement of the country. A generation or two ago, adulterers and drunkards in a village were punished by social excommunication. This acted as a great moral deterrent. If the bonds of society were not relaxed under the influence of European education and civilization, the custom of punishing drunkards by social ex-communication would have still existed and prevented the baneful practice of drinking that is awfully increasing in the country. Let the members of a caste punish the immoral men of their caste with social ex-communication, and then you will see what salutary consequences flow from the preservation of the institution of caste. A European writer in the *Statesman*, in his description of Assam, published in that journal about a year ago, says:—"It is surprising what an influence caste has amongst those half-savage people. It is the greatest moral ruler without which the country would be a moral pest-house, it possesses an influence for good which one does not find in other lands under their vaunted civilization and religious culture."

The present system of caste certainly admits of modifications. For instance, the subcastes, that is, the castes within a caste, may be abolished with advantage, and the extremely rigorous rules about dining with people of other castes, may be also relaxed with benefit to society We can also follow other professions than our hereditary ones, if necessity requires us to do so; but the system of caste should not be materially changed for the reasons stated above.

One of the evils, that are now afflicting our country, is that people do not think independently, but judge of things through an English medium. We should not permit European civilization to make us totally blind to the benefits of Native institution, and allow the tide of reformation that has set in in the country to wash away whatever there is of good in the venerable institutions of our forefathers. We should say to it:—"Thus far shalt thou come and no further."

Yours &c.,
BOSE.

The 3rd September, 1878.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইবে।
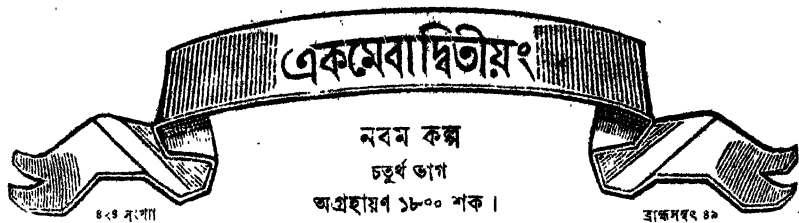
শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

Registerd No 52.

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বর-প্রীতি।

যখন জগতে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখও আছে, আর সে দুঃখের পরিমাণ অল্প নহে, তখন ঈশ্বরকে আমরা কি প্রকারে প্রীতি করিতে পারি? সংশয়বাদীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, ঈশ্বরবাদীরা তাহার এইরূপ প্রত্যুত্তর দেন যে আনুসঙ্গিক দুঃখ ঘটিলেও যখন প্রত্যেক সাধারণ নৈসর্গিক নিয়মের উদ্দেশ্য মঙ্গল, তখন ঈশ্বরকে অবশ্য মঙ্গলময় পুরুষ বলিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতি এরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করে না। যদি কেবল উপকারের জন্য ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হয়, তবে যখন তিনি দুঃখ প্রদান করিতেছেন তখন তাঁহার কার্য্যের সাধারণ উদ্দেশ্য মঙ্গল হইলেও তিনি কিরূপে সম্পূর্ণ প্রীতির পাত্র হইতে পারেন? ঈশ্বর-প্রীতি তর্ক ও যৌক্তিক-প্রমাণ-জনিত নহে। উহা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ়-সম্বন্ধ-জনিত। ঈশ্বরকে আমরা ভাল না বাসিয়া কখন থাকিতে পারি না। ভ্রমর যেমন পদ্মকে স্বভাবতঃ প্রীতি করে, বুলবুল যেমন স্বভাবতঃ গোলাবকে প্রীতি করে, পতঙ্গ যেমন স্বভাবতঃ দীপ্তাগ্নিকে প্রীতি করে, ঈশ্বরকে আমরা সেইরূপ স্বভাবতঃ প্রীতি করি। ঈশ্বর যদি আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করেন এবং চিরকালই যদি সেইরূপ দুঃখ প্রদান করেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারি না। কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জীবিত জীবের প্রাণন ক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় তাহা অবধারণ করিবার জন্য তাঁহার কুক্কুরকে একবারে মারিয়া না ফেলিয়া তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পাদন করিতেছিলেন। কিন্তু এমত উৎকট যাতনার সময়েও প্রভুভক্ত কুকুর তাহার প্রভুর হস্ত লেহন করিতেছিল। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের প্রীতিও এই প্রকার। কিন্তু পরমেশ্বর উক্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় নির্দ্দয় নহেন। তিনি আমাদিগের মঙ্গলময় পরম পিতা ও সুহৃৎ। কোন ঈশ্বর-ভক্ত বলিয়াছেন "ঈশ্বর আমাকে বলিলেন তোমাকে কাটিয়া ফেলিব কিন্তু দেখিলাম এই কথা বলিবার সময়েও ভিতর ভিতর আমার প্রতি তাঁহার প্রেম দৃষ্টি আছে"। ঈশ্বরের কোন কোন

কার্য্য আপাততঃ অতিশয় নির্দয় বোধ হয়, কিন্তু যুক্তি নয়, আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে তাঁহার উদ্দেশ্য মঙ্গল। অবিচলিত চিত্তে সেই আপাত-প্রতীয়মান নির্দ্দয়তা সহ্য করিতে হইবে। যদি ঈশ্বরের বিশ্বজনীন মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহা করা কর্ত্তব্য। কেবল "করা কর্ত্তব্য" নহে। বস্তুতঃ ঈশ্বর-ভক্ত এইরূপ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার প্রিয়তম তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করিলেও তিনি তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পতঙ্গ জানে যে দীপ্তাগ্নিতে পতিত হইলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে তথাপি তাহাতে পতিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতির অনেক দাবিদার আছে কিন্তু দীপ্তাগ্নির প্রতি পতঙ্গের যেরূপ প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি সেরূপ প্রেম কয়জন লোকের দৃষ্ট হয়?

ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্মের প্রাণ।

ঈশ্বর-প্রীতি পরোপকারাদি সৎকার্য্যের প্রাণ-স্বরূপ। জগতের উপকার সাধনের মূলে যদি ঈশ্বর-প্রীতি না থাকে তাহা হইলে সেই উপকার-সাধন-ব্রত জীবনশূন্য হয়। যদি ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা কোন ব্যক্তি উত্তেজিত না হয়েন তবে তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সহস্র কষ্ট ভোগ করিয়া চিরকাল কি প্রকারে পরের উপকার সাধন করিতে পারেন? যখন সহস্র প্রতিবন্ধক দ্বারা আমাদিগের সাধু চেষ্টা প্রতিহত হয় তখন মন নিরাশ-পঙ্কে পতিত হয় কিন্তু সেই সময়ে যদি আমরা মনে করি যে সেই পরম প্রেয়াস্পদ আমাদিগের সাধু-চেষ্টার জন্য আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন তখন মনে নূতন জীবন ও নূতন স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়।

ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্মপ্রচারের প্রাণ-স্বরূপ। সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জন্মভূমি ও প্রিয়জনদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকের পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করত ধর্ম্ম-প্রচারে ধর্ম্ম-প্রচারককে কে প্রবৃত্ত করে? ঈশ্বর-প্রীতিই প্রবৃত্ত করে। ধর্ম্ম-প্রচারের সময় এমন এক এক বার ঘটে যে আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু শরীর আর পারিয়া উঠে না তখন প্রচারকের মনকে নবোৎসাহে উৎ-সাহিত করিয়া প্রচার-কার্য্যে প্রাণ সমর্পণ করিতে কে প্রবৃত্ত করে? ঈশ্বর-প্রীতিই করিয়া থাকে। যাঁহার মনে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম উদিত হয় নাই, তিনি যেন ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়েন।

ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্ম-সমাজ-বন্ধনের একমাত্র উপায়। হাজার নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী সংস্থাপন কর যদি ঈশ্বর-প্রীতি না থাকে, এবং সেই সাধারণ প্রেমাস্পদকে প্রীতি নিবন্ধন আমাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আন্তরিক প্রীতি না থাকে, তবে ধর্ম্মসমাজ কোন মতেই বাঁধা হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই বল, ধর্ম্ম-প্রচারই বল, ধর্ম্মসমাজ বন্ধনই বল, সকলের মূল ঈশ্বর-প্রীতি বলিতে হইবে।

আন্দামানদ্বীপবাসীদিগের বৃত্তান্ত।

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে আন্দামান নামক কতিপয় দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপপুঞ্জ তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত। উহার অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যে আবৃত। তথাকার অধিবাসিরা নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য, এই জন্য এত দিন তাহারা সভ্যসমাজে সম্পূর্ণ রূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে পোর্ট ব্লেয়ার নামক দ্বীপটী অপরাধিদিগের নির্ব্বাসন-ভূমি রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। উহা আন্দামান

দ্বীপের ঠিক্ দক্ষিণাংশে প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রে আন্দামান দ্বীপবাসীদিগের রীতি চরিত্র কিয়দংশে অবগত হওয়া যায়। সাধারণত ঐ অসভ্য জাতির নাম আন্দামানী। উহাদের বাহ্য আকার অতি কদর্য্য ও ভীষণ, দেখিলে কোন আগন্তুক লোকের নিশ্চয়ই ঘৃণা ও ভয় উপস্থিত হয়। উহারা এক সময়ে নরমাংসাসী রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তন্নিবন্ধন কেহই সাহস করিয়া ঐ দ্বীপে পদার্পণ করিত না। অধিক কি, সামুদ্রিক নাবিকেরাও ঐ স্থানটী দূরে রাখিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু আন্দামানবাসীরা যে নরমাংসাসী নয় এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। উহাদের বাসগৃহ যৎসামান্য কুটীর মাত্র। উহা তালপত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়। ঐ পর্ণকুটীরের ইতস্ততঃ ভক্ষ্য পশুপক্ষী ও মৎস্যের অস্থি এবং শম্বুক সকল স্তূপাকার থাকে। যখন ইহার পূতিগন্ধ অতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠে তখন উহারা বাসগৃহ স্থানান্তরিত করে। আন্দামানিরা কিছু খর্ব্বাকার, কিন্তু প্রায় সর্ব্বদাই উলঙ্গ থাকে; কখন কখন বা বৃক্ষের বল্কল লইয়া মস্তক গ্রীবা ও কটিদেশ বন্ধন করে। ইহারা স্বয়ং দিগম্বর এই জন্য অন্য জাতীয় কোন ব্যক্তির পরিচ্ছদ দেখিলে অত্যন্ত ঘৃণা ও হাস্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের স্ত্রীজাতি উলঙ্গ থাকে না। তাহাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। তাহারা বৃক্ষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বল্কল পরিধান করে। ঐ বল্কলের সূত্র সকল আজানু লম্বমান হইয়া চন্দ্রাতপের ঝালরের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের অলঙ্কারের মধ্যে গলদেশে অস্থিমাল্য ও পৃষ্ঠে লম্বিত বল্কল। এই জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই রক্তবর্ণ এবং ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। ঐ মৃত্তিকা লৌহখনি হইতে উদ্ধৃত, উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ হয়। আন্দামানবাসীরা বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গরাগ রচনা করিয়া থাকে। উহাদের মস্তক সততই মুণ্ডিত, কিন্তু মস্তকের মধ্যভাগ হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত রেখাকার কতকগুলি কেশ রক্ষিত হয়। তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড কিম্বা ভগ্ন কাচ উহাদের কেশচ্ছেদন করিবার অস্ত্র। যুবতীদিগের কেশধারণ করিবার রীতি আছে কিন্তু বৃদ্ধা স্ত্রীরা প্রায়ই মস্তক মুণ্ডন করে। পুরুষেরা শ্মশ্রুবিহীন; এমন কি, ভ্রুযুগলেও কেশ রক্ষা করে না। আণ্ডামান দ্বীপে এত অধিক দংশ মশকের উপদ্রব যে কেশবিহীন না হইলে ঐ সমস্ত কীট সতত মনুষ্য-শরীরে গিয়া বাস করে। আন্দামানিদিগের সর্ব্বশরীরে বিচিত্র উল্কী। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই উহারা সর্ব্বাঙ্গ উল্কী দ্বারা চিত্রিত করিয়া থাকে। এই উল্কী-গ্রহণের প্রক্রিয়া অতি নিষ্ঠুর। তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড কিম্বা ভগ্ন কাচ দ্বারা গাত্রের ত্বক প্রায় এক বুরুল বিদ্ধ করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই দেহের অপূর্ব্ব শ্রী সাধন হইয়া থাকে; কিন্তু উহারা ব্রহ্মদেশীয়দিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে মূর্ত্তি অঙ্কিত করে না। উল্কী-গ্রহণ কালে উহাদের দেহ হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয় কিন্তু তাহারা ঐ রক্তপাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত হইলে পর উহাদের বিবাহে অধিকার জন্মে। কিন্তু যত দিন না প্রতিপালনে সক্ষম হয় ততদিন তাহারা বিবাহ করে না। উহাদের মধ্যে অধিবেদন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের নিয়ম ও প্রণালী অতি সামান্য। কোন যুবা প্রথমত ভিন্ন বংশীয় কোন কামিনীকে মনোনীত করিয়া তাহার পিতা মাতার সম্মতি গ্রহণ করে। পরে বিবাহের দিবস পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক

পৃথক পৃথক বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্-কালে সম্প্রদাতা কন্যার হস্তের সহিত বরের হস্ত মিলিত করিয়া দেন। তখন নব-বিবাহিত দম্পতী কাননমধ্যে রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত নির্গত হয়। পরে প্রত্যাগমন করিলে সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব আনন্দ-ধ্বনি ও নৃত্যগীত উৎসব সহকারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর বিবাহিতা স্ত্রী ভর্ত্তৃগৃহে উপস্থিত হইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ঐ সমস্ত গার্হস্থ্য কার্য্য শ্রমসাধ্য হইলেও তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা বহন করিয়া থাকে। পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ও গৃহের অবান্তর সমস্ত কার্য্য তাহাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। উহারা শম্বুকাদি জল জন্তু সংগ্রহ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া প্রতি দিবসই সমুদ্র-তীরে গমন করে। পরে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সংগৃহীত শম্বুক এবং মৃগয়ালব্ধ বন্য পশু-মাংস রন্ধন করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীর মস্তক মুণ্ডন ও খনিজ মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গ-রাগ রচনা করিয়া দেয় এবং শয়নোপযোগী মাদুর প্রস্তুত করে। আন্দামানদ্বীপে বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ অবৈধ নহে; এমন কি, তাহারা স্বামীর মৃত্যুর এক মাস মধ্যেই বিবাহ করিয়া থাকে। কামিনীগণ প্রসবান্তে শিশুসন্তানকে প্রথমতঃ শীতল জলে স্নান করাইয়া পরে অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত করে। এই নিয়ম তাহাদের মধ্যে অতিশয় আদৃত, কারণ শীত উত্তাপাদি সহিষ্ণুতা যৌবনে অতিমাত্র বলাধানের কারণ হয়, ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহাদের পুত্রবাৎসল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। স্ত্রীলোকেরা শিশুকে পৃষ্ঠে লইয়া এতদ্দেশীয় নাগপুরের পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় সতত বিচরণ করে। আন্দামানদিগের মধ্যে নামকরণ-প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা বংশের এক ব্যক্তির নাম ধরিয়া পুত্র কন্যার নাম রাখে, কিন্তু তাহাদিগের ভাষায় নামের সংখ্যা অল্প থাকায় প্রভেদ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত নূতন নামের অগ্রে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সূচক কোন শব্দ প্রয়োগ করে। ইহাদের বালক বালিকারা জলে ও জঙ্গলে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রায়ই অকাল-মৃত্যু সহ্য করিতে হয়; এমন কি, আন্দামানিগণের মধ্যে দুই বা তিনটির অধিক সন্তান কাহারও জীবিত থাকে না। ফলত উহাদের মধ্যে কেহই সুস্থ ও দীর্ঘজীবি নহে। অনেকেই ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। ঐ স্থান অত্যন্ত জঙ্গলময়, উহারা নিরবচ্ছিন্ন তথায় বাস করিয়া ভয়ানক জ্বরে সতত আক্রান্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও সামুদ্রিক তীব্র বায়ু তাহাদিগের শরীর ত্বরায় জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে। বর্ষাকালে দুরন্ত জ্বর ও উদরের পীড়া অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু উৎকট পীড়ার সময়েও আন্দামানিরা কদাচ কোন রূপ ঔষধ সেবন করে না। তাহারা কেবল রক্তবর্ণ মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করাকেই প্রধান ঔষধ বলিয়া মনে করে, সুতরাং অকাল মৃত্যু তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিচরণ করিয়া থাকে। এই অকাল-মৃত্যু জন্য তাহাদিগের সংখ্যাও বিরল। মৃত্যুর পর আন্দামানবাসীরা মৃত দেহ মৃত্তিকা মধ্যে সমাধি করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়গণ মৃত দেহ পত্রাবৃত করিয়া বৃক্ষত্বকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া বন্ধন করে। পরে এক হস্তপ্রমাণ গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক শবকে উপবেশন করাইয়া পূর্ব্বাস্যে রক্ষা করে। অনন্তর মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা ঐ দেহ প্রোথিত করিয়া তদুপরি বারিপূর্ণ একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে প্রেতাত্মা রজনীতে ঐ জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিয়া

থাকে। তাহাদের মধ্যে যদি কোন মণ্ডলাধিপতির মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার সমাধির উপর পুষ্পমালা ও প্রজ্বলিত অগ্নি স্থাপন করা হয় এবং তাহার দেহ সমাধি করিবার অগ্রে সকলে সমবেত হইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। আন্দামানবাসীরা শ্মশান স্থানে বাস করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, কারণ তাহারা প্রেতযোনিকে অত্যন্ত ভয় করে। কিন্তু কোন ভিন্ন জাতীয় লোকের মৃত্যু হইলে তাহার মৃত দেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তাহার প্রেতযোনিকেও ইহারা ভয় করে না। এই অসভ্য জাতি ধর্ম্মশূন্য নহে। ইহারা প্রতিপদের দিন চন্দ্রকলা দর্শন করিয়া তাহাকে আবাহন পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিয়া থাকে।

আন্দামানদ্বীপে শস্যোৎপাদনের রীতি নাই। অধিবাসীদিগের মৃগয়ালব্ধ গণ্ডার, সমুদ্রের মৎস্য, কূর্ম্ম ও শম্বুকাদি জীব এবং ফল মূল প্রধান উপজীবিকা। বন্য জন্তুর মধ্যে বরাহ-মাংসকে তাহারা অতিশয় প্রীতিপ্রদ বোধ করে। শীতকালই মৃগয়ার প্রশস্ত কাল। উহারা মৃগয়া-কালে ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিয়া থাকে। শুক্ল পক্ষে মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু সকল অধিক পরিমাণে ধৃত হয়, কিন্তু তাহারা উহা শুষ্ক বা লবণ-মিশ্রিত করিয়া রাখে না, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। এই জাতি সন্তরণে বিলক্ষণ পটু। ইহারা জাল বা টাঁটা দ্বারা মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং সমুদ্রোপরি বিচরণ করিবার নিমিত্ত শালতি বা ডোঙ্গা ব্যবহার করে। মৎস্য ধরিবার প্রণালীও ইহাদের অতি সহজ। ইহারা শালতী বা ডোঙ্গায় আরোহণ করিয়া লৌহফলকযুক্ত টাঁটা লক্ষ্যের উপর নিক্ষেপ করে। পরে লক্ষ্য বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ লৌহফলক বংশদণ্ড হইতে পৃথক হইয়া যায়, কিন্তু লৌহ-ফলকের সহিত একটী সুদীর্ঘ সূত্র সংযুক্ত থাকাতে বিদ্ধ মৎস্য সহজেই গৃহীত হয়। উহারা এই কার্য্যে এমনি সুদক্ষ যে উহাদিগের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত মধুক্রম ভগ্ন করিবার কালে এই অসভ্যদিগের বিশেষ কৌশল দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা মধুমক্ষিকাদিগের প্রাণ নষ্ট করে না। প্রথমত সকলে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ চর্ব্বন করে। পরে তাহার রস মুখমধ্যে পূর্ণ করিয়া ফুৎকার দ্বারা মক্ষিকাদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ উদ্ভিদ্-রসের মাদকতা শক্তি আছে। মধুমক্ষিকাগণ তৎপ্রভাবে উন্মত্ত হইয়া উড়িয়া যায়। ইত্যবসরে ঐ জাতীয়েরা সহজে মধুক্রম ভগ্ন ও মধুসংগ্রহ করে। ইহারা কি পশুমাংস, কি মৎস্য, কি ফল মূল, সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কিম্বা পাক করিয়া ভোজন করে। অপক্ক বা অগ্নিসংস্কার ব্যতীত প্রায় কোন দ্রব্যই ইহারা ব্যবহার করে না। আন্দামানবাসীরা অতিশয় সুচতুর। তাহাদিগের স্মরণ-শক্তি বিলক্ষণ আছে। ভিন্ন দেশবাসীরা উহাদিগকে যে নামে আহ্বান করিয়া থাকে উহারা তাহা কিছুতেই বিস্মৃত হয় না। বহু দিবসের পর যদি কোন বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে উহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকে। শত্রুর সহিত সম্মিলন হইলেও এই রীতি অনুসৃত হয়। তন্মধ্যে কামিনীগণ সর্ব্বাগ্রে অশ্রুপাত করে, পরে সকলে একত্রিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে থাকে। নৃত্য ও সঙ্গীত তাহাদিগের অতিশয় আদরণীয়। কোন আনন্দোৎসবে রমণীরা প্রথমে নৃত্য করে। পরে পুরুষেরা সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া করতালি-যোগে নৃত্য করিতে থাকে।

আন্দামানবাসীদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে শালতি ও ধনুর্ব্বাণ সর্ব্বপ্রধান। ইহারা

সমুদ্রোপরি বিচরণ করিবার নিমিত্ত শালতি ব্যবহার করিয়া থাকে। উক্ত জলযানের সৌন্দর্য্য সম্পাদনের জন্য উহার পার্শ্বদেশ চিত্র বিচিত্র করা হয় এবং অত্যন্ত ভঙ্গুর বলিয়া যত্নের সহিত তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। শালতি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, বিংশতি ব্যক্তি উহাতে অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে এবং ত্রিশ জনের খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ করিলেও উহা ভারাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয় না। মৎস্য ও কচ্ছপ ধরিবার জন্য ঐ শালতি সততই ব্যবহৃত হয়। এতৎ ব্যতীত সমুদ্রোপরি গমনাগমনের নিমিত্ত আর উপায় নাই। আন্দামানদ্বীপবাসীরা শরনিক্ষেপে এমন নিপুণ যে তাহাদিগের সন্ধান কখন ব্যর্থ হয় না। উহাদিগের ভাষা অতি গ্রাম্য ও অসভ্য। শব্দের স্বল্পতা নিবন্ধন ঐ ভাষা বিদেশীয় ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ ভাষার মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকায় তাহাদিগের গণনীয় বস্তুর সংখ্যা কোন রূপে বুঝা যায় না। ঐ ভাষা তাহাদিগের স্বজাতীয়ের মধ্যেও আবার এত বিভিন্ন যে পূর্ব্ব আন্দামানবাসীরা দক্ষিণ আন্দামানের কথা বুঝিতে পারে না। লেখা তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। তাহারা অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয় এবং লিপি দ্বারা ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্যের লেখা দর্শনে হাস্য করিয়া থাকে।

মানব জাতির প্রাচীনত্ব

মনুষ্য সর্ব্ব প্রথম কোন্ সময়ে, কোন্ অবস্থায় এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিল তদ্বিষয়ে এত দিন কেহই কিছু স্থির করিতে পারে নাই। হিন্দু, ইহুদি, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য জাতিরা এই বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তাঁহারা অনুমান ও কল্পনা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্ব স্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বর্ত্তমান খ্রীষ্ট্রীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত সকলে ঐ প্রাচীন মতেরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন সেই সমস্ত অপসিদ্ধান্ত অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যতীত আর কেহই সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। এক্ষণে অনেক সূক্ষ্মবুদ্ধি সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত ভূতত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন ও উন্নতি সাধন করিতেছেন। এই ভূতত্ত্ব বিদ্যার আবির্ভাবে মনুষ্যের উৎপত্তিকাল বিষয়ক প্রশ্নটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতিতে নির্ণীত হইতেছে। এই বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আদিম অবস্থা এবং মনুষ্যের পুরাতত্ত্বসংক্রান্ত অনেক বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে। ঐ সমস্ত যুক্তিপ্রসূত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে কৃতবিদ্যগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ কিম্বা গ্রীক ও রোমকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত অনুমান ও কল্পনা-প্রসূত মনুষ্যের উৎপত্তি ও আদিম বৃত্তান্ত আর কেহ বিশ্বাস করেন না। এক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞানসিদ্ধ মতটি কি তাহাই আমরা এই প্রস্তাবে বিবৃত করিব।

আমরা ভূতত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যে জানিতে পারি যে এই পৃথিবী এক কালে ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয় নাই। আমরা পৃথিবীকে এখন যেরূপ দেখিতেছি চিরকাল ইহা এরূপ ছিল না। ইহা যে কত সহস্র সহস্র পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে তাহা স্থির করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। এই পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে যে জীব আবির্ভূত হয় তাহা মনুষ্য নহে, মনুষ্যের আবির্ভাব-কালের বহু পূর্ব্ব হইতে

নানা প্রকার জীব জন্তু যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া এই পৃথিবীতে বাস করিয়াছিল। সেই সমস্ত জীব জন্তুর বংশ অতীতের গর্ভে ধ্বংস হইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে মনুষ্যের জন্ম কাল পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় সহস্র বৎসর বলিয়া যে নির্দিষ্ট আছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, মনুষ্য এই পৃথিবীতে বহু সহস্র সহস্র বৎসর হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিদেরা যে সকল যুক্তি ও কারন দেখাইয়া থাকেন আমরা এক্ষণে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করিব।

পরলোকগত বিখ্যাতনামা ইংরাজ ভূতত্ত্ব বিদ্যাবিৎ মহাপণ্ডিত সার চার্লস লায়েল স্বপ্রণীত "মানবজাতির প্রাচীনত্ব" নামক গ্রন্থে মনুষ্য যে বহুকাল হইল এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি কোন ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। দেনমার্ক, সুইজরলণ্ড, ইতালী, আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি দেশের ভূগর্ভ খনন করিয়া যে কয়েকটি স্তরের নিম্নে মনুষ্যের অস্থি ও মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নানা অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন সে সকল স্তর প্রস্তুত হইতে বহু সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে তৎকালীন মনুষ্য মৎস্য ধরিত, কৃষিকার্য্য করিত ও বস্ত্র-বয়ন অভ্যাস করিয়াছিল। ঐ স্তরের অধস্তন আরও দুই এক স্তরের নিম্নে মাষ্টোডন ও এল্ক নামক পশুর মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহার সঙ্গে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য নানা প্রকার অস্ত্রও পাওয়া যায়। লায়েল সাহেব আরও নিম্নতম স্তরে মনুষ্যের অস্থি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ স্তর রচিত হইবার কালেও মনুষ্য বর্ত্তমান ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সার জন লবক, ফ্রান্সের দেসনয়ার, ষ্টীনষ্ট্রপ, ও বুর্গয় এবং ইতালীর রেমোরিনো প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদেরা সার চার্লস লায়েল যে সকল মতে উপনীত হন সেই সকল মত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সার চার্লস লায়েল তৃতীয় সংখ্যক স্তরের নব (Pliocene) ভাগে মনুষ্যের অবস্থিতির যে নিদর্শন পাইয়াছেন, সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ সারজন লবক যিনি কোন বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কোন রূপ মতামত প্রকাশ করেন না তিনি ঐ স্তরের তদপেক্ষা নিম্ন অর্থাৎ মধ্য (Miocene) ভাগে মনুষ্যের অবস্থিতির বিশেষ নিদর্শন পাইয়াছেন। এসিয়া খণ্ডে মনুষ্য সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপ খণ্ডে যে স্তরে মনুষ্যের অবস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায় সেই স্তর তুষার-প্রধান-কাল অর্থাৎ যে কালে পৃথিবীর দক্ষিণভাগ বরফে আবৃত ছিল সেই কালে সর্ব্বোপরিস্থ ছিল। লায়েল প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদেরা বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐকাল বর্ত্তমান শতাব্দীর আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ছিল। অতএব ইউরোপ খণ্ডে মনুষ্য আট লক্ষ বৎসর হইল সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়। এইরূপ ভূতত্ত্ববিদ্যার চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা মনুষ্য জাতির প্রাচীনত্বের অসংখ্য নিদর্শন পাইয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যা যতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাতে উহা মনুষ্যজাতির উৎপত্তির সময় যে সাধারণ-বিদিত সময় অপেক্ষা বহুকাল পূর্ব্বে তাহা বিশেষ রূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা ভূততত্ত্ববিদ্যা সুচারুরূপে অধ্যয়ন না করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট মনুষ্য জাতি এই পৃথি-

বীতে আট লক্ষ কিম্বা দশ লক্ষ বৎসর বাস করিতেছে, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিরা যদ্যপি ঐ বিদ্যা ও উচ্চ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন ও বুঝিতে পারিবেন যে আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে মনুষ্যের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে ইহা অলৌকিক ও অসম্ভব কথা নহে। ভূতত্ত্ব বিদ্যাবিৎ বৈজ্ঞানিকগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অসম্ভব বলিয়া স্থির করিবার অগ্রে আমরা যেন তাঁহাদিগের প্রদত্ত কারণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।

এক্ষণে আমরা আদিম মনুষ্যের অবস্থার বিষয় কিছু বলিব। আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তুষার-প্রধান কালে যে সকল মনুষ্য ছিল তাহাদিগের অবস্থার বিষয় জানিবার আমাদিগের কোন উপায় নাই। কিন্তু আট নয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তরের কাল (Stone Age) পিত্তলের কাল (Bronze Age) প্রভৃতি কালের মনুষ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল ভূতত্ত্ববিদেরা তদ্বিষয়ে অনেক জানিতে পারিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিদেরা যে সময়কে প্রস্তরের কাল (Stone Age) আখ্যা দিযাছেন সেই কাল দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রথম পুরা-প্রস্তর (Pleiolithic) ও দ্বিতীয় নবপ্রস্তর (Neolithic) কাল। পুরা-প্রস্তর কালের যে সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে সে সকল অস্ত্র সুচারুরূপে গঠিত নহে। আর নব-প্রস্তর কালের যে সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে সে সকল অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত ও গঠিত। স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে এই কালে কোন খনিজ ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, কেবল প্রস্তর বহুল রূপে পাওয়া যাইত। অতএব তৎকালীন মনুষ্যেরা তাহাদিগের আবশ্যক অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করিত। এই কালের পরবর্ত্তী কালকে ভূতত্ত্ববিদেরা পিত্তলের কাল (Bronze Age) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই কালে পিত্তল বহুল রূপে পাওয়া যাইত। এই কালের পিত্তল-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও ভূতত্ত্ববিদেরা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুইজারলণ্ডের হ্রদনিবাসীদিগের বাসস্থানের চিহ্ন যে স্তরে পাওয়া যায় সেই স্তর নব প্রস্তর কালের সমকালবর্ত্তী। হ্রদনিবাসীদিগের বাসস্থানের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত নানা অস্ত্র ব্যতীত মৃত্তিকানির্ম্মিত কৃষিকার্য্যোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ও চিত্রিত নানা প্রকার মৃণ্ময় পাত্র পাওয়া গিয়াছে। সুইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীদিগের ব্যবহৃত যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। তাহারা কেবল হ্রদস্থ মৎস্য ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিত না। তাহারা কয়েক প্রকার শস্য বিশেষতঃ মিসরদেশীয় গোধূম উৎপাদন করিত। তাহারা যে প্রকার রুটি প্রস্তুত করিত তাহার ও নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহারদিগের সময়ে সেও, নাসপতি, জাম, মটর, ও রেস্পবেরি, হেজেলনট, বিচনট প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল উৎপন্ন হইত। তাহারা কৃষিকার্য্য করিবার জন্য কি প্রকার অস্ত্র সকল ব্যবহার করিত তাহা জানিবার উপায় নাই। তৎকালের যে সকল পশুর অস্থিময় দেহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাদিগের নাম সারজন লবক উল্লেখ করিয়াছেন। বন্য পশুর মধ্যে ভল্লুক, ব্যাঘ্র, শৃগাল, বিবর, হরিণ, এল্‌ক জাতীয় হরিণ, বাইসন, বন্য বরাহ, নকুল, বন্য বিড়াল, ও গন্ধকোকুল, এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে ঘোটক, গাভী, ছাগল, মেষ ও কুক্কুর। উপরোক্ত বন্য পশু সকল প্রস্তরের কালে অধিক সংখ্যক ছিল। কিন্তু পিত্তলের কালে হরিণ ব্যতীত অন্য কোন বন্য

পশু ছিল না। কত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত প্রস্তরকালে সুইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীরা বর্ত্তমান ছিল তাহা কয়েকটি ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মরলো বলেন যে ইহারা ৬৪০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং গিলিরোঁ বলেন যে ইহারা ৬৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। সার জন লবক বলেন "মরলো ও গিলিরোঁ নামক ফরাসীস বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের সিদ্ধান্তে সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে ৬০০০ কিম্বা ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে সুইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীরা বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু কত কাল তাহারা ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া পরে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তাহা আমরা কোন রূপেই নিশ্চয় করিতে সমর্থ নহি।"

দেনমার্কের কিচেনমিডেন (Kitchen-middens or shell-mounds) কিম্বা শম্বস্তূপ আদিম মনুষ্যদিগের অবস্থা জানিবার একটি প্রধান উপায়। ঐ প্রকার শম্বস্তূপ স্কটলেণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, টিরাডেল ফিউগো দ্বীপ, মালে উপদ্বীপ, এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে দেখা গিয়াছে। দেনমার্কে যে সকল স্তূপ আছে তাহাতে অগ্নিপ্রস্তর-নির্ম্মিত নানা প্রকার অস্ত্র বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল স্তূপে যে সমুদায় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা এই প্রতীতি হয় যে, যে সকল মনুষ্য ঐ সকল স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা সুইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীগণ অপেক্ষা অধিকতর অসভ্য ছিল। তাহারা কৃষিকার্য্য কিছুমাত্র করিতে পারিত না এবং ইহাদিগের কুক্কুর ব্যতীত অন্য কোন গৃহপালিত পশু ছিল না। কিন্তু তাহারা মৎস্য ধরিতে অতি পটু ছিল, কারণ ঐ সকল স্তূপে অনেক প্রকার মৎস্যের অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে সকল মৎস্যের দেহ ও অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সে সকল মৎস্য সমুদ্রের গভীরতম স্থানে বাস করিয়া থাকে। যখন ইহারা সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশবাসী মৎস্য সকল ধৃত করিত তখন নিঃসন্দেহই ইহারা নৌকা নির্ম্মাণ ও নৌকাচালন-বিদ্যা অবগত ছিল।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

পারিস্ নগর-প্রবাসী কোন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল শ্রেষ্ঠ-কুলোদ্ভব হিন্দু যুবক সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে যে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন ও সেই পত্র সম্বলিত রাজনৈতক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা তৎলাভের বিশিষ্ট উপায় বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় যে একটি যুক্তিগর্ব্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় ও সময়ের উপযোগী।

তিনি বলেন "ইহা অতি সুখের বিষয় যে শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আজ কাল একটি স্বাধীনতার ভাব উদ্বোধিত হইতেছে এবং এই স্বাধীনতার ভাব আমরা ইংরাজদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি। ইংলণ্ডের সংশ্রবে যদি আমরা আর কোনও উপকার না পাইয়া থাকি অন্তত এই উপকারটি আমাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই যে জাতীয় স্বাধীনতার ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছে ইহাতে আমাদের যতই আহ্লাদ হউক না কেন—

আমাদের আর একটি দিক আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল নিয়ম পালন না করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সেই সকল নিয়ম পালন পক্ষে কত দূর চেষ্টা হইতেছে? এখন তো কেবল স্বাধীনতা বিষয়ে সভায় মহা আড়ম্বরে বক্তৃতা হইতেছে—সংবাদপত্রে অনর্গল লেখা চলিতেছে এবং কবিতা নাটকের ছড়াছড়ি হইতেছে—কিন্তু কাজে কি হইতেছে? আমাদিগের স্বদেশ-বৎসলদিগের দেশানুরাগ কি শুদ্ধ বাক্যেই বদ্ধ থাকিবে? বক্তৃতা কবিতা প্রভৃতির উপকারিতা আছে বটে কিন্তু উহাই কি যথেষ্ট?—উহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাই। যে সকল কার্য্যগত উপায়ে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বাধীনতা লাভের যে সকল নির্দ্দিষ্ট অকাট্য নিয়ম আছে অগ্রে তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।" অবিকল অনুবাদ না করিয়া আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশের স্থূল মর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম। এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তার পরেই তিনি এই মর্ম্মে বলিতেছেন যে "জোর যার মুলুক তার" কিম্বা "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটি উদ্ভিদ্ জগতে, জীব জগতে, এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে। বলবান দুর্ব্বলের স্থান অধিকার করিবেই করিবে। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মই এই। এই নিয়মটি যেমন প্রকৃতির মধ্যে তেমনি মনুষ্য-সমাজে বিলক্ষণ খাটে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-স্থল। যাঁহার বল আছে তাঁহারই অধিকারের কথা মুখে আনিবার অধিকার আছে। "Only he dares speek of right or right who has might, exclaims she in her Book of Revelations which we term History." প্রকৃতি জননী অথবা ইতিহাসের এই শাসন-বাক্য যিনি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন তিনি তাহার ফলভোগ করুন—অবাধ্য শিশুর ন্যায় বেৎ খাইয়া আবার সিধা পথে ফিরিয়া আইসেন।' কিন্তু আমরা লেখক মহাশয়ের এই মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারি না। "জোর যার মুলুক তার'—এই নিয়ম উদ্ভিদজগতে, পশুজগতে এবং পশুবৎ অপূর্ণ পূর্ব্বতন মানব সমাজে খাটিতে পারে কিন্তু সভ্য সুপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য-সমাজে এ নিয়ম শোভা পায় না। এই নিয়মের নেতৃত্ব ও ঔচিত্য স্বীকার করিলে সভ্য-সমাজের একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত করা হয়। এই নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে গেলে অরাজকতা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া সমাজ-বন্ধন একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ নিয়মকে প্রশ্রয় দিলে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এক জন বলবান দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে সেই ধনে কি ঐ দস্যুর অধিকার জন্মে: "বল যার অধিকার তার" এই নীতিসূত্রটি মানিতে গেলে ঐ দস্যুর অপহৃত ধনে অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন? এইরূপ যদি কোন বলবান জাতি কোন দুর্ব্বল জাতির দেশ কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সেই জাতি কি দস্যুতা অপরাধে অপরাধী নহে? এক জন সামান্য দস্যুর সহিত তাহার প্রভেদ কি? সংখ্যায় অধিক এই মাত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের যে মূল নিয়ম, জাতিগত সম্পত্তি-অধিকারেরও যে সেই একই মূল নিয়ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে দেশের যে অধিবাসী, সেই দেশ সেই অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক ন্যায্য সম্পত্তি।

এই রূপ যদি দেশ-অধিকারের ন্যায়-সঙ্গত একটি স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকে, বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়—তাহা হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের আর অবধি থাকে না। যুদ্ধানল চিরকালই প্রজ্জ্বলিত থাকে—"সভ্যতা" বলিয়া একটি শব্দ আর মানব-ইতিহাসে কুত্রাপি স্থান পায় না।

মানব সমাজের সভ্যতা বা উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম।—সংগ্রাম-প্রধান কাল।
দ্বিতীয়।—স্বার্থ-প্রধান কাল।
তৃতীয়।—ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল।
আর এক কথায়—
প্রথম।—তামসিক কাল।
দ্বিতীয়।—রাজসিক কাল।
তৃতীয়।—সাত্ত্বিক কাল।

সাংগ্রামিক কালের বহু পূর্ব্বের যে কাল, সে কাল মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসে ধর্ত্তব্যই নহে—যেহেতু সে সময়ে মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন আদৌ হয় নাই। যখনি রীতিমত যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বুঝা যাইতেছে মনুষ্যদিগের মধ্যে একটি সম্মিলনের ভাব উৎপন্ন হইযাছে, কারণ বিনা সম্মিলনে বৃহৎ যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে না এবং যখনি মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর সম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বলিতে হইবে সমাজ-বন্ধন কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সাংগ্রামিক কালে, কোন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন বলবান পুরুষ উত্থিত হইয়া কতক সংখ্যক লোককে আপনার কতৃত্বাধীনে আনিয়া শুদ্ধ আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্যই কিম্বা কোন নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই, অন্য জাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, তখন প্রধানতঃ শারীরিক বলেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই যুদ্ধবিগ্রহে সে সময়ে মনুষ্য-সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা মানব-সমাজে বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রথম সংমিশ্র আরম্ভ হইল, বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলের বৃদ্ধি হইল, পরস্পরের ভাল পরস্পর অনুকরণ করিতে লাগিল, জেতৃজাতি বিজিত জাতির নিকট কতকটা উপকার লাভ করিল, এবং বিজিত জাতিও জেতৃ জাতির নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত হইল। সংগ্রামের অনেক অশুভ ফল সত্ত্বেও সকল কালেই বিশেষতঃ অসভ্যকালে ইহারও যে বিশিষ্ট উপকারিতা আছে তাহা কেনা স্বীকার করিবে। এই যুদ্ধবিগ্রহ হইতেই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে সম্মিলন আরম্ভ হয়, বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় এবং এই রূপে জনসমাজ সভ্যতার দ্বিতীয় সোপানে উত্থিত হয়।

সভ্যতার এই দ্বিতীয় কাল, জাতীয় স্বার্থের কাল। সাংগ্রামিক কালের লোকে যে রূপ প্রধানতঃ নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই অন্য জাতির সহিত সংগ্রাম করে, যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে, রক্তের পিপাসু হইয়াই রক্তপাত করে, একালের লোক সেরূপ করে না। একালে যুদ্ধ-বিগ্রহ উচ্চতর স্বার্থের অধীন। স্বজাতীয় ধন লাভের পন্থা করিবার জন্য, বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য, এক কথায় উচ্চতর স্বার্থের জন্য যদি যুদ্ধবিগ্রহ আবশ্যক হয়, তবেই এই কালের লোক যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

ক্রমে পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হয় ততই ব্যক্তিগত নীচ প্রবৃত্তি সকল মন্দীভূত হয়, জাতিগত অতিরিক্ত স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, তখন এক জাতির স্বার্থ অপর জাতির স্বার্থের সহিত বিরোধী হয় না, প্রত্যুত সকল জাতির এক স্বার্থ হইয়া উঠে, তখন ন্যায় ধর্ম্ম মঙ্গলের অখণ্ড রাজত্ব পৃথি-

বীতে স্থাপিত হয়, তখন আর শারীরিক বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না, তখন পৃথিবীর সকল জাতিই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে নির্ভয়ে সুখে সঞ্চরণ করে। কিন্তু এই ন্যায়-ধর্ম্মপ্রধান কাল, এই সাত্ত্বিক কাল, এই সত্যকাল, এই স্বর্গীয় কাল, পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। এত বিলম্ব যে, সে এখন আমাদের কল্পনাতেও আইসে না। কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজের গতি যে ঐ দিকে, তাহার নিদর্শন এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

সমগ্র পৃথিবী যত দিন না সভ্যতার এক সমভূমে দণ্ডায়মান হইবে ততক্ষণ এই ন্যায় ধর্ম্মের কাল পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইবে না। পৃথিবীর একাংশে যদি এই জ্ঞান ধর্ম্মকাল আবির্ভূত হয়, আর অন্য ভাগে যদি সাংগ্রামিক কাল কিম্বা স্বার্থকাল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে যে অংশে জ্ঞান ধর্ম্ম কালের আবির্ভাব হইয়াছে সে কাল সেখানে কখন বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-মূলক সভ্যতার প্রথম আভাস প্রকাশ পাইয়াছিল। তৎকালীন হিন্দুগণ এই সার বুঝিয়াছিলেন যে "যতো-ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ন্যায়-ধর্ম্মের বর্ম্মে তাঁহারা সুরক্ষিত আছেন, বিদেশীয় লোক আসিয়া যে তাঁহাদিগের দেশ আবার আক্রমণ করিবে, এ কথা তাঁহাদের মনে আদৌ উদয় হয় নাই, তাঁহারা দিব্য নিশ্চিন্ত ছিলেন—পার্থিব বিষয়ে বড় মনোযোগ দিতেন না—পারমার্থিক বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে রীতিমত প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং তাঁহারা বিদেশীয়দিগের হস্তে সহজে পরাভূত হইলেন। এই আক্রমণের ফল এই হইল—বৈদেশিকেরা সুসভ্য হিন্দুদিগের সংশ্রবে সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উপরে উত্থিত হইল—এবং সুসভ্য হিন্দুগণের সভ্যতা ও উন্নতি বৈদেশিকদিগের অত্যাচারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সভ্যতার ইতিহাস পাঠে এই একটি বিষয় শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর কোন অংশের কোন জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদিগকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া—আপনি একাকী অত্যন্ত দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাদৃশ দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে গেলেই আবার পতন হয়। সমগ্র পৃথিবীকে সভ্যতার সমভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য প্রকৃতি দেবীর নিয়ত চেষ্টা। গ্রীকেরা যখন সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—রোমকেরা আসিয়া তাহাদিগের দেশ জয় করে—এবং গ্রীকদিগের সংশ্রবে রোমকদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, আবার যখন রোমকেরা সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—গথ্ ভাণ্ডাল প্রভৃতি উত্তর প্রদেশীয় জাতিগণ তাহাদিগকে জয় করে—এবং বিজিত রোমকদিগের সংশ্রবে তাহারা আবার সভ্যতা পথের পথিক হয়। এইরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে এক দিকে পতন, আর এক দিকে অভ্যুদয়, এক দিকে অবনতি আর এক দিকে উন্নতি নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিলে যেমন পাত্রস্থ নিম্ন তলের জল-রাশি কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলে উপরি ভাগে উত্থিত হয়—তাহার স্থান আবার অব্যবহিত উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল জল-স্তবক আসিয়া অধিকার করে—এইরূপ প্রক্রিয়ার ক্রমে ক্রমে সমস্ত জল-রাশির উষ্ণতা সমান হইয়া পড়ে—সেই রূপ সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সমানরূপে

বিস্তৃত হইবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে।

"বল যার অধিকার তার" এই নীতিসূত্রটির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। যদিও ইদানীন্তন ইউরোপে এই নিয়মটি পূর্ব্বতন সাঙ্গ্রামিক কালের ন্যায় প্রবল নহে, তথাপি এই নিয়মটির কার্য্য এখনও সেখানে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। এখন শুদ্ধ যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ হয় না, জাতীয় স্বার্থের উদ্দীপনায় যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের সকল রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সৈন্যদলের Standing army সংখ্যার লাঘব করা হউক, কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হয়েন নাই, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ফরাসিস জর্ম্মান যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। অতএব দেখা যাইতেছে 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়ম এখনও মনুষ্য সমাজ হইতে তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এই নিয়মটি সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে হঠাৎ এইরূপ প্রতীতি হয় যেন তিনি ঐ নিয়মটির উৎকৃষ্টতা ও চিরস্থায়িতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন।

* * "In these Nature once more asserts her eternal law—once more gives the Hero who reigns not by the so-called right of conventional inheritance but of Might which alone gives you the right."

* * * * * *

"And look how the nation blooms and flourishes once more under the sway of its just rightful king, because chosen by Nature on account of his acknowledged might and therefore his inviolable right of to rule."

আমরা এই বলাধিকারের নিয়মকে উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে পারি না—এই নিয়মানুসারে চলিতে কাহাকে উপদেশ দিতে পারি না। মানব সমাজের অপূর্ণতা হেতুই এই নিয়মটির অস্তিত্ব—ইহাকে আমরা কখন অনন্তকালের (Eternal Law) নিয়ম বলিতে পারি না। ন্যায়ের নিয়মই অনন্ত কালের নিয়ম। বলাধিকার-নিয়মের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিলে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যুদ্ধ বিগ্রহের আর অবধি থাকে না—সুতরাং সভ্যতার গতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়, তাহা হইলে কোন রাজ্যেরই শাসন-কার্য্য স্থায়ী পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দণ্ডে দণ্ডে রাজ-শাসনের পরিবর্ত্তন হয়। আজ এক রাজা এক রাজাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিল—কল্য আর এক জন প্রবলতর রাজা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্থান আবার অধিকার করিল—প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিয়া আছে—যখনই তাহার ক্ষমতা হইবে অমনি সে আর এক জনের বস্তু বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে। এই জন্যই সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে এই সাধারণ নীতিটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যে দেশের যে চিরন্তন রীতি, সেই রীতি অনুসারে সাধারণ প্রজাদিগের ব্যক্ত কিম্বা অব্যক্ত সম্মতি-ক্রমে সেই দেশের রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তা কিম্বা শাসনকর্ত্তৃগণ সেই দেশের শাসন-ভার প্রাপ্ত হয়েন। যতক্ষণ না তাঁহারা ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেন ততক্ষণ তাঁহারা স্বীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না—অন্য দেশের লোক আসিয়া যদি কোন দেশের প্রজাদিগের বিনা সম্মতিতে সেই দেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেই দেশের অনধিকার-প্রবেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহারা বলপূর্ব্বক ঐ দেশ অধিকার করিলেও—ঐ দেশে তাহাদিগের যে ন্যায্য অধিকার—ন্যায্য স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে এরূপ

বলা যাইতে পারে না। রাজনীতি-সম্বন্ধে এইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্বতন সাংগ্রামিক কাল অপেক্ষা ইদানন্তীন সভ্য-সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহের ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন,— 'Abundant blessings flow to the conquered inspite of the bloody resistance they might offer or curses and imprecations they might heap on their [illegible] conqueror.'—অনেক সময় পরাজিত জাতি জেতৃ জাতির নিকট বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হয় সত্য—তাহা আমরাও স্বীকার করি এবং সে বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটিকে কখনই উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এক জন দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন অপহরণ করিয়া দীন দুঃখীগণকে দান করিতে পারে, তাহা বলিয়া যে সে দস্যুতা-অপরাধে অপরাধী নহে কিম্বা সে যে সমাজের নিকট দণ্ডনীয় নহে, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না। জগৎ-বিধাতার কার্য্য-প্রণালীই এইরূপ যে তিনি অশুভ ঘটনা হইতেও কিঞ্চিৎ শুভ উদ্ধার করেন। তাহা বলিয়া যাহা অন্যায় তাহা কখনই ন্যায় হইতে পারে না। যদি লেখক মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এই হয় যে, সমস্ত পৃথিবীতে—এমন কি তাহার সভ্যতম অংশ ইউরোপেও যে নিয়ম এখনও কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে তাহারই কথা তিনি বলিয়াছেন, কোন্ নিয়মের মনুষ্যসমাজের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত, সে বিষয় তিনি বলিতেছেন না; তাহা হইলে তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র অমিল নাই। ইহা সত্য যে, সমস্ত পৃথিবীতে এখনও 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটি কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে। সভ্যতাভিমানী ইউরোপ মুখে এই নিয়মটি স্বীকার করেন না বটে কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিয়মানুসারে অনেক সময়ে চলিয়া থাকেন। তবে অসভ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের এই প্রভেদ যে, অসভ্যেরা স্পষ্টাপষ্টি এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, আর তাঁহারা তাহার উপর একটি ন্যায়ধর্ম্মের আবরণ দিয়া স্বীয় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই যে একটি ন্যায়ধর্ম্মের আবরণ দিতে হয়, ইহাও অপেক্ষাকৃত উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বলাধিকারের নিয়ম ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যতই মনুষ্যসমাজে সভ্যতার বাস্তবিক উন্নতি হইবে ততই 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটির উপর "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই নিয়মটি জয়লাভ করিবে। ইউরোপীয় সভ্যতার এক্ষণে এতটুকু উন্নতি হইয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা জ্ঞানত বুঝিয়াছেন যে ন্যায়ের নিয়মই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, তবে অপূর্ণতা হেতু রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে স্বার্থ অন্ধ হইয়া কার্য্যতঃ প্রায়ই এই নিয়মের ব্যভিচার করেন। এবার আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত এই খানেই শেষ করিলাম। লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভারতীর আগামী সংখ্যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধি পক্ষ নহি। স্ত্রীজাতি জ্ঞানানুশীলন করে, চিরন্তন কুসংস্কারের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে এবং সভ্যসমাজে সাদরে গৃহীত ও সম্মানিত হয় ইহা অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু এক্ষণে যে প্রণালী ক্রমে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আমরা তাহার বিরোধী।

স্ত্রীশিক্ষার যে বিষময় ফল দঁ তাহা কেবল এই প্রণালী-দোষ। প্রথমতঃ যে সকল পুস্তক স্ত্রীলোকের পাঠ্য তাহার অধিকাংশই ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ অথবা ইংরাজী পুস্তকের আদর্শে রচিত। সেই সকল পুস্তক পাঠ করিলে অল্পে অল্পে স্ত্রীলোকের মনে বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করে, এবং দেশীয় ভাবে বিদ্বেষ জন্মে। দ্বিতীয়ত স্ত্রীলোকের শিক্ষাকাল সাধারণত অতি অল্প; বাল্যকালে কএক বৎসর যা কিছু গুরূপদেশ পায় তাহাই তাহার চির জীবনের সম্বল। তৃতীয়ত ধর্ম্মোপদেশ-শূন্য নীতিশিক্ষা,যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে নীতি দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে পারে না, সুতরাং সেই নীতিশিক্ষা সলিলোপরি নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় মনের সহিত কখনই মিশ্রিত হয় না। চতুর্থতঃ উপন্যাস ও নাটকপাঠ, এতদ্দেশে যতগুলি উপন্যাস ও নাটক প্রকাশ হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই জঘন্য। এক একটী উচ্চ নীতি কোন কোন গ্রন্থের লক্ষ্য বটে কিন্তু গ্রন্থকারেরা দুর্নীতিমূলক দোষাংশে অপেক্ষাকৃত এমন রসের আবির্ভাব করিয়া দেন যে ক্ষীণবুদ্ধি বিলাসিনীরা তাহাতেই মোহিত হন, গ্রন্থের সুনীতিমূলক গুণাংশে তাঁহাদের আর দৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে না। আমরা সংক্ষেপে স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী-দোষ প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে কিরূপে স্ত্রীশিক্ষা হওয়া উচিত তাহাই বিবেচ্য।

আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নহি। সকল প্রকার বিদ্যাই স্ত্রীলোকের জ্ঞাতব্য। জ্ঞানের দ্বার অবারিত; স্ত্রী বা পুরুষ হউন, যিনি জ্ঞানের যে বিভাগে যত দূর প্রবেশ করিতে চান অবশ্যই করিবেন। ঈশ্বর যখন নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই বোধ শক্তি দিয়াছেন তখন তাহা চরিতার্থ করিতে না দেওয়া মহা পাপ। কিন্তু প্রধানত যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিণী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাঁহাদের বিশেষ পাঠ্য। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব।

প্রথম ধর্ম্ম ও নীতি গ্রন্থ। হিন্দুসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, সুতরাং যত দিন না মত ও বিশ্বাসের একতা সম্পাদিত হয় তাবৎ কোন বিশেষ ধর্ম্ম এ সমাজের শিক্ষণীয় হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর ও পরকাল সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যবিন্দু। শাপগ্রস্ত নাস্তিক ব্যতীত কেহই ইহার বিরোধিপক্ষ নয়। সুতরাং যে উপদেশে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল বিরাজমান এই ধর্ম্মপ্রবণ জাতি নতশিরে তাহা স্বীকার করিবে। হিন্দুসমাজে আপাতত এইরূপ সাধারণ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক। ধর্ম্মের সহিত নীতি-বীজ রোপণ আবশ্যক। নচেৎ নীতিশিক্ষায় কোন ফল দর্শে না। অধুনা বঙ্গভাষায় যে সকল নীতি পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কেবল মাত্র নীতিসূত্র আছে, উদাহরণ অতি বিরল। কিন্তু উদাহরণের সহিত নীতি যেমন ঝটিতি তাড়িতবৎ হৃদয়ে প্রবেশ করে, শুষ্ক নীতি-সূত্র সেরূপ নহে। এইরূপ নীতিগ্রন্থ কেবল রামায়ণ ও মহাভারত। ইহা ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড নীতি-সমুদ্র; গাম্ভীর্য্যে অতলস্পর্শ এবং বিস্তারে অনন্ত ও অসীম। ইহার এক একটী চরিত্র জীবলোকের জীবন্ত উপদেশ। এতদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট দিনে ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্ম ও নীতি ঘোষণা করেন না, দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম-প্রচারকও বিচরণ করেন না তথাচ আপামর সাধারণ যে নীতি ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত তাহা কেবল এই উভয় গ্রন্থেরই গৌরব ও মহিমা। ইহা হৃদয়হারী লোকচরিত্রে সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি প্রভৃতি দেবস্পৃহনীয় গুণ সকল লোকের মনে সহজে মুদ্রিত

করিয়া দেয়। সুতরাং এই দুই নীতি-গ্রন্থই স্ত্রীজাতির পাঠ্য।

বর্ত্তমান কাল বিলাস-প্রধান কাল। অধিকাংশ স্ত্রীলোক গার্হস্থ্য কার্য্যে উদাসীন, কেবল বিলাস লইয়াই ব্যস্ত। আহার্য্য শোভা তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বস্ব। এই জন্য অনেক স্বামী ঋণগ্রস্থ ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছেন। গৃহকার্য্য দূরে থাক গৃহিণীগণের পুত্র কন্যা প্রতিপালনও অন্যের হস্তে। আমাদের স্ত্রীপাঠকেরা ক্ষমা করিবেন, আমরা স্ত্রীজাতির এইরূপ অন্যায় ও অত্যাচার দেখিয়া বস্তুতই ভীত হইতেছি। সামাজিক উন্নতির অর্দ্ধাংশ স্ত্রী-নিষ্ঠ, কিন্তু অধুনা স্ত্রীজাতির এইরূপ দূষিত আত্মম্ভরিতা আমাদের সেই আশার মূলোচ্ছেদ করিতেছে। বস্তুত তাঁহাদের ভোগসুখে ঈর্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাঁহাদেরই বিজয়িনী ইচ্ছা যে একটা নিরুপায় জাতিকে অধঃপাতে দিবে সেই জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। এক্ষণে ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি এইটি স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী-দোষ। বর্ত্তমান প্রণালীতে আদৌ গার্হস্থ্য-বিধান গৃহীত হয় নাই। পূর্ব্বকালে গৃহকার্য্য স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন ছিল, এমন কি কোন সুসম্পন্ন গৃহস্থ সংসারে স্ত্রীলোক দাস দাসীসত্ত্বেও স্বহস্তে সমস্ত গৃহকার্য্য করিতেন। সকলের জন্য পাক করিতে অধিকার পাওয়া একটী পরম শ্লাঘার বিষয় ছিল। ফলত এই গৃহকার্য্যে অভিনিবেশ হেতু বিলাসের ভাব তাঁহাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এখন বিপরীত, পাক করা নীচ কার্য্য মনে করা হয়। গৃহস্থের কিঞ্চিৎ সমাবেশ হইলেই পাচক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কিন্তু গৃহিণীগণের বিবেচনা করা উচিত যে ক্রীত ইচ্ছা কখনই সুফল প্রসব করে না। তাঁহাদের স্বহস্ত-প্রস্তুত অন্ন-সম্ভার যেমন পতিপুত্রের তৃপ্তির কারণ হয় এবং পবিত্র বোধ হইয়া থাকে, নিযুক্ত পাচকের প্রদত্ত অন্নে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহারা নিজে যাহা প্রস্তুত করিবেন তাহা সর্ব্বাংশেই নিরাপদ। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী পাক-সভা হইয়াছে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং গিয়া তথায় আহার করেন এবং তাঁহার কন্যা ঐ সভার উদ্যোগী ও সভাপতি। এখানকার ইউরোপীয়দিগের যে আদর্শ তাহা নীচ ও জঘন্য। বোধ হয় এই অসৎ দৃষ্টান্তই আমাদের কুলকামিনীগণকে ভ্রান্তিজালে ফেলিয়া থাকিবে। যাহাই হউক, যেখানে শ্রম-কাতরতা ও আলস্য সেইখানেই বিলাসিতা, এই সর্ব্ব-শোষক বিলাস গৃহিণীগণের অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিতেছে। এক্ষণে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া উচিত।

এতদ্দেশে পুরুষের আহরণ ও স্ত্রীহস্তে পরিবেশন ইহাই চিরন্তনী রীতি। কিন্তু স্ত্রীজাতি যদি বিলাস-পরায়ণ হন তবে পুরুষ যতই আহরণ করুন কিছুতেই সঙ্কুলন হয় না। এই জন্য স্ত্রীলোকের মিতব্যয়িতা শিক্ষা আবশ্যক। যে সকল গুণ থাকিলে গৃহিণী হওয়া যায় তন্মধ্যে ইহা একটী প্রধান গুণ। এই গুণ অধিকার করিতে হইলে অগ্রে লোভ সংবরণ করা চাই। যে সংসারে পরিমিত ব্যয় ও সঞ্চয়, অলক্ষ্মী তাহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্কশাস্ত্র মিতব্যয়িতার সাহায্য করে, সুতরাং স্ত্রীজাতিকে কিঞ্চিৎ অঙ্ক শিখিতে হইবে।

এখন ইংরাজের রাজত্ব, গৃহে গৃহে ইংরাজী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব। শিশুর পীড়া হইল, উজ্জ্বল বেশে একজন ইংরাজী চিকিৎসক আইলেন। দেশকাল পাত্রত অযথা কথা, মুখাগ্রে স্ফূর্ত্ত ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র কড়ায় গণ্ডায় প্রদর্শন ইঁহাদের কার্য্য। ইঁহারা সেই অপগণ্ড শিশুর জন্য ব্রেণ্ডি ও

কুক্কুটের ক্বাথ ব্যবস্থা করিলেন। এই বৈদেশিক লগুড়-প্রহারে যদি শিশু বাঁচে তবে তার পিতৃপুরুষের পুণ্যবল। ফলত যে দেশে যে জাতির সৃষ্টি সেই দেশে তাহার রোগশান্তির ঔষধও আছে। এইটি ঐশিক বিধান। আবহমান কাল ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। পুরন্ধ্রীগণ সামান্য গাছ-গাছড়া দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতেন এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ রোগ-প্রতীকারও হইত। এক্ষণে আর সেরূপ স্ত্রীলোকের আদর নাই, কিন্তু ইংরাজী তীব্র ও রুক্ষ ঔষধ প্রভাবে শিশুর কোমল শরীর যে চিররুগ্ন হইতেছে কেহই তাহা বুঝেন না। অকাল মৃত্যু ক্রমশই বাড়িতেছে কেহই তাহা দেখেন না। এক্ষণে ইহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা গৃহে গৃহে পূর্ব্ববৎ স্ত্রীচিকিৎসক চাই। যাবৎ চিকিৎসা স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্ভূত না হইতেছে তাবৎ গার্হস্থ্যবিধান পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইবে না। অতএব প্রত্যেক গৃহেই স্ত্রীলোকদিগের সামান্যরূপ দেশীয় প্রণালীর চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

শিক্ষা প্রকৃতি-সাপেক্ষ, যাহার যেরূপ প্রকৃতি শিক্ষা তদনুযায়ী হইলে বিশেষ ফলোপধায়ক হয়। পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়ের প্রকৃতি-বৈষম্য আছে, একটী বুদ্ধিপ্রধান অপরটী ভাবপ্রধান; কিন্তু যে প্রণালী বুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের উত্তেজনা করে তাহাই স্ত্রীজাতির উপযুক্ত। এই জন্য সঙ্গীত ও চিত্র স্ত্রীলোকের শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু এই দুইটি বিদ্যা অবস্থা-সাপেক্ষ, সুতরাং ইহা যে সাধরণ বিধি নয় ইহা বলা বাহুল্য।

প্রথম সঙ্গীত। সঙ্গীতের দুইটী অংশ, একটী রাগ মান, অপরটী কবিত্ব, ইহার একতরের অভাবে সঙ্গীতের অঙ্গপূর্ণ হয় না। কবিত্ব মনের উপর যেরূপ কার্য্য করে রাগমান সেইরূপই করিয়া থাকে। ক্ষোভ ও বিক্ষেপ মানসিক সকল শক্তির মূলহর উৎপাত, তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত উচ্চ অঙ্গের গণিতের ন্যায় মনকে বিভিন্ন বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক একতান করিয়া লয়। তখন তাহার সকল শক্তিই স্ফূর্ত্তি পায় এবং সে স্বরলহরীর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে। মনের স্বভাবই এই যে সে যাহার আয়ত্ত হয় তাহারই প্রকৃতি অধিকার করে। সঙ্গীতের প্রকৃতিই উচ্ছ্বাসময়, মনও উচ্ছ্বাসময় হইয়া উঠে। সঙ্গীতের এই রূপ উপকারিতা আছে বলিয়াই মহর্ষিগণ বেদের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন কালে সামগানকে অনন্তফল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলত যে জাতির উন্নতি আবশ্যক হলে তাহার ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত অনুশীলন করা চাই। কিন্তু আমাদিগের এই দরিদ্র বঙ্গদেশে আর সে সঙ্গীতের আদর নাই, সচরাচর যে সমস্ত সঙ্গীত গীত হয় তাহা অতি জঘন্য, এমন কি পুত্র পিতার নিকট এবং ভ্রাতা ভগিনীর নিকট তাহা গাইতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত এদেশের সেই অভাব পূরণ করিতেছে। ইহা উচ্চ অঙ্গের কবিত্বও উচ্চ অঙ্গের রাগ রাগিণীতে গঠিত। স্ত্রীলোককে এই সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই, সাধনার গুণে কলকণ্ঠী অবলাদিগের ইহা অবশ্যই সুগম হইবে।

দ্বিতীয় চিত্রশিক্ষা। আমাদিগের মতে চিত্রকর ও কবি তুল্য-প্রতিষ্ঠ। উভয়েই প্রকৃতির অনন্ত ও অক্ষয় ভাণ্ডারের চিরভিখারী। এক জন বাক্যে অপরটী বর্ণবিন্যাসে প্রকৃতির হৃদয় চিত্রিত করিয়া থাকেন। প্রতিস্পর্দ্ধিতা সম্বন্ধে না হউক কিন্তু র‍্যাফেল ও কালিদাস কার্য্য সম্বন্ধে এক। ফলত ভাবুকতাই কবি ও চিত্রকর উভয়ের প্রাণ, কবির ন্যায় চিত্রকরকেও নানা

রসের অবতারণা করিতে হয়। স্নেহ বাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্য ভাব এবং ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি দেবভাব অন্তঃস্ফূর্ত্ত না হইলে চিত্রিত পদার্থে সজীবতা রক্ষিত হইতে পারে না। যখন রাজ্ঞী জেনগ্রে প্রাণদণ্ড হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিতেছেন তখন তাঁহার মুখশ্রীতে ভক্তি-রাগ জীবনের নশ্বর ভাব ও ঔদাস্য অঙ্কিত করিতে কিরূপ হৃদয় আবশ্যক, ব্যক্তিগত অবস্থার সহিত তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত না হইলে বর্ণ তুলিকা ও ফলক মাত্র অবলম্বন করিলে সেই চিত্র কদাচ প্রস্তুত হইতে পারে না। বাৎসল্যে আপনার হৃদয় আর্দ্র কর তবে একটী স্নেহের পুত্তলী অঙ্কিত হইবে। বীরমদে স্বয়ং মাতিয়া উঠ তবে তুলিকা বীরহস্তে তরবারির ন্যায় ভাব আনিতে পারিবে। যাহার যেরূপ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তিনি সেই পরিমাণে চিত্রকর। স্ত্রীজাতি ভাবের মূর্ত্তি, সুতরাং চিত্রই তাঁহাদের সম্পূর্ণ শিক্ষার উপযোগী।

এক্ষণে স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া চতুর্দ্দিকে হুমুল আন্দোলন উপস্থিত। গ্রন্থকারগণ এই জন্য নিশীথে করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন; পত্রসম্পাদকেরা এই জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ প্রস্তাবে জনসমাজ আকুল করিয়া তুলিতেছেন। বক্তা এই জন্য গগনভেদী স্বরে শ্রোতৃগণকে আবর্জ্জিত করিতেছেন। দুইটি যুবা একত্র হইলে কেবল এই জল্পনা, দুইটি বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক একত্র হইলে কেবল এই ভাবনা। ফলত এই স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি সাধারণ মত কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাঁহার যে রূপ ইচ্ছা তিনি বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন এবং গুরুজনের অন্তরে আঘাত দিয়া কার্য্যে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাকেই বলে সমাজ-বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য। কিন্তু আবহমান কাল স্ত্রীলোকের উপর হিন্দুজাতির অসাধারণ সম্মানের ভাব। রাশি রাশি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে দেবভক্তিতে দেখে এবং কায়মনে তাহাদের পবিত্রতা কামনা করে। স্ত্রীলোককে মাতৃ-সম্বোধনে আহ্বান হিন্দুজাতি ভিন্ন আর কোন জাতিতে নাই। এক্ষণে সেই স্ত্রীসমাজে দেশ-কাল-বিরোধী কোন রূপ পরিবর্ত্তন দেখিলে প্রকৃত হিন্দু যে অন্তরে আঘাত পাইবেন তাহা বিস্ময়ের কথা নহে।

হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তনের বিরোধী নয়। অতি প্রাচীন কালের সহিত বর্ত্তমান সমাজের তুলনা করিয়া দেখ বুঝিবে এক্ষণে সে হিন্দু সমাজ আর নাই। ইহার বক্ষের উপর দিয়া নানা রূপ পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে ইহা অকাতরে তৎসমুদয় সহ্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সমাজ ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বিরোধী, যে পরিবর্ত্তন দেশ কাল পাত্র প্রখর স্রোতে প্লাবিত করিয়া আইসে তাহা এ সমাজের সহনীয় নয় এবং সে পরিবর্ত্তন এখানে স্থির-পদে দাঁড়াইতেও পারে না। সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতা এখন যে আকারে আসিতেছে ইহা হিন্দু ভাবের বিরোধী।

স্ত্রীজাতিকে চির-রুদ্ধ করিয়া রাখা অবশ্যই ঐশিক নিয়মের বিরুদ্ধ, কিন্তু হিন্দু-সমাজ স্ত্রীলোকের উপর সেরূপ নির্যাতন করেন না। ধর্ম্ম ও নীতি স্ত্রীজাতিকে যতটা স্বাধীনতা দিতে বলে হিন্দুসমাজ তাহা দিয়াছেন এবং এখনও দিতে প্রস্তুত। ফলত হিন্দুস্ত্রী স্বাধীন। প্রতিদিন প্রভাতে রাজ-পথে বিচরণ কর দেখিবে সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলা দলবদ্ধ হইয়া স্নানার্থ নদীতীরে যাইতেছেন। কোথায় শ্রীক্ষেত্র, কোথায় বারানসী গয়া বৃন্দাবন, কোথায় প্রভাস তীর্থ, কোথায় কামরূপ, কোথায় সাগর-সঙ্গম, এই ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে অপর সীমায় হিন্দুস্ত্রী পদব্রজে নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকেন। এই স্বাধীনতা আবার স্থান বিশেষে ভিন্নরূপ আকারে আছে। রাঢ়াঞ্চলের কোন কোন পল্লীগ্রামে বৎসরের মধ্যে একবার একটী মেলা হয়। তথায় ইতর ভদ্র স্ত্রীপুরুষ

নির্ব্বিশেষে মিলিয়া থাকেন। সকলের হস্তে পুষ্পমালা, বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে এবং স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে মালা অর্পণ পূর্ব্বক সম্পর্ক পাতাইতেছে। সমস্তকাল তাহারা সেই পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইবে এবং বিপদ সম্পদে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে এই তাহাদের লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত তথায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক গুলি মেলা হয়। তন্মধ্যে কেন্দুবিল্ব গ্রামে কবি-তিলক জয়দেবের মেলা সর্ব্বপ্রধান। তথায় সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে মিলিত হইয়া হইয়া থাকেন। এই মহানগরী কলিকাতা ব্যবসায় ও বাণিজ্যের স্থান, এখানে হিন্দুসমাজ নামমাত্র, এক পরিবারের পার্শ্বস্থ পরিবার পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত। ফলত এস্থানে কেহই কাহার নয়। সুতরাং এখানে স্ত্রীজাতির বদ্ধভাব স্বভাবতই হইয়াছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের হিন্দুসমাজে গিয়া দেখ, দেখিবে, স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ মুক্তভাব। কুলস্ত্রীরা গৃহ হইতে গৃহান্তরে পল্লী হইতে অপর পল্লীতে আবশ্যকমত যাতায়াত করিতেছেন। কোন স্থলে কথক ধর্ম্ম-ঘোষণা করিতেছেন, প্রত্যেক পল্লীর স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত, তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানবিশেষে বিশেষ বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণসমাজের রীতি এই যে কোন একটী মহাভোজে যে সকল স্ত্রীলোক পাচিকা থাকিবেন পরিবেশনের ভার তাঁহাদেরই হস্তে। এই সূত্রে রাজলক্ষ্মীকেও পাত্র-হস্তে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যগামিনী হইতে হয়। পল্লীগ্রামে অতিথি-সপর্য্যা স্ত্রীলোকই করিয়া থাকে। অতিথি যে কোন বর্ণ ও যে কোন জাতি হউক, স্ত্রীলোক তাহার সহিত কথা কয় ও তাহার ভোজনের আয়োজন করিয়া দেয়। দেবর সম্পর্ক মাত্রই তাঁহাদের আলাপ্য। এই প্রসঙ্গে গ্রামের অনেকেরই সহিত তাঁহারা কথোপকথন করিয়াথাকেন। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে হিন্দু-স্ত্রী অস্বাধীন এই প্রবাদটী হিন্দুসমাজের কেবল অপকলঙ্ক মাত্র।

ভ্রাতঃ! তুমি বলিতে পার না যে হিন্দু-স্ত্রী অসূর্য্যম্পশ্যা। তোমার আদর্শ ইউরোপ, তুমি তথাকার রীতি এখানে প্রবর্ত্তিত করিতে চাও। কিন্তু এথাকার মৃত্তিকা ভিন্ন রূপ, ইউরোপের বীজ এখানে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইউরোপে প্রায় সমস্তই বণিক-চরিত্রের লোক। তজ্জন্যই উহারা অতিশয় পরিব্রজনশীল। তাহাদের অনেকেরই একটা নির্দ্দিষ্ট বাস্তুভূমি নাই। আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশ্ব অন্য স্থানে, তাহাদিগকে অধিকাংশ কাল জাহাজে ও হোটেলে কালক্ষেপ করিতে হয়। যে জাতির এইরূপ অস্থায়ী ভাব তাদের স্ত্রীলোককে কাজেই সাধারণের সহিত মিসিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অত্যন্ত স্বাধীন হইয়াছে। ফলত অবস্থা যতদূর স্বাধীনতা দিয়াছে স্ত্রীলোকেরা আবার তাহা বর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি অনেক সুশিক্ষিত বিচক্ষণ ইউরোপীয়ও এক্ষণে স্ত্রীজাতির এই আত্যন্তিক স্বাধীনতায় বিরক্ত। তাঁহারা এই বিষয়ে হিন্দুরীতি অনুমোদন করেন। কিন্তু এদেশীয়েরা বণিক-চরিত্রের লোক নয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই পৈতৃক বাস্তুভূমি আছে। সাংসার একান্নবর্ত্তী, এ অবস্থায় ইউরোপের আদর্শের অনুরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা মূলেই এখানে আসিতে পারে না। তার কাব্য অলঙ্কার ত দূরের কথা। আর এক্ষণে বঙ্গীয় যুবকেরা যে আদর্শে মোহিত হইয়াছেন একবার অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দেখুন সেইটী কি। স্বামী কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে ছিলেন, আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্ত্রী কোন পুংবন্ধুর সহিত নির্জ্জনে স্বৈরালাপ করিতেছেন, তথায় তিনি সামাজিক নিয়মে প্রবেশ করিতে পারেন না। অগত্যা গৃহান্তরে অপ্রকাশ্য রোষে দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় স্ফীত ও ঈর্ষায় কষায়িত হইয়া আগন্তুকের নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেমন তুমি কি এই রূপ স্ত্রীস্বাধীনতা চাও? স্বামী স্ত্রীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে কালহরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার স্ত্রীর এক জন পুংবন্ধু উপস্থিত, তিনি তাহার কর গ্রহণ পূর্ব্বক কোন আনন্দকাননে বিচরণ করিবার জন্য নির্গত হইলেন, স্বামী সামাজিক নিয়মে মূক, তিনি স্ত্রীকে নিবারণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, কিন্তু তাহার এইরূপ ব্যবহারে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ

হইতে লাগিলেন; তুমি কি এইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা চাও? হিন্দুসমাজ স্ত্রীজাতির পবিত্রতা অধিক কামনা করিয়া থাকেন। ইনি স্ত্রীলোককে চক্ষুর পীড়াকর ঘৃণিত পক্কা-নৃত্য নাচাইতে চান না এবং তাহাদিগকে রঙ্গভূমিতে লইয়া গিয়া দর্শকবৃন্দের মদরাগ-রক্ত দূষিত কটাক্ষে অপবিত্র করিয়া আনিবার ইচ্ছা করেন না। দ্রা'তঃ! তুমি নিজে এমন দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ; বল, তুমি বাহিরে কিরূপে তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করিবে। তুমি সেই দিন তোমার পত্নীকে লইয়া ধূমযানে পরিভ্রমণে যাইতেছিলে, তথায় এক জন বিদেশীয় গৌরাঙ্গ অপর ব্যবধানে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল, সে তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করে, পরে তাঁহার অঙ্গে মুখপূর্ণ মদ্য ফুৎকার করিয়া দেয়, কিন্তু কৈ, তুমি ত তখন তেজস্বিতার কিছুমাত্র পরিচয় দিতে পারিলে না। অতএব এক্ষণে এই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে পক্ষপাত তোমার পরিত্যাগ করা উচিত। যদি না কর, ঘোর বিপদ।

ACT III OF 1872

Since the enactment of Act III of 1872, a heterogeneous medley of Brahmos, sceptics and atheists have availed themselves of its provisions. We really wonder how persons, having the least religious feeling, can marry according to this act. We do not know how they reconcile themselves to the idea that marriages, solemnized in the presence of God, are not valid and those performed in the presence of a human being without the least mention of the name of God, valid. If they say that the former kind of marriage is not valid, and the latter valid, in a social and not in a religious point of view we reply that true religion admits no difference between matters religious and matters social. In its eyes, every thing social is religious, and every thing religious is social. Marriages solemnized according to this act, are reprehensible whether the Brahmic ceremony follows or precedes the registration. In the former case, if the bride or bridegroom dies in the interval between registration and Brahmic ceremony it becomes a purely godless (*Niriswara*) marriage. If the registration follows the Brahmic ceremony, it could be asked, how could a marriage, already celebrated in the solemn presence of God, again require celebration before man? Is not this dishonouring God? These marriages, to say the least of them, are very repulsive in either way. The Act, as it at present stands, is for sceptics and atheists and not for Brahmos. Brahmos, who avail themselves of the Act, say that the form of marriage, provided by it, is a mere form, like any other form of registration, such as that of birth or death but it is not so. It is a regular form of marriage before a human being, affording a very unfavourable contrast to the Brahmic marriage, solemnized in the presence of God. The Hindus are an essentially religious people. How could we expect them to embrace Brahmoism if we act in such an irreligious manner? The feeling of Hindus against marriages, celebrated according to this Act, is intensified by the circumstance that they necessitate the repudiation of the Hindu name which a man, having the least patriotic feeling, would never consent to do. This repudiation of the Hindu name would moreover highly injure the cause of Brahmoism by obstructing the successful diffusion of that religion. Our reverence towards God and our pious wish to promote the successful diffusion of our religion should dissuade us from having recourse to the provisions of this irreligious act. We admit such a step would involve worldly sacrifice but such sacrifices should be cheerfully undergone for the sake of religion. We wonder how Brahmos, who easily undergo sacrifices for the sake of Brahmoism in other respects, suddenly turn cool and calculating at the time of marriage. We are perhaps mistaken in saying that Brahmo marriage, solemnized with Brahmic rites only, is illegal and therefore requires worldly sacrifice. When marriages, taking place among the different heterodox sects of India, are reckoned valid in courts of law, why should not Brahmo marriages be so? If it be said that the former kind of marriages have already settled down into a custom, the same could be urged in favour of Brahmo marriages, the first Brahmo marriage having taken place so far back as 1861, and many having subsequently taken place since the same. Some Brahmos might argue that there is a probability of ordinary Brahmo marriages, solemnized with Brahmic ceremonies only and not according to the Act, being reckoned valid in courts of law but intermarriages can not be so. To this we answer that, when intermarriages are recognized by the ancient Hindu Shastras and are not uncommon in East Bengal and among certain religious sects of the country, and are reckoned valid in courts of law, there cannot be any doubt of such marriages among Brahmos being also reckoned legal in courts of law. Such a high legal authority as Fitz James Stephen is of opinion that every marriage is a contract and that Courts of Law must feel the greatest difficulty in reckoning any kind of marriage null and void.*

* See Stephen's speech at the Legislative Council at the end of Pundit Ananda Chandra Vedantabagish's pamphlet on Brahmo Marriage.
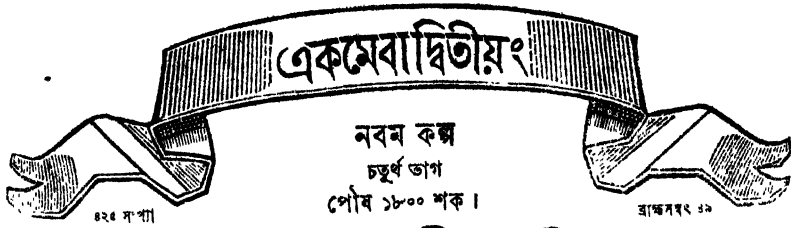
Registerd No 52.

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ১৮০০ শক।
৪২৫ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আধ্যাত্মিক জগৎ।

ভৌতিক জগতে আপাততঃ অব্যবস্থা ও অশৃঙ্খলা প্রতীয়মান হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল অত্যন্ত কঠোর। তাহা ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক বিচার করে না। পতনশীল প্রাচীরের নিকট দিয়া যদি ধার্ম্মিক ব্যক্তি গমন করেন তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া সে তাঁহাকে দয়া করিবে না। প্রকৃতি সে সময় মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম পালন করিবেই করিবে। যদি কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নৌকা হইতে স্খলিতপদ হইয়া নদী-গর্ভে পতিত হয়েন জল-নিমজ্জন দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবেই হইবে। তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া নিষ্ঠুর জলরাশি তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবে না; ভৌতিক জগতে পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে অনেক অব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ভৌতিক জগতে পুণ্যবান ব্যক্তি ক্লেশ পাইতেছেন; অসাড় অনুতাপহীন পাপী দিব্য সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে কিন্তু ভৌতিক জগৎ ভিন্ন আর এক জগৎ আছে যেখানে এরূপ অব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। সে জগতে ধর্ম্মের নিয়ম সর্ব্বোপরি প্রধান। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন, যে সর্ব্বাপেক্ষা দুই বস্তু আমার মনকে বিস্ময়-রসে প্লাবিত করে, সেই দুই বস্তু বাহ্যে অনন্ত আকাশ এবং অন্তরে ধর্ম্মের নিয়ম। ধর্ম্ম লোক-বিধরণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়াছে। ধর্ম্মের নিয়ম পালন না করিলে লোক-সমাজ এক-

দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। অচেতন ভৌতিক জগৎও ধর্ম্মের নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন কিন্তু কি প্রকারে অধীন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভৌতিক জগতে যাহা আপাততঃ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা বলিয়া প্রতীত হয় তাহা বস্তুতঃ অব্যবস্থাও বিশৃঙ্খলা নহে। ভৌতিক জগৎ সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষ দ্বারা সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মনুষ্য হইতে উচ্চতম দেবতা পর্য্যন্ত সকলই ধর্ম্মের নিয়মের অধীন। এই নিয়ম মনুষ্য হইতে উচ্চতম দেবতা পর্য্যন্ত সকলকে ঐক্য-সূত্রে বদ্ধ করিতেছে। সকলই সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের অন্তর্ভূত, ঈশ্বর স্বয়ং সেই রাজ্যের রাজা। এই ধর্ম্মরাজ্য আধ্যাত্মিক জগৎ শব্দে ব্যক্ত করা যায়।

এই আধ্যাত্মিক জগৎ ভৌতিক জগৎ অপেক্ষা যে কত সুন্দর তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রেমই সেই আধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্য্যের মূল। ধর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তি হয় না। সেই প্রেমাকর পরমেশ্বর হইতে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হইয়া সেই জগৎকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখিয়াছে। তিনি আধ্যাত্মিক জগতবাসীদিগকে প্রীতি করিতেছেন, তাহারাও তাঁহাকে প্রীতি করিতেছে। তাহারা সেই প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে প্রীতি করিতেছে বলিয়া তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম দ্বিগুণিত হইতেছে। এই আধ্যাত্মিক জগতে চিরশান্তি ও চির আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সেখানে মোহ-কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার উপকূলে ভৌতিক জগতের দুঃখ ক্লেশের তরঙ্গ প্রতিঘাত করিয়া বিলীন হয়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বদা জীবিত রহিয়াছেন। তিনি ভৌতিক জগতের সম্বন্ধে মৃতবৎ হইয়া তাহাতে জীবিতের ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহার প্রাণ সেই আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বদা পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তথায় সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বদা জীবন লাভ করিতেছেন। নিগৃহীত ধার্ম্মিক ব্যক্তির শরীর পাষণ্ড-প্রজ্বলিত-চিতায় দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার আত্মা অনুপম শান্তি উপভোগ করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ তাঁহার জীবন ভৌতিক জীবন নহে, তাহা আধ্যাত্মিক জীবন। অন্যের সম্বন্ধে যাহা দিবা তাহা তাঁহার সম্বন্ধে রাত্রি এবং অন্যের সম্বন্ধে যাহা রাত্রি তাহা তাঁহার সম্বন্ধে দিবা। যতই আমরা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দমন করিতে সক্ষম হইব ততই আমরা আধ্যাত্মিক জগতের দিকে উন্নত হইব। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া, ন্যায়-পরায়ণ হইয়া, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি যোগ নিবদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

পরকাল।

সে কাল নাই, সে সময় আর নাই, যে আমরা কেবল অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় সন্তুষ্ট মনে কর্তৃত্ব ও ধর্ম্মের শাসন সকল অবনত মস্তকে স্বীকার করিব। মানবগণকে এখন আর কেবল মাত্র সংবাদ বা উপদেশ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা যায় না। তাহারা এখন অনুসন্ধিৎসু হইয়া সমস্ত বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের মনে সন্দেহ সতর্কতা ও জিজ্ঞাসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; বিশ্বাস সঙ্কুচিত। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন আমরা সরল ভাবে সত্যের সহিত কত বিকট অসত্য সকলও অপ্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছি। উপদেষ্টাদিগের উপদেশে দ্বিধা-শূন্য মনে দেব-আরাধনা করিয়াছি এবং সেই

উপদেষ্টাদিগকে অত্যুচ্চ সামাজিক আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আত্ম বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। স্বাধীন চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া ও অন্যদীয় দারুণ আদেশ সকলকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের অঙ্গ ভাবিয়া অতি বিশ্বস্ত চিত্তে তদনুসরণ করত আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। তৎকালে আমাদের হৃদয় সরল বিশ্বাসে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও পবিত্রভাবে আপ্লুত থাকিত।

তারতম্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আমরা উপরোক্ত আদিম অবস্থায় বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর নিরুদ্বেগে ও আরামে ছিলাম। পবিত্রতা-সম্পৃক্ত একপ্রকার বিশ্বাসমূলক শান্তি দ্বারা আমাদের হৃদয় অনুপম স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিত। দেব-ভক্তি ও প্রীতির উচ্ছ্বাসে মন সর্ব্বদা পুলকে পূর্ণ থাকিত। স্বাভাবিকরূপে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিয়া আত্মাকে আমরা শীতল করিতাম। সংক্ষেপতঃ আমরা সেই আদিম কালে ধর্ম্মোৎপাদিত এক প্রকার পরম উপাদেয় অকৃত্রিম সুখ সম্ভোগ করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা গৌণ কল্পে তাহার আভাস মাত্র পাইয়া তজ্জন্য লালায়িত হইতেছি, তৎসম্ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সংশয় আমাদের সুখের বিশ্বাসকে সংক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য অনেকে বর্ত্তমান অবস্থার বিনিময়ে সেই আদিম অসংস্কৃত ও সরল বিশ্বাসের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করিতে পারেন। কারণ বিশ্বাস ব্যতীত অন্যত্র শান্তিসুখ পাওয়া যায় না। এক্ষণে হায়! আমরা সে বিশ্বাস হারাইয়াছি। *

কিন্তু সত্য বলিতে হইলে, সেই সুখের বিশ্বাস সেই অন্ধ বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়া আমরা আপনাদিগকে বঞ্চিত জ্ঞান করিতে পারি না। কেবল সুখলাভ করাই মনুষ্যত্ব নহে; সুখসহ মহত্ত্ব সংযোগ করিয়া স্বাধীন চেষ্টাতে ও জীবন্তভাবে তাহা আয়ত্ত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিশ্বাসে সুখী হওয়া অপেক্ষা জ্ঞান-সংস্কৃত সুখ ভোগ করা শ্রেষ্ঠতর। জগতে সুখী কে না? প্রাণিমাত্রেই নিজ নিজ ভাব ও শক্তি অনুসারে সুখ সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকে। কিন্তু সচেতন ভাবে উন্নতিশীল ভাবে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ মাত্রায় সুখী হওয়া কেবল মনুষ্যের ভাগ্যেই ঘটে, ইহাই মনুষ্যের একটী উচ্চতম গৌরব। অতএব বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের সমন্বয় করিয়া লইতে হইলে সন্দেহ সতর্কতা ও স্বাধীন চিন্তার আবশ্যক। সন্দেহের মূলে স্বাধীনতা নিহিত আছে। স্বাধীনতা আমাদিগের জীবন স্বত্ব। সন্দিগ্ধতাও তাই। আমরা সন্দেহহীন হইলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিব। আমাদের আমিত্ব থাকিবে না।

অতএব এখন আমরা সকল বিষয়েই সন্দেহ করি, সতর্ক হইয়া কার্য্য করি বলিয়া আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প ভাগ্যবান মনে করা, যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বে আমরা বিশ্বাসের হস্তে আমাদের স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া বিলক্ষণ আরাম বোধ করিতাম; বিশ্বাস যাহা আশা দিত তাহাতেই আশান্বিত হইতাম, সঙ্গত কি অসঙ্গত কিছুই বিবেচনা করিতাম না; এবং সুবিধার লোভে বিশ্বাস করিতাম; বিশ্বাসকে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ও তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু স্বাধীন কর্ম্মন্য শক্তি মানবীয় চৈতন্যের এরূপ ধর্ম্ম নহে যে উহার পুরোভাগে অনন্ত-প্রসারিত সত্যরাজ্য বিস্তারিত রহিবে আর উহা আরামের জন্য নিশ্চিন্ততা বা উদ-

বেগশূন্যতার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধ হইয়া বিশ্বাসের পদতলে অধিক দিন পড়িয়া থাকিবে। এই জন্য মহেচ্ছ সংশয়বাদীগণ মধ্যে মধ্যে দেখা দেন। তাঁহারা সমস্ত স্বজাতীয়দিগকে বিশ্বাসের হস্তে দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে মনুষ্যত্বের উচ্চতম অধিকার ও সত্যের উদার গৌরব স্থাপন জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েন। পুরাকাল হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু অসৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সত্যের জয় ঘোষণা করিতে বহির্গত হইয়া সত্যের অপলাপনে সম্প্রবৃত্ত হয়েন; উত্তেজনার বেগে তাঁহারা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না, এবং প্রতিবাদের মাদকতায় ঘোর সংহারের কার্য্য আরম্ভ করেন। "নাস্তি" তাঁহাদের বীজ মন্ত্র হইয়া উঠে। কিন্তু অসদ্ভাবে মানব মন সম্যক পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং প্রতিঘাতের নিয়মাধীনে এই অতৃপ্ততা হেতু চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

এক্ষণে প্রবল চিন্তাশীল একদল প্রত্যক্ষ-জ্ঞানাভিমানী প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইঁহারা আমাদিগকে অধিকতর অতৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ইঁহাদের সর্ব্বস্ব। কোনরূপ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ক্রিয়ার সাক্ষ্য ইঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন না। আমাদের অন্তরতর অন্তরতম সনাতন ভূমা পুরুষ সেই মঙ্গলময় দেবতার পরিবর্ত্তে ইঁহারা বাহ্য জগৎ হইতে একটী ইচ্ছাশূন্য অন্ধশক্তিকে বা ইচ্ছাবিশিষ্ট কিন্তু অশক্ত একটী অপূর্ণ পুরুষকে দম্ভভরে আনিয়া আমাদের আরাধনার্থ প্রদান করিতেছেন। মহাতত্ত্বানুরাগী মানব মন এরূপ হীনবল অপূর্ণ অন্ধদেবত্বে শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্থাপন করিতে পারে না। সে হয় পূর্ণভাবের পূজা করিবে না হয় অসদ্ভাবে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু এরূপ খণ্ডভাবে তাহার পুপূজিষা বৃত্তি চরিতার্থ হয় না।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে পরকাল-তত্ত্বই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। তবে ঈশ্বর-তত্ত্বের সহিত পারলৌকিক তত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে তৎ বিষয়েরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। সত্য বটে যে ঈশ্বর ছাড়িয়াও পারলৌকিক জীবন প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু ঈশ্বরশূন্য পরলোক আমাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারে না। ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিলে পরলোকে সুখ কোথায়? সে কি স্বর্গ, যেখানে ঈশ্বর নাই? স্বর্গের এত যে আকর্ষণ, এত মনোহারিত্ব ও এরূপ মহান গভীর কবিত্ব, সে কি ঈশ্বর লইয়া নহে? অতএব আমরা প্রথমতঃ ঈশ্বর-স্বরূপের সংক্ষেপ সমালোচনা করিয়া বিষয়ান্তরের অনুসরণ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত সভ্য সমাজে বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। বিজ্ঞান-চর্চ্চায় সমধিক লাভ, আমোদ ও সুবিধা পাইয়া অনেকেই তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইতেছে; অদ্ভুত অদ্ভুত শিল্প-কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে; প্রকৃতির উপর, মানব বুদ্ধির বিজয়-ঘোষণা দম্ভভরে চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইতেছে। অধুনা জড়জগতই একা প্রায় সমস্ত মানবীয় চিন্তা অধিকার করিয়া রাখিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মানব মনের প্রকৃতি এই যে, সহবাস দ্বারা উহার অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। এবং অনুরাগের মোহ প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বর্ত্তমান সময়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের প্রতি যে লোকের অশ্রদ্ধা হইবে বা তাহারা তদনুশীলনের যোগ্যতা

রক্ষা করিতে পারিবে না, ইহা এক প্রকার অবধারিত বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা জড়ের মায়ায় এমনি মুগ্ধ যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতিক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার-কালে তাঁহারা জড়-নিষ্ঠতার প্রাবল্য প্রদর্শন করেন। নিয়ত বহির্জ্জগতে মনকে নিবেশিত রাখিয়া তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করেন তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। এবং তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে ভক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানিদিগের উপদেশই প্রধানতঃ গৃহীত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে এরূপ সৎপরামর্শ দিতেও আমাদের কুণ্ঠতা বোধ হয়। যাঁহারা সকল বিষয়েরই প্রমাণ চাহেন; যাঁহারা মনে করেন সমস্ত তত্ত্বই তাঁহাদের বুদ্ধির উদ্‌গ্রহনীয়, প্রামাণিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া যাঁহারা স্পর্দ্ধাবান হয়েন; তাঁহাদের নিকট উক্ত রূপ উপদেশের সারবত্তা স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তাঁহারা ভাবিবেন যাঁহাদের মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই তাঁহাদের স্পর্দ্ধার বিষয় সেই ভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানীদিগের শুদ্ধ কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রত্যক্ষের অতীত সত্য সকল কি প্রকারে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব এই প্রামাণিক উপাধিধারী পণ্ডিতগণের স্পর্দ্ধা কতদূর সঙ্গত অগ্রে তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য হয়।

অধুনাতন প্রখ্যাতনামা অধিকাংশ পণ্ডিতগণ কোন রূপ অতীন্দ্রিয় স্বাভাবিক জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সুতরাং অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জ্ঞাতজ্ঞেয় সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বই উপার্জ্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। যাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবোধিত বা প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, তাহা অনুশীলনীয়ও নহে। কোন রূপ অতিগ (Transcendental) জ্ঞান-ক্রিয়ার বিদ্যমানতা স্বীকার করা —তাঁহাদের মতে প্রমেয় যাচ্ঞা করিয়া লওয়া অপরাধের তুল্য।

এরূপ ঈশ্বরবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে "জগতের কারণ অজ্ঞেয়"। একজন ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু জগৎ সৃজন ও পালন-কার্য্য তাঁহার ইচ্ছাকৃত কি না ইহা আমরা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই। তাঁহাদের দর্শনে "ঈশ্বর জ্ঞানাতীত জগদ্ব্যাপক শক্তি মাত্র"। অপর কেহ কেহ প্রাগুক্ত দূষিত মূল-সূত্র অবলম্বন করিয়া অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক দূর উঠিবার চেষ্টাতে ঘোর অনর্থে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা যে ঈশ্বর স্বীকার করেন তিনি ও-রূপ অজ্ঞেয় নহেন। তিনি "ইচ্ছাবিশিষ্ট জগন্নির্ম্মাতা"। তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় সাহসী হইয়াছেন। এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞান ও দয়া অসীম নহে।

আমরা প্রথমোক্ত দার্শনিকদিগের সহিত একমত হইয়া বিনম্রভাবে স্বীকার করিতে পারি যে,

"ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।"
"প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।"

"তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানে এমন লোক নাই।" "প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।" তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে অতিক্রম করেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অনন্ত ভূমা পুরুষকে কি প্রকারে ধারণ করিবে? কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহাও জানাইতে হয় যে, ঈশ্বর যদিও আমাদের জ্ঞানের অতীত তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন। মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে পায় না বটে, কিন্তু তিনি স্থির বিশ্বাসের অবিষয় নহেন। বাহ্য জগৎ তাঁহার অতি সঙ্কীর্ণ পরিচয় যাহা

নেয়, বিশ্বাস তাহাতে তৃপ্ত নহে। বিশ্বাস অন্তর্জগতের অতিগ শক্তি বিশেষ দ্বারা তাঁহার অনন্তত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাতেই বিশ্রাম করে।

ঈশ্বর ও অন্যান্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই যে বিশ্বাস ইহা স্বতন্ত্র জাতীয়। পরীক্ষা-সিদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসের মূলে সন্দেহ অবস্থিত আছে। আমরা নিশ্চয় জানি না কিন্তু ইচ্ছা পর্য্যন্ত সুবিধা বোধে আপাতত বিশ্বাস করি। যাহা বিশ্বাস করি তাহা সত্য না হইলেও হইতে পারে। অনেক সময় বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল আমাদিগকে জড় জগতের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ সকলকে অনেক সময় আমাদিগকে বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত করিয়া লইতে হয়। অতএব বুদ্ধির পোষকতায় বাহ্য জ্ঞানের সিদ্ধি হয়। কিন্তু প্রাগুক্ত বিশ্বাস সকল স্বতঃসিদ্ধ। বুদ্ধি উহার অন্যথা করিতে পারে না। অধিকন্তু বাহ্য জগতের স্থূল তত্ত্ব সকল স্থূলরূপে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অগোচরে আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করে। অতএব বাহ্য জ্ঞান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রামাণ্য অধিক হওয়া উচিত কিন্তু অভ্যাস বশতঃ আমাদিগের প্রতীতি ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা নিয়ত জড়ের চর্চ্চায় জড়ের ব্যবসায়ে নিরত থাকায় আমাদের মন জড়ানুরাগী হইয়া জড়ের গুণগ্রামকেই বিশেষ পরিচিত জ্ঞান করিয়া থাকে। এবং তাহাতেই আমাদের সমুদায় আশা ভরসা নিবদ্ধ করায় আমাদের অন্তর্বৃত্তি সকল তদনুরূপ ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের মহৎতত্ত্ব সকল আর তাহাতে স্পষ্টরূপ প্রতিভাত হয় না, ও তৎপ্রতি আমাদের যথোচিত অনুরাগও আর নাই। অপিচ যাহা অনুরাগের সহিত দর্শন করা না হয়, তাহার উপলব্ধিও তৃপ্তিকর হয় না। এই জন্য বর্ত্তমান কালের জড়পক্ষপাতী পণ্ডিতগণের অন্তরে আধ্যাত্মিক ঐশী তত্ত্ব সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। কদাচিৎ হইলেও তথায় তাহাদের মহৎ ও পবিত্র ভাব সকল রক্ষা পায় না। অতএব যাহারা ভৌতিক জগতে পরিপুষ্ট বুদ্ধিশক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার করিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাদিগকে আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা হৃদয়-গ্রন্থি সকল ছেদন করিয়া, জড়ের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, রাগের সহিত নিজ নিজ আত্মাতেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল দর্শন ও সমালোচন করিতে যত্ন করুন, দেখিতে পাইবেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল ভৌতিক সত্য অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধেয় কি না। আমাদের ঐ অনুরোধ অসঙ্গত নহে। আমরা তাঁহাদের নিকট অধিক কিছু চাহিতেছি না। আমরা চাহি তাঁহারা যথাস্থানে যথাবিষয়ের অনুসন্ধান করেন। করিলে তাঁহাদের নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীতি হইবে যে, বাহ্য জগৎ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান-সাধক বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব আদিতে উপনীত হওয়া উৎকৃষ্ট কল্প নহে।

সেই সমস্ত অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের নিমিত্ত ভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাব অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানবগণের উপলব্ধি হওয়াতে এই ভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়-নিকরের নাম অন্তঃকরণ, অর্থাৎ অন্তরের ইন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে। মানবীয় ভাষা বাহ্য জগত-সম্ভূত ভাব সমূহের প্রতিরূপ মাত্র। বাহ্য ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন করিবার জন্য পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় করার আবশ্যকতা আমাদের প্রথমতই অনুভূত হইয়াছিল। এই জন্য

আমাদের ভাষা প্রধানতঃ জড়-জগত-সমুদ্ভূত ভাব পরম্পরার সঙ্কেতরূপে গঠিত হয়। অতঃপর যখন চিন্তাশীল মনুষ্যদিগের হৃদয় অন্তর্জ্জগতের ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা তাহা ব্যক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহারা তৎভাবৎ পূর্ব্বশিক্ষিত জড়নিষ্ঠ ভাষাতে রূপক আকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। এই জন্য যদ্দারা আমরা আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকলকে আত্মসাৎ করি, তদ্বোধার্থ বাহ্য-জ্ঞান-বাহক ইন্দ্রিয়ের পর্য্যায়ান্তর সংজ্ঞা; "করণ" শব্দে "অন্তঃ" এই বিশেষণটী যোগ করিয়া ব্যবহার করার রীতি আমরা আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই। আর "জ্ঞানেন্দ্রিয়" শব্দ, আর্য্য সন্তানদিগের প্রায় নিত্য-ব্যবহৃত শব্দরূপে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে উহাকে ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করাই উচিত হয় না। ইন্দ্রিয় যাহার নিকট সংবাদ বহন করে, উহা নিজে তাহাই। উহা আত্মা। আধ্যাত্মিক মূল সত্য সকল উহার গোচর হওন জন্য কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় না। উহা স্বয়ং সেই সত্য সকলকে স্পর্শ করে, অন্যের পরিচয়ে তাহা গ্রহণ করে না। তৎ সমস্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইলেই তৎকর্তৃক পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় আলিঙ্গিত হয়। অতএব পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্য তাঁহারা বাহ্য জগৎ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অপ্রচুর সাক্ষ্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ আত্মাতেই সেই তত্ত্বসকলের মূল অধিষ্ঠিত দেখিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক ঐশী স্বভাব নিশ্চিত করণার্থ সমত্ন হউন। বাহ্য জগতে ঈশ্বরের অবচ্ছায়া মাত্র পতিত হয়। কিন্তু আত্মাতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিতে পাওয়া যায়। আত্মাতে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া প্রতীতি হইবে, যে ভূমা ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি মনের অগোচর হইলেও "আমরা তাঁহাকে জানি না" বা "জানিবার কোন উপায় নাই" এরূপ উক্তি কোন ক্রমে সত্য নহে। আত্মা তাঁহাকে অন্তরতর অন্তরতম আত্মীয়রূপে সাক্ষাৎ আলিঙ্গন করে, তাঁহাকে তৃপ্তি-হেতু রসস্বরূপ আস্বাদন করে। তিনি বুদ্ধি মনের অবিষয় হইলেও, আত্মার আস্বাদ্য বটেন।

অপরন্তু যদিও ঈশ্বরতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় হয়; বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যদিও তাহা সম্যক লাভ করা না যায় তথাচ ইহা নিশ্চয় যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহকারিতায় বুদ্ধি যে সকল প্রত্যক্ষ সত্য সংগ্রহ করে তাহা কখনই আত্মার সাক্ষাৎ-লভ্য উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না। যে হেতু উভয় প্রকার সত্য সেই এক সত্য-স্বরূপ হইতে নিঃসৃত যিনি বিশ্বের অন্তরাত্মা হয়েন। অতএব উভয় প্রকার সত্য তুল্যরূপ পবিত্র ও সমভাবে আদরণীয়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল ভৌতিক জগৎ হইতে আমাদিগকে যে সমস্ত জ্ঞানের আয়োজন করিয়া দেয়, তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে। উহারা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠতর ভাব-জগতের মুখ্য জ্ঞান আহরণ করিয়া দিতে পারে না। তদর্থে আত্মার অগৌণ বিদ্যমানতার প্রয়োজন হয়। এই মুখ্য জ্ঞানকে এই স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়কে ভিত্তিস্থানীয় করিলে, ভূয়োদর্শন দ্বারা আমরা আমাদের ঐহিক প্রয়োজনানুরূপ সমুচ্চ অধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহাতে সন্নিবেশিত দেখিতে পাই। অন্যথা মহান প্রমাদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আমাদিগের অতীন্দ্রিয় আদিম জ্ঞান এই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়কে

অসিদ্ধ ভাবিয়া কেবল মাত্র ভূয়োদর্শনের উপর আপনাদিগের জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্য স্থাপনের প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অবশ্যম্প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করাকে বুদ্ধিহীনতার কার্য্য বলেন। তাঁহারা বলেন, যখন ভূয়োদর্শন হইতেই প্রয়োজনীয় সমূহ জ্ঞানের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তখন অপ্রমাণ-বোধিত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য বিশেষ বিধান কল্পনা করা অবিজ্ঞের কার্য্য—বৈজ্ঞানিক নীতির অনুমোদনীয় নহে।

তত্ত্বজ্ঞানীরা আত্মপ্রত্যয়-বোধিত মুখ্য জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহা মূল জ্ঞান; অন্য কোন জ্ঞান হইতে উদ্ভূত বা উপার্জ্জিত কি শিক্ষিত নহে। এবং উহা আত্ম-প্রত্যয়-মূলকতা নিবন্ধন সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত ও অবশ্য-বিশ্বসনীয় সত্য তত্ত্ব। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদীরা কোনরূপ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান শক্তির সত্তা বা আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়া আমাদের বিশ্বাস-যোগ্য সমূহ প্রামাণিক তত্ত্বের উপলব্ধির প্রতি কারণ স্বরূপ কতকগুলি ভাবাসঙ্গের নিয়ম (Laws of association of Ideas) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ নিয়ম গুলি বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উদ্ভাবকদিগের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্ভাবৎ আমাদিগের বিশ্বাসী মন হইতে সহজ জ্ঞান ও স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তানুবোধকে, কোন ক্রমে অপসারিত করিতে পারিতেছে না। ভূয়োদর্শন ও ভাবাসঙ্গের উদ্দীপনা আমাদের কোন কোন জ্ঞানের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াও আমাদিগকে অনেক সময় তাহাদের সংকীর্ণতা ও অপ্রাচুর্য্য অনুভব করিতে হয়। মানব মন এমন কতকগুলি বিশ্বজনীন ও অবশ্য-বিশ্বসনীয় সত্য সহজ জ্ঞান দ্বারা দর্শন করে, যাহা প্রামাণিক সম্প্রদায়ীদিগের ভূয়োদর্শন দ্বারা কদাচ লভনীয় নহে। প্রামাণিক প্রণালীতে উপার্জ্জিত তত্ত্ব আমাদের সহজ-জ্ঞান-লব্ধ মুখ্য তত্ত্বের ন্যায় যদিচ কদাচিৎ বিশ্বজনীন হয়, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে উহা অবশ্য-বিশ্বসনীয় ও অপরিহার্য্য কখনই হইবে না। কারণ যাহা উপার্জ্জন করা যায় তাহা ত্যাগও করা যায়। যাহার আগম আছে তাহার নির্গমও আছে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীকেই দৃষ্টান্ত-স্থানে গ্রহণ করিয়া আমরা এই উক্তির সাযার্থ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করিব। পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই হইতেছে যে, উহা অচলা এবং সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপিণ্ড সকল নিয়ত উহাকে বেষ্টন করিতেছে। এবং ইহা সম্ভব যে এক সময় পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেরই প্রতীতি ঐরূপ ছিল। সুতরাং তৎকালে এই বিশ্বাস সর্ব্বজনীন বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বিজ্ঞানের উদয়ে সম্প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মন হইতে উক্ত বিশ্বাস বিদূরিত হইতেছে। এক্ষণে আবার পৃথিবীর আবর্ত্তন অনেকেরই বিশ্বাস্য হইয়াছে। পৃথিবীর দৈনিক গতির প্রকার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াও অনেকে উক্ত মতে বিশ্বাস স্থাপন করা অসাধ্য বোধ করে না। অতএব এমন সময়ও আমরা কল্পনা করিতে পারি, যখন এই বিশ্বাস সর্ব্বজনীন হইয়া উঠিবে। অন্য পক্ষে আবার ইহাও মনে করা আমাদের সাধ্য বটে যে, ভবিষ্যতে কোন উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে এই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস নিরাকৃত হইয়া সেই পূর্ব্ব-বিশ্বাস পুনঃসংস্থাপিত হইবে।

এস্থলে প্রদর্শিত হইল যে, পরস্পর-বিপরীত উক্ত উভয় প্রকার বিশ্বাস (পৃথিবীর

অবর্ত্তমানতা ও নিশ্চলতা বিষয়ক বিশ্বাস) উপার্জ্জিত। এবং উপার্জ্জিত উক্ত তত্ত্বদ্বয়ে বিশ্বাস তজ্জাতীয় অন্যান্য বিশ্বাসের ন্যায় এক সময় সর্ব্বজনীন হইতে পারে কিন্তু অবশ্য-বিশ্বসনীয় হইতে পারে না। অতএব কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়-গোচরত্ব বা যুক্তি-লব্ধত্ব নিবন্ধন কোন বিশ্বাস যে অপরিহার্য্য হয় না এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং আমাদের মনের যে সমস্ত বিশ্বাস অপরিহার্য্য তাহা ভূয়োদর্শন দ্বারা উপার্জ্জিত বলা যাইতে পারে না। আত্মার সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ বলিয়াই উক্ত প্রকার বিশ্বাসের অপরিহার্য্যতা; ও মানব মনের অবশ্য-বিশ্বসনীয় বলিয়াই তাহার সর্ব্বজনীনতা। আমাদের আত্মা আপনাকে ও আত্মেতর বাহ্য সত্তাকে ও সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, অতএব তাহার তত্তৎ বিষয়ক বিশ্বাস মন হইতে একবারে অপনীত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রামাণিক বিজ্ঞান আমাদিগকে যত প্রকার জ্ঞান আহরণ করিয়া দিউক তাহা মুখ্য জ্ঞান হইবে না। তাহা সাবলম্ব শিক্ষিত জ্ঞান। তাহা যেমন লাভ করা যায়, তেমনি পরিত্যাগও করা যাইতে পারে। তাহা মুখ্য জ্ঞানের ন্যায় অপরিহার্য্য হইবে না। কিন্তু আত্মার সাক্ষাৎ-লভ্য মুখ্য জ্ঞান অপরিহার্য্য, তাহা একবারে মানব মন হইতে অপসারিত করা অসাধ্য। সহস্র সহস্র ব্যক্তি সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেছে, তাহাদের বিশ্বাস তাহারা একই সূর্য্য দর্শন করিতেছে। বিজ্ঞান যদি গম্ভীর স্বরে বলেন—না তোমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য অবলোকন করিতেছ, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি। বিজ্ঞান যদি বলেন অমুক নির্দ্দিষ্ট দিবসে কক্ষচ্যুত কোন বৃহত্তর গ্রহের সংঘাতে আমাদের আবাস-ভূমি পৃথিবী বিচূর্ণিত হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য বিশেষ সুসাধিত হইবে, বিনত চিত্তে আমরা তাহাও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ঈশ্বর নাই, আমার আত্মা নাই, বাহ্য সত্তা অবভাস মাত্র; অথবা এই বিশ্বের আশ্রয় যিনি তিনি অপূর্ণ অর্থাৎ অশক্ত, নির্দ্দয় ও অজ্ঞান; বিজ্ঞান যদি আমাদিগকে এরূপ উপদেশ দিতে সাহস করেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উপদেশে কি আমাদের শ্রদ্ধা হয়? না তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি? পৃথিবীর গতি বিষয়ক সাধারণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মত যতদিন প্রচারিত হইয়াছে, নাস্তিকতা যদি তদপেক্ষা প্রাচীন কাল হইতে নাও হয়, অন্ততঃ তৎসম কাল হইতে প্রচারিত হইতেছে, বরং নানাবিধ আগন্তুক ও নৈসর্গিক কারণে নাস্তিকতা যেরূপ আগ্রহাতিশয্যের সহিত প্রচারিত হইয়াছে, পৃথিবী বিষয়ক উক্ত মত প্রচার সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। নাস্তিকতা প্রচারণ জন্য যত মনস্বিতা পরিচালিত যত মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়াছে, অপর মত সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। আবার নিরঙ্কুশতা-প্রার্থী শিথিল-ধর্ম্ম আত্মম্ভরি লোকদিগের (এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে) নিকট নাস্তিকতা যেরূপ সাংসারিক সুবিধার হেতুরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, দ্বিতীয় মত সেরূপ নহে। তথাচ প্রত্যক্ষের বিপরীত, পৃথিবীর গতি বিষয়ক এই মত কালে সর্ব্বজনীন হইবার বাধা দেখিতেছি না। কিন্তু আমাদের সহজ জ্ঞান ও স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের বিরোধী নাস্তিকতা সর্ব্বজনীন হওয়া দূরে থাকুক, কোন কালে উহা সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসরূপে অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। অনন্ত নরক-যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও লোকে আস্তিক মতের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং পান ভোজন ও সুখে থাকার প্রলোভন অবহেলা

করিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে যে ভূয়োদর্শন আমাদের জ্ঞান-সমষ্টির প্রচুর হেতু নহে। আমাদের অপরিহার্য্য আদিম [illegible] জ্ঞান সকল অন্য উৎকৃষ্টতর মূল হইতে সমুৎপন্ন হয়। এবং এই আদিম জ্ঞানের বিসম্বাদীভূত সত্যের সহিত মানব আত্মার যে দৃঢ়সম্বদ্ধ যোগ তাহা কিছুতেই বিয়োজিত হইবার নহে। এ যোগ আমাদের কল্পনা নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বিশ্বজনীনতা ও অপরিহার্য্যতা যদি আমাদের নিরব[illegible] আদিম জ্ঞানের সমীচীন লক্ষণ হয়, তাহা হইলে অলীকতাও তাহার অপর লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, যে হেতু অলৌকিক ভূতের ভয় সার্ব্বজনীন ও অপরিহার্য্য তাহা হইতে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে দেখা যায় না। তর্কের সময় তাঁহারা ভূতের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিতে উদ্যত হয়েন, কিন্তু বিজন অন্ধকারে [illegible] স্থানে তাঁহাদের মনে স্বতঃ ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ভয়ের অস্তিত্বে, গূঢ় বা ব্যক্তভাবে ভয়ের কারণ ভূতে বিশ্বাস অনুমিত হইতে পারে। অতএব সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত ও অপরিহার্য্য হইয়াও কোন কোন বিশ্বাস অমূলক হইবার অসম্ভাবনা নাই।

আপত্তিকারিদিগের প্রতিবাদের উত্তরে এরূপও বলা যাইতে পারে যে ভূতে বিশ্বাস যে নিতান্ত অলীক, ইহা এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে অবধারিত হয় নাই। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালের সুসভ্য দেশের অনেকানেক অধিবাসীদিগের বিশ্বাস এই যে প্রেতাত্মারা সময়ে সময়ে মানবীয় ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়া থাকে। তাঁহারা প্রেততত্ত্ব নামক স্বতন্ত্র বিদ্যার উদ্ভাবন করিয়াছেন। যত দিন না তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করা যায়, ততদিন আপত্তিকারিদিগের উক্ত আপত্তি সম্যক ফলোপধায়ী হইতেছে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভূতে বিশ্বাস অপরিহার্য্য নহে। স্থান বা অবস্থা বিশেষে অবিশ্বাসকারিদিগেরও মনে ভূতের ভয়ের উদ্রেক হয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না যে, ভূতে বিশ্বাস অত্যজ্য অর্থাৎ অবশ্য-বিশ্বসনীয়। আদিম বিশ্বাস সকল এই জন্য অত্যজ্য যে, তাহাদের আশ্রয় ব্যতীত আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস-সমষ্টি দাঁড়াইবার স্থান পায় না—সন্দেহের আঘাতে আমূলত অস্থির হইয়া উঠে। প্রত্যুত আমাদের মনন-ক্রিয়ার এই সকল আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভূতে বিশ্বাস সেরূপ প্রয়োজনীয় নহে। উহা মূল বিশ্বাস নহে। ইহা সে জাতীয় বিশ্বাস নহে, যাহা আত্মার সাক্ষাৎ সমীক্ষণের ফল। ইহা ভয়জনিত-ক্ষীণ-যুক্তি মূলক বিশ্বাস। আত্মার অমরত্বরূপ মূল বিশ্বাস বিশেষের প্রসূত বলিয়া উহা প্রায় বিশ্বজনীন হইয়াছে। উহার অলীকতা সপ্রমাণ হইলে উহা দুস্ত্যজ হয় না। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় সকল দুস্ত্যজ্য।

ক্রমশঃ

বৈদিক ঋষিদিগের ধর্ম্মভাব।

আর্য্যসমাজ চিরকালই ধর্ম্মপ্রবণ। বৈদিক কালে ঋষিদিগের চিত্ত স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। ঋষিগণ প্রকৃতির আশ্চর্য্য ঘটনাবলীতে ঐশী শক্তি দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা যত দেবগণের স্তব করিয়াছেন, সকলকেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকল্যাণকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবের স্তব করিয়াছেন এবং প্রত্যেক দেবের স্তুতিকালে তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে আমরা আর

দেখিতে পাই যে ঋষিগণ যখন কোন দেবতার স্তব করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন তখন সেই দেবতাই তাঁহার মনের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি অন্য দেবগণের কথা যেন বিস্মৃত হইয়াছেন এবং সেই দেবতাকেই প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিযুক্ত বিশ্বব্যাপী বিশ্বদেবঃ বলিয়া স্তব করিতেছেন। ঋগ্বেদে যদ্যপি আমরা বহুসংখ্যক দেবতার স্তুতি ও পূজা দেখিতে পাই, কিন্তু সকল দেবতাকেই এক ঈশ্বরের নামভেদ বলিয়া বোধ হয়। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে আমরা স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই যে "তাহারা তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া স্তুতি করে; কিন্তু তিনি একমাত্র দিব্য গরুত্মান্। বিপ্রেরা এক অদ্বিতীয় তাঁহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহুনামে স্তুতি করে।" আবার প্রথম মণ্ডলের ৮৯সূক্তের দশম ঋকে আমরা দেখিতে পাই যে,সমস্ত জগৎ এক সর্ব্বব্যাপী সৎবস্তুর বিবর্ত্তমাত্র। এস্থলে অদিতিকে এই সর্ব্বব্যাপী পদার্থ বলা হইয়াছে; যথা অদিতি দ্যুলোক, অদিতি অন্তরিক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি পিতা, অদিতি পুত্র, অদিতি সকল দেবতা, অদিতিতে জাত পদার্থ সমূহ, অদিতি জনিষ্যমান পদার্থ সমূহ এবং অদিতি (গন্ধর্ব্ব পিতৃগণ, দেবগণ, অসুর রাক্ষস) পঞ্চজন।' এস্থলে বেদান্ত দর্শনের মত স্ফুট ব্যক্ত হইয়াছে। দশম মণ্ডলে ৮১ এবং ৮২ সূক্তদ্বয়ে বিশ্বকর্ম্মা দেবের গুণকীর্ত্তন আছে। এই দুই ঋকে বিশ্বকর্ম্মাকে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন বাক্য ও মনের অগোচর বিশ্বনিয়ন্তা বলা হইয়াছে। এই দুইটি সূক্তের প্রথমটির ৪ ঋকে কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সে বনই বা কি এবং সে কাষ্ঠই বা কি যাহা হইতে বিশ্বকর্ম্মা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? এবং কি পদার্থের উপর অবস্থান করিয়া বিশ্বকর্ম্মা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন?" কবি ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণকার ইহার উত্তর দিয়াছেন "ব্রহ্মই সে বন এবং ব্রহ্মই সে কাষ্ঠ যাহা হইতে বিশ্বকর্ম্মা জগৎ রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মই সে আধার যাহার উপর অবস্থান পূর্ব্বক তিনি বিশ্বরচনা করিয়াছেন।" এস্থলে বিশ্বকর্ম্মা শব্দে পৌরাণিক বিশ্বকর্ম্মা নহে। অষ্টম মণ্ডলে ৮৭ সূক্তে ইন্দ্রকে বিশ্বকর্ম্মা এবং বিশ্বদেব বলা হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে পূর্ব্বোক্ত ভাবের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে; যথা "সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই সৎ বা অসৎ ছিল না; আকাশ ছিল না; দ্যুলোক ছিল না। কি আবরণ ছিল? কি আধার ছিল? উহা কি জল? তখন মৃত্যু ছিল না সুতরাং অমরত্বও ছিল না। তখন দিবা রাত্রির প্রভেদ ছিল না। স্বাশ্রিত এক সৎ স্থিরভাবে বিদ্যমান ছিল। এই এক সৎ কি কি পদার্থ সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার চিন্তা করিলেন এবং ঐ সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তদনন্তর এই জগৎ সৃষ্টি হইল এবং তৎপরে দেবগণ সৃষ্ট হইলেন। কে বলিতে পারে কি রূপে এই সমস্ত উৎপন্ন হইল; কারণ কেহই ইহার তত্ত্ব অবগত নহে।"

এই সূক্তের ভাব কবি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মহিমা চিন্তা করিয়া কবির মন সন্দেহদোলা আরোহণ করিয়াছিল এবং কবি কি লিখিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া উপরিউক্ত অস্ফুটভাবে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে "ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি" তখন মৃত্যু ছিল না, সুতরাং অমরত্ব ছিল না। এই অংশের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এস্থলে কবি অতিসূক্ষ্ম ন্যায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মরত্ব থাকিলে তবে ইহার বিপরীত অমরত্ব থাকিবে, মৃত্যু থাকিলে তবে মরত্ব থাকিতে পারে। যদি মৃত্যু থাকে তবেই বলা যায় উনি মর কারণ উহাঁর মৃত্যু আছে এবং উনি অমর কারণ উহার মৃত্যু নাই। যদি মৃত্যুই না থাকিল তবে কে মর এবং কে অমর তাহার বিনিগমনা অসম্ভব হইল। অতএব তখন মৃত্যু ছিল না সুতরাং অমরত্বও ছিল না। শার্ম্মণ্যদেশীয় পণ্ডিত মোক্ষমূলর এই ন্যায়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং তদনুসারে অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ইহা লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন। এই সূক্ত অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে ঘোরতর আলোচনা দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরও উপনিষদে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সূক্ত আশ্রয় করিয়া বিবিধ দার্শনিক মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবতি সূক্ত বৈদিককালে ধর্ম্মভাবের আর একটি নিদর্শন। এইটির নাম পুরুষ-সূক্ত, ইহাতে পরমপুরুষ স্বশরীর যজ্ঞে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সূক্তে যজ্ঞবাহুল্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার শেষাংশ অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ বলিয়া আমরা উহার উপর কোন মতামত প্রকাশ করিব না। আমরা প্রথমাংশ হইতে আর্য্যসমাজের ধর্ম্মভাব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। "পুরুষ সহস্রশীর্ষবিশিষ্ট, সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট এবং সহস্রপাদবিশিষ্ট। পুরুষ বিশ্বভূমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এই জগৎ যাহা ভূত, যাহা বর্ত্তমান যাহা ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষ। পুরুষ অমৃতত্বের ঈশ্বর।" এস্থলে পরব্রহ্মকেই পুরুষ বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বজগদীশ্বর বলিয়া সহস্রশীর্ষবিশিষ্ট; সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশ্ববেদা বলিয়া সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট এবং সর্ব্বজগদ্ব্যাপী ও সর্ব্বভূতগত বলিয়া সহস্রপাদবিশিষ্ট। সমস্ত ভূত, বর্ত্তমান এবং ভব্য জগতই পুরুষের রূপভেদ মাত্র। পুরুষ নিত্য, অমৃতানন্দময়। একব্রহ্মের অর্চ্চনাই বৈদিক ঋষিদিগের ধর্ম্মের মুখ্য ভাব। যদিও ঋষিরা ইন্দ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবগণের পূজা করিয়াছেন কিন্তু সকলকেই এক সৎ ব্রহ্মের ভেদ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অথর্ব্ববেদেও এই পুরুষসূক্তের অবিকল প্রতিকৃতি একটি সূক্ত আছে। ইহার ভাবও ঋগ্বেদের সূক্তের ন্যায় অস্ফুট। শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষকে নারায়ণ বলা হইয়াছে এবং লিখিত আছে যে পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববিশ্বময় হইতে কামনা করিয়া সর্ব্বমেধ যজ্ঞ করেন। সর্ব্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা তিনি সর্ব্বাতিগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদে স্কম্ভ সূক্ত নামে এক সূক্তে পুরুষের অচিন্ত্য অব্যক্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, এবং অথর্ব্ববেদে এতদ্বিষয়ক বিস্তর আন্দোলন আছে, কিন্তু তৎসমুদায়ের সার মর্ম্ম উপরি যাহা প্রকটিত হইয়াছে তদধিক নহে।

নিরুক্তকার যাস্ক একস্থলে বলিয়াছেন যে যদ্রূপ এক ব্যক্তি কর্ম্মভেদে হোতা উদ্গাতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু ইত্যাদি বহুবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ এক ব্রহ্ম স্বীয় মহিমা এবং কার্য্য বৈচিত্র বশত বহুবিধ দেবে পরিণত হইয়াছেন। উপাসকেরা যখন যেভাবে তাঁহার স্তব করিয়াছেন তখন তাঁহাকে তদুপযোগি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার অসংখ্য নাম উদ্ভূত হইয়াছে। এবিষয়ে একটি ঋক প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে; যথা

'ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥'

হে মনুষ্যগণ তোমরা তাঁহাকে জানিলে

না, যিনি এই ত্রিভুবন উৎপাদন করিয়াছেন এবং যিনি তোমাদের সকলের [illegible] হইয়া তোমাদিগের অন্তরে রহিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে জানিলে না, যদিও তিনি তোমাদিগের শরীরের মধ্যে আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন।" ইহার কারণ এই যে তোমরা অজ্ঞানরূপ নীহারে আচ্ছন্ন রহিয়াছ, বৃথা জল্পনাতেই সময় নষ্ট করিতেছ, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখে মোহিত এবং পরিতৃপ্ত হইতেছ এবং বাহ্য যাগাদির আড়ম্বরেই সময় অতিবাহিত করিতেছ। তোমরা সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ামক, বিশ্বব্যাপক পুরুষকে জানিতে চেষ্টা করিলে না, জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চাহিলে না, ইন্দ্রিয়-সুখকে ধর্ম্মের অনুগত করিলে না এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপাসনায় রত হইলে না। অতএব তোমরা তাঁহাকে জানিতে পারিলে না।" উপরি যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বারা বৈদিক সময়ে ঋষিদিগের ধর্ম্মভাব এক প্রকার বোধগম্য হইবে। আর্য্যসমাজ ক্রমশঃ যত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আর্য্যসমাজের ধর্ম্মভাব বিকসিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উপনিষদে এই ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা, উপনিষদে এই ধর্ম্মভাব সম্বর্দ্ধিত, এবং সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। এস্থলে অধুনাতন বঙ্গসমাজে ধর্ম্মভাব বিষয়ে দুই এক কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। অধুনা বঙ্গদেশে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। সমাজের নিমিত্ত যে কোন একটি বন্ধন আবশ্যক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মনুষ্যের চিত্ত পাপের দিকে স্বভাবতঃ প্রবণ। সাধারণকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য উত্তেজনা চাই, শাসন চাই। আমরা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল গণনা করিয়া সেই কার্য্য করি না। আমাদিগের কার্য্যকারী মানসিক বৃত্তি সমূহ [illegible]।

এই বৃত্তি সমূহ যদি সৎপথে চালিত না হয়, তবেই সমাজের অনিষ্ট ঘটে। এই বৃত্তি সমূহকে সৎপথে চালন করিবার নিমিত্ত একটি শাসন আবশ্যক। ইহা রাজবিধি দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, যেহেতু রাজবিধির কার্য্যকারিতা নিবৃত্তির দিকে অতি সংকীর্ণভাবে প্রসৃত। ইহা সাধারণ মতের দ্বারা সাধিত হয় না, যেহেতু সাধারণ মত বাহ্য শক্তি, সাধারণ মতের শাসন কেবল কার্য্যের উপর, মনের উপর নহে। মনের পাপেচ্ছা সাধারণ মতের অধিকারায়ত্ত নহে, ইহা কেবল মনের পাপেচ্ছা পাপে পরিণত হইলে তাহা সংশোধন করিতে পারে। অতএব রাজবিধি কিম্বা সাধারণ মতের দ্বারা সমাজশাসন হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; ধর্ম্মভাবই কেবল উপরি উক্ত বৃত্তিসমূহকে সৎপথে চালিত করিতে পারে এবং সমাজকে পাপের দিক হইতে ফিরাইতে পারে। ধর্ম্মভাব আভ্যন্তরীণ শক্তি। ইহা মানসসংশোধনে বিশেষ পটু। মনের অগোচর পাপ নাই—মনে যে কোন পাপেচ্ছার উদয় হইলে ধর্ম্মভাব তাহা নিবারণ করিতে একমাত্র সক্ষম। ধর্ম্মভাবের দ্বারা পাপ হইতে বিরতি, সৎপথে রতি, উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উন্নতি প্রভৃতি সাধিত হয়। ধর্ম্মভাব সমাজের হিতকর, মঙ্গলময় যথার্থ জ্ঞান ধর্ম্মভাবের পরিপোষক, বিজ্ঞান ধর্ম্মভাবের পরিবর্দ্ধক, সুতরাং জ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্মভাবের লোপ হয় না। জ্ঞান কোন কালেই সীমার অন্তর্বদ্ধ হইবে না, কারণ জ্ঞান বৃদ্ধিশীল এবং তজ্জন্য চিন্তা, অনুসন্ধান আবশ্যক। এই অনুসন্ধান ধর্ম্মভাবের প্রতিকূল নহে। ধর্ম্মভাব সমাজ হইতে লুপ্ত হইলে সমাজ দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ, নির্জীব ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। বঙ্গ সমাজে অধুনা এই কারণ [illegible] ধর্ম্মভাবের অপচয় ও লোপ

করিবার আশা ও ইচ্ছা বলবতী দৃষ্ট হয়। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ শোচনীয়। অধুনাতন বঙ্গসমাজে শিক্ষিত বিভাগের অধিকাংশই হয় ধর্ম্মে উদাসীন না হয় নাস্তিক। ইহাঁরা কেবল হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা দেখাইয়া, হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত নহেন, কিন্তু ইহাঁরা ধর্ম্মভাব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সমাজ মধ্যে এতাদৃশ ধর্ম্মভাবের অপচয় দেখিলে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হই। ইহা সমাজের মঙ্গলকর নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের যে মত হউক না কেন, ধর্ম্মভাবের উপকারিতা সকলের স্বীকার করা উচিত। ধর্ম্মভাব সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মভাবের অপচয় হইলেই, নীতির অপচয় হয় এবং তাহাই সামাজিক অমঙ্গল। ঈশ্বরের নিকট একান্তচিত্তে আমরা প্রার্থনা করি যে বঙ্গবাসীগণ ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতা, উপযোগিতা এবং সমাজ সম্বন্ধে উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বঙ্গসমাজ হইতে ধর্ম্মভাব উড়াইয়া দিতে চেষ্টা না করেন। ধর্ম্মভাব বঙ্গসমাজ অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায়।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড। সূত্রস্থান। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্র। ১৮০০ শক। মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র।

ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদীয় চরক, শুশ্রুত, আত্রেয় সংহিতা, হারীত, বাগ্‌ভট, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসরত্নাকর ও ভাবপ্রকাশাদি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল সঙ্কলিত হইয়া তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহ অন্যান্য পরিচ্ছেদের তত্ত্ব সকল যথাযোগ্য পদ্ধতি ক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থান্তর্গত প্রধান প্রধান বিষয়ের নিম্নে লিখিত সংক্ষেপ বিবরণ দ্বারা পাঠকবৃন্দ গ্রন্থের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন।

(১) আয়ুর্ব্বেদ লক্ষণ
(২) আত্রেয়, চরক, সুশ্রুত, চক্রপাণি এবং ভাব মিশ্রের গ্রন্থ প্রচার।
(৩) শল্য তন্ত্র লক্ষণ (অস্ত্র চিকিৎসা)
(৪) দ্রব্যের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা
(৫) তৈল মূর্চ্ছা বিধি
(৬) স্নেহ পাক
(৭) অরিষ্ট বিধি
(৮) কাদম্বরী, বারুণী প্রভৃতি সুরার লক্ষণ
(৯) বমন বিধি
(১০) বিরেচন বিধি
(১১) বস্তি কর্ম্ম (পিচকিরি দেওয়া)
(১২) স্বেদক্রিয়া
(১৩) রক্তমোক্ষণ নিয়ম
(১৪) লবণ, অম্ল, মধুর, কটু, তিক্ত কষায়, ষড় রসের গুণ
(১৫) দিন চর্য্যা
(১৬) রাত্রি চর্য্যা
(১৭) ঋতু চর্য্যা
(১৮) ব্যায়ামের বিধি
(১৯) ভোজনাদি বিধি
(২০) বয়োবিভাগ
(২১) চিকিৎসা বিধি
(২২) চিকিৎসকের লক্ষণ
(২৩) নাড়ী পরীক্ষা
(২৪) জিহ্বা পরীক্ষা ও মূত্র পরীক্ষা
(২৫) সর্পাস্য, কুঠারী করপত্র প্রভৃতি যন্ত্রের বিবরণ
(২৬) স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর সংখ্যা ও নিরুক্তি।

এই গ্রন্থের বিষয় সকল যেরূপ গুরুতর, লিখন-প্রণালী তেমনই প্রাঞ্জল এবং মুদ্রাঙ্কন

কার্য্যও সেইরূপ সুন্দররূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আর্য্য ঋষিদিগের চিকিৎসা বিদ্যার যে কি অসামান্য নৈপুণ্য ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজি চিকিৎসা বিদ্যায় যে অস্ত্র চিকিৎসা এখন মহা গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ভারতে বহু শতাব্দীকাল পূর্ব্বে সেই অস্ত্র-বিজ্ঞানের মহোন্নতি হইয়াছিল। গ্রন্থে যে সকল আয়ুর্ব্বেদ-প্রতিপাদিত অস্ত্রের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকগুলি দেখিতে ইংরাজি অস্ত্রের ন্যায়। নর-দেহ-পরীক্ষা ও শবচ্ছেদ পূর্ব্বক তাহার অভ্যন্তরিক স্নায়ু শিরা পেশী অস্থি উপাস্থি এবং রক্তাধার,হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, পাকাশয়, মুত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রজ্ঞান ও তাহারদিগের প্রকৃতি ও কার্য্য-পদ্ধতি অবগত হওয়াই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি; আর্য্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন যে শস্ত্র-চিকিৎসা চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য পরিজ্ঞেয়। যাঁহারা তাহা না জানেন, তাঁহারা কুবৈদ্য শব্দের বাচ্য।

ছেদ্যাদিষনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যোনৃপদোষতঃ॥

উপর্য্যুপরি ভারত-রাজ্য কয়েক শতাব্দী কাল বিজাতীয় শাসনাধীনে অবস্থান করাতে আর্য্য জাতির সংস্কৃত সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির যেমন অধোগতি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রাণদ আয়ুর্ব্বেদও লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। ঈশ্বর-প্রসাদে নানাকারণে এখন যে ভারত সন্তানগণের সেই জগৎ-পূজ্য পূর্ব্বপিতৃপিতামহদিগের কাল-প্রোথিত অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে. এটী আর্য্যসমাজের একটী মহা মঙ্গল চিহ্ন বলিতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ যে পৃথিবীর বহুতর জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্রের একমাত্র জনক জননী, তাহা পুরাবৃত্ত-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহাপুরুষগণ নিঃসংশয়ে অবধারণ করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আরবেরা আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে অনেক লইয়াছে এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইউরোপীয়েরা লইয়াছে। অন্য জাতি এ বিষয়ে আমাদিগের নিকট ঋণী কিন্তু আমরা বিজাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া মুশলমান রাজত্বের সময় হাকিমি, ইংরাজ অধিকারে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া এমনই দেখাইতেছি যে ভারত ভূমিতে বৈজাতিক চিকিৎসার শুভাগমন না হইলে যেন ভারতবর্ষ জন-শূন্য হইয়া পড়িত। আমরা কেবল জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া দিন দিন অধিকতর রূপে ইউরোপীয়দেরই মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। আমরা না জানিয়া শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকি যে আমাদের শারীর বিদ্যা ছিল না, কিন্তু ভিন্ন দেশীয় অনেকানেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষতঃ সুবিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব মহোদয় তাঁহার "হিন্দু সিস্টেম্ অব্ মেডিসিন" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর স্থান লিখিত হইয়াছে*। শারীর বিদ্যা না থাকিলে প্লীহা, যকৃৎ, কণ্ঠনালী, হৃৎপিণ্ড, প্লাকাশয়, মুত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্ররোগ-বিশিষ্ট সমুদায় চিকিৎসক-পরিত্যক্ত কঙ্কাল-অবশিষ্ট বহুতর রোগীগণ যে কেমন করিয়া বৈদ্যচিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তাহা একবারও চিন্তা করি না। আর্য্যঋষি-

* Commentary on the Hindu system of Medicine. By T. A. Wise M. D. New Issue, London 1860, page XVI.

বিদ্যার যন্ত্রজ্ঞান না থাকিলে তাঁহারা কদাচ যান্ত্রিকরোগের অব্যর্থ ঔষধ সকল উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এই অবনতির অবস্থাতেও যদি কিছু তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব থাকে তবে কাশ, যক্ষ্মা, রক্তাতিসার, বহুমূত্র প্রভৃতি যান্ত্রিক রোগেরই চিকিৎসা জন্য। বর্তমান [illegible] চিকিৎসকদিগের মধ্যে শস্ত্র-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আলোচনা এবং শব-চ্ছেদ শিক্ষা না হওয়া একটী দোষের কারণ। বিনোদ বাবু বিজ্ঞতা পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অর্থ ব্যয় দ্বারা ক্রমে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের অভাব পূরণ হইতে চলিল। আমরা ইতঃপূর্বে উঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট উপহারই প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহার সাধু কামনা সংসিদ্ধ হয়, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এই গুরুতর বিষয়ে —এই জাতিগত গৌরব সম্পাদনে দেশ-হিতৈষী ধনাঢ্য জনগণ একটু উৎসাহ দানে অগ্রসর হইলে আমাদিগের একটী লুপ্ত কীর্তির পুনরুদ্ধার হয়; তাহাকে ভারতে [illegible] সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

EXTRACT.

(STATESMAN, Nov 5 1878.)

It is impossible of course to suppose that so obvious a reflection has not occurred to a multitude of minds, but it is still the fact that we have never yet seen the consideration [illegible] so strongly as it might be, upon the [illegible] school of which Darwin, Huxley, and [illegible] are the great apostles, that the theory [illegible] Personal God from the [illegible] makes man himself— [illegible] Personal God we mean simply a Supreme Will and Intelligence in Nature, [illegible] Will and Intelligence are declared by a process of reasoning to have no necessary existence, while the gulf is then boldly leaped to the assertion that they *have no* existence. This conclusion is wrought out with great ability and in the most uncompromising form in an article on *Theism* that appeared in the *Westminster Review* of October, 1875, in which the writer joins issue with the central thought of Paley's *Natural Philosophy*, that evidence of design proves the antecedent existence of a designer. The line of argument taken is that what Paley, and the world at all times have been accustomed to regard as evidences of design in Nature, prove nothing of the kind. The writer of the essay, which is an extremely able one, is careful not to shock the reader by summarily assuring us that every material phenomenon that exists is the product of a fortuitous concourse of atoms, but such is the conclusion to which he leads up by a process of ingenious and subtle reasoning the hollowness and general fallacy of which are *felt* with more certainty than they are intellectually discerned. We lay down the *Review* with very much the same feeling with which we rise from a perusal of Edwards on the *Freedom of the Will*. Though unable to detect any flaw in the reasoning, we feel that the writer has [illegible] himself and us in conclusions which our consciousness repudiates as untrue. The conclusion is felt to be [illegible] by which alone we discern that two and two make four. We can not [illegible] and two do not make three or five: we simply *discern* that they do not [illegible] the belief that they do not rest upon what is sometimes called the universal postulate. The highest assurance we can attain to on any subject, rests upon the assumption that what our consciousness tells us *is* and *must* be true, is true. With a process of reasoning, therefore, like that employed by Edwards to establish that no such thing as freedom of the will is possible, we have to make our election between what is declared to be *true*, on the strength of a chain of a reasoning, or what our consciousness, in opposition thereto, declares to be so. As [illegible], no man yet succeeded in divesting himself of the consciousness that there is a self-determining power in his nature, however great the mystery of its existence, or however much opposed to the conclusions of a course of reasoning on the subject.

"In the same way, we do not believe that

the human mind exists that is really able to accept it as a fact, as the very truth of things, that the eye, with its wondrous mechanism of a daptations to the condition of things around it, is really but "a fortuitous concourse of atoms." We may by a series of assumptions and chain of reasoning, construct for ourselves a mental telescope through which the only Universe we are able to discern is a nebulous diffusion of gases, or a fortuitous assemblage of atoms, and then boldly leap to the conclusion that, as a fact, this *is* the Universe, that neither Intelligence nor Will ever had place in the Infinities, or the Eternities, around us; but the human mind is so constituted that by no effort can it leap this gulf to firm footing on the other side. The human consciousness—the ultimate court of appeal in the case—is so overwhelmed by the evidences of Power guided by Intelligence that crowd upon its observation, that it rejects with impatience, and ever must so reject, wire-drawn reasonings on the subject that have to be rendered by an instrument so notoriously feeble and misleading as human language. The fallacies suggested by a long verbal puzzle are pressed upon our acceptance as the facts of things, in opposition to the strongest evidence which our nature admits of our recording in the case. The question between the Materialist school and ourselves resolves itself into their demand that we should accept conclusions as to the Universe, that the human 'consciousness' rejects as impossible, and that, in boldly denying the existence of a Personal God in the Universe, positively require us to declare that we believe Man to be himself—God; or at all events the only Being in the Universe who, so far as we know, is possessed of these two mysterious and *preter*-natural powers of Will and Intelligence.

And the reflection which surprises us is that we have never seen this consideration sufficiently pressed upon the school which tells us with such amazing confidence that there is neither Will nor Intelligence in the Universe outside man himself, or creatures that have been produced in the same way. We are asked to accept it as a *fact*, be it remembered, and not as a mere speculation, that the Will and Intelligence, the existence of which it is not possible to deny in man, are the fortuitous outcome of the diffused nebulous gases or concourse of atoms, that are declared, as a *fact*, to be the Universe in its original form. The flower with its exquisite beauties, the mind with its subtle powers, are the fortuitous outcome of a dead, inorganic Universe of atoms diffused as gases throughout space, and in which these extraordinary powers of evolution necessarily, though unconsciously, reside. By the hypothesis, it is an accident only that the Universe of order and beauty and mystery has been evolved therefrom, with Will and Intelligence crowning the wondrous edifice that *chance* has begotten. Now we say that such a conclusion is impossible to a well-ordered and unbiassed mind. The human mind is so constituted that it rejects, and ever must reject, such a belief, however ingeniously it may be pressed upon it by reasoning. We are more sure that the reasoning is false, than that such a conclusion is true. It is simply impossible for man to believe what this school on the strength of their feeble observations, research, and reasoning present to him as their theory of the Universe. The same consciousness that makes us sure that two and two are not five but four, tells us that the theory must be false: and that the world of beauty and design in which we find that mystery, the conscious *ego*, was never produced in *this* way. We are in the midst of a world existing under conditions of design and adaptation that overwhelm the mind with astonishment, admiration and awe. It is useless to enter upon any wire-drawn argument, with the feeble instrument of human language, to persuade us that what we deem 'design' and 'adaptation' need not necessarily be so. The well-ordered mind, reflecting on the feebleness of the 'powers' engaged in this inquiry—that they are bounded by the five dull senses of the creature that presumes so vast a flight upon their observations—and that for anything we know or can presume to the contrary, there may be creatures endowed with fifty senses instead of five revealing to them a thousand Universes beyond that which man discerns in the same cosmic order—will ever reject with something of contemptuous indignation the assurance of the fool that "there is no God." Let not this language be deemed too strong; for we have this con-

clusion boldly and impiously pressed upon us, without any 'circumlocution' whatever, in the writings of Professor Draper and others of the school. Casting their material 'observations' to the winds, treating them in fact with the same contempt which they shew for the study of mental and emotional phenomena, just as *real* as their material facts—for we are in this predicament, that both must be regarded as real or neither—we ask these five-sensed, creeping, feeble things how they have come to *know* there is no God? For it is easy to shew, as Mr. Foster in his *Essays* long since pointed out, that the assertion, as a fact, *that there is no God*, implies that the being who makes it is himself God. The reader will observe that it is not as a 'speculation' that this conclusion is being pressed upon the world to-day by the whole Materialistic school, but as a 'fact.' We are told by the Professor, for instance, that it is as certain 'there is no God,' as that two and two make four. The Professor *knows* the fact, and is impatient that any one should question it. Now look at this five-sensed Professor steadily for a moment or two. He is an almost infinitesimally small creature in this universe upon the nature and origin of which he dogmatises. *All* that he knows of it is what his five feeble senses have observed, and what that "infinitely little" instrument, human language, has taught him. He knows nothing more whatever. He has seen a little, smelt, tasted heard, and felt a little an atomic little, and that is the whole range of what he calls his personal knowledge. Confessedly, the five instruments of his knowledge are so feeble and dull, that what he 'sees' is no more than what his eye, assisted it may be by microscope and telescope, enable him to see. And then it is allowed that after all, he does not 'see' the very thing itself, but the picture of it that the mechanism of his eye frames for his brain. He has never in fact really 'seen' anything to this hour, and knows it just as well as we do. Beyond the infinitely small 'personal' knowledge thus gained by him, he has by the use of that most feeble and unsatisfactory instrument we call 'language,' reflected and reasoned upon this 'personal knowledge,' and the personal knowledge of other men communicated to him by so imperfect an instrument that he never can be sure he really grasps the idea as it exists in other minds. So imperfect and partial is the knowledge that he possesses that he is astonished to learn in the midst of his 'certainties,' that the possibility of a space of *four* dimensions is drawing upon the minds of his mathematical compeers, while for anything he or they *know* to the contrary, space of twenty dimensions may exist as well as of *four* and twenty senses as well as his poor feeble *five*. And this miserably feeble creature, on the strength of his knowledge, dares lift up his voice to the Universe—of which he *knows* literally nothing whatever—and boldly tells it that he knows *all*: in particular, he knows that "*there is no God.*" Is it not clear as the noon-day that unless Man is himself God, in other words unless he has himself measured the Infinities, lived through the Eternities, and exhausted the facts of the Universe—he cannot *know* that 'there is no God?" How easily is it conceivable that the addition of a sixth sense to his powers, might present to even him, the overwhelming proof and consciousness of that which he now so impiously and wildly denies! We need not pursue the train of thought. It is to ourselves amazing that men of this school should make the daring flights they do upon the strength of the feeble powers of man. No truly philosophic mind can regard their attitude but with astonishment. The contempt which the school expresses for the study of mental phenomena, has probably reached its present insane development under the influence of the Positive Philosophy. Comte discredited metaphysical and moral studies, on the ground that they dealt with the 'unknowable,' while these materialistic philosophers have leaped the gulf to a bold declaration that the 'unknowable' has no existence. That an emotion of pity, awe, or reverence passing though the mind, is as real a phenomenon as the passage of an electric current through a wire, seems never to enter the minds of those philosophers. The one, is as *real* as the other, and the Positivist attempt to exclude Mental and Moral phenomena from the curriculum of human studies has been developed by the Materialistic school into a virtual denial of Intellectual and Moral phenomena altogether. They are idly dismissed as a mere product of the 'orga-

ment with which they are associated, while their extreme subtlety is made an excuse for neglecting their observation as being essentially 'unknowable.'

And yet it is *here* that the human consciousness instinctively finds God. One-half, and by, for the greater half, of our conscious being is thus deliberately excluded from the sphere of human research by the Positivists, on the ground that it is a region of the unknown where the human race in its infancy and early manhood loved to expatiate, but that should be avoided in its mature life for the realms of Positive knowledge. With the Materialistic school the 'unknowable' becomes the 'nonexistent,' the gulf between the two being boldly leaped, and all study of the Intellectual and Moral nature of man treated as though it dealt with unrealities. There is reason, we think, to fear that this school is influencing the public life of England very disastrously. The idea of righteousness, of purity, of duty, necessarily disappears with such systems of philosophy in the ascendant. "The fool hath said in his heart, there is no God" and lives accordingly. It is impossible not to see how largely the London press practically reflects this unhappy delusion. "Greed of material gain, fear of material loss," are openly proclaimed to us as the principles upon which our conduct towards other nations should be regulated, while the Divorce Court becomes the staple of one-half the literature society provides for itself. In trying to banish God from amongst us, human goodness is being driven out therewith, as in all ages before, and in all places where the experiment has been tried. Happily it can never succeed but partially in the world. It may end in degrading England from her ascendency amongst the nations; when other people will take her place in the world, with the pillar and cloud of the Divine presence accompanying them, on the great mission to which England has been unfaithful and apostate.'

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের বিক্রেয় পুস্তক সকল নিম্নলিখিত মত মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মনিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়	...	১
বেদান্ত প্রবেশ	... ...	১
স্তুতি	... ...	১
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	...	১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?		/০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়		৵০
গীতাঙ্কুর	... ...	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ তাল বাঁধা	...	॥০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা		॥০
A Discourse aginst Hero making in religion	As	12
Science of Religins		4

---

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)		১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ তাল বাঁধা)		১৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	... ...	২॥৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	...	।৶০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ		।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ		।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ		॥/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	...	।৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	...	৶০
গৃহকর্ম্ম	... ...	৶০

	As.	P.
Defence of Brahmoism and of Brahma Samaj	8	
Brahmic Questions of the Day	p	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj its Views and Principles	1	5
Adi Brahma Samaj is a Church	2	3
A Reply to the Query: What is Brahmoism	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের
আধ্যাত্মিক ভাব ৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ... ৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ... /০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ।০
মাঘোৎসব ... ... ॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা * ... ৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ... ।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৶০
ভবানীপুর সাংবৎসরিক সমাজের বক্তৃতা (১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ... ৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১
অধিকারতত্ত্ব ... ... ।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি ... ... ॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ... .. /১০
তত্ত্বপ্রকাশ ... ... /১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ... ... /১৫
ব্রহ্মোপাসনা ... ... (১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি . ... (১০
ব্রহ্ম স্তোত্র ... ... (১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা ... ... /০
প্রবচন সংগ্রহ .. (১৫
ব্রহ্ম সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ... /০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ... /০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ .. ৶০
কুমার শিক্ষা ৶০
প্রশ্নমঞ্জরী ... .. ।০
প্রভাত-কুসুম ৶১০
উদ্বোধনাঞ্জলি ... ... (১০
ধর্ম্ম দীক্ষা ... ... (১০
ব্রহ্মসাধন ... ... /০
ব্রহ্মজ্ঞান ... ... (১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ... /১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ... (১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ... /০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন সমাজের সম্বন্ধ (১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব (১০
উপদেশ ... ... (৫
দুর্গোৎসব ... .. (১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১০
বর্ণমালা প্রথম সংখ্যা (৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা (১০

	Rs.	As.	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book			6
Signs of the Times			6
Vedantic Doctrines Vindicated		1	
Docitrine of Christian Resurrection		1	
Physiology of Idolatry		1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

সত্যোপদেশ ৶১১
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ... /০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি ৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে) (১০

১৭৭০ শক অবধি ১৭৯৮ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ মাঘ রবিবার দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইবে, এবং এই উপলক্ষে তথায় উক্ত মহাত্মার রচিত কতিপয় গান গীত হইবেক। অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত সভাতে আগমন করিয়া ঐ কার্য্য সুসম্পাদন করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্বৎ ১৯৩৪ [illegible]

Registerd No 52.

নবম কল্প

চতুর্থ ভাগ

মাঘ ১৮০০ শক।

৪২৬ সংখ্যা।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

"উত্তিষ্ঠত।"

মনুষ্য উত্থানবান্ জীব। অন্য জীব উত্থানাবস্থায় বিচরণ করিতে পারে না; মনুষ্য কেবল উত্থানাবস্থায় বিচরণ করিতে পারে। মনুষ্যের শরীর যেমন সদা উত্থানবান্ তেমনি তাহার আত্মাও সর্ব্বদা উত্থানবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্য সেই অমৃতের পুত্র; সে যদি সর্ব্বদা পাপে মলিন, শোকে আকুল, ও রিপুর বশীভূত থাকে তবে তাহার আর কি মর্য্যাদা থাকে? পক্ষী যেমন পৃথিবীর অব্যবহিত উপরি ভাগের মলিন অবিশুদ্ধ বায়ু পরিত্যাগ করিয়া, আকাশের উচ্চ প্রদেশে উত্থিত হইয়া, তথাকার লঘু ও পবিত্র বায়ু সেবন পূর্ব্বক কৃতার্থ হয় সেইরূপ মনুষ্য সংসারের মলিনতা ও অধমতা নিম্নে রাখিয়া, ধর্ম্মাকাশে উত্থিত হইয়া, তথাকার লঘুত্ব ও আরোগ্যপ্রদ পবিত্র বায়ু সেবন পূর্ব্বক একেবারে কৃতার্থ হয়। হে মোহাক্রান্ত ব্যক্তি! তুমি সংসারকে সার জ্ঞান করিয়া তাহাতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছ! "উত্তিষ্ঠত" উত্থান কর, সেই অবিনাশী সারাৎসার পদার্থের নিকট গমন কর, এই ভয়াবহ সংসারে কেবল তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা শান্তি লাভের এক মাত্র উপায়। হে শোকাকুল! তুমি কেন শোক-শয্যায় পতিত আছ? "উত্তিষ্ঠত" উত্থান কর, তোমার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য

যে যখন আমরা মনুষ্যকে ভাল বাসি, তখন আমরা কি ধূলি-নির্ম্মিত ভঙ্গুর পদার্থ ভাল বাসি! তোমার বিবেচনা করা কর্তব্য যে যাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ তদপেক্ষা প্রিয় পদার্থ এক জন আছেন,তাঁহাকে প্রীতি-কর এবং তাঁহার প্রিয় জীবদিগের উপকার সাধন কর,মৃতের জন্য শোক করিয়া জীবিত-দিগের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলন করিও না। হে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন ব্যক্তি! অমৃতের পুত্র হইয়া তোমার এই দুর্গতি কেন? "উত্তিষ্ঠত" উত্থান কর, মহাবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পাপের শৃঙ্খল একবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরম উপাদেয় স্বাধীনতা লাভ পূর্ব্বক সেই পুত্রত্ব সার্থক কর, হৃদয়ের নিত্য সূর্য্যালোকস্বরূপ আত্ম-প্রসাদ লাভ কর, বাহ্য ঘটনার উপর আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই, সহস্র বিপদপাত হইলেও যদি আমাদিগের ধর্ম্ম স্থির থাকে তাহা হইলে ভয়ের কিছু মাত্র কারণ নাই। হে মনুষ্যগণ! ধর্ম্ম কেবল উচ্চৈঃস্বরে এই মাত্র তোমাদিগকে সর্ব্বদা বলিতেছেন "উ-ত্তিষ্ঠত, উত্তিষ্ঠত"। তাঁহার এই উদ্দীপক বাক্য শ্রবণ কর, যেহেতু ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যের এক মাত্র সুহৃৎ, মৃত্যুর পর ধর্ম্মই কেবল আমাদিগের অনুগামী হয়েন, আর সকলই শরীরের সহিত বিনাশ পায়। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মকে হনন করিলে তিনি আমাদিগকে হনন করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবে না, ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন।

" একএব সুহৃদ্ধর্ম্মোনিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥
ধর্ম্মএব হতো হন্তি, ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যোমা নোধর্ম্মোহতোবধীৎ॥"

বৈদিক সময়ে পরকালে বিশ্বাস।

পূর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের সন্দেহ হইতেও পারে, কিন্তু পরকালের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তিরই সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতে পাই যে আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ইহলোকে হইতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে মৃত্যুর পরও আত্মার, উন্নতি হইবে। ঈশ্বর ন্যায়-বান অতএব লোকের বিশ্বাস এই যে সক-লেই পরকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পুরস্কৃত বা দণ্ডিত হইয়া থাকে। আমরা এ প্রস্তাবে বৈদিক কালে ঋষিদিগের পরকাল বিষয়ে কি মতামত ছিল তাহা বিবৃত করিব।

ঋগ্বেদসংহিতার নবম এবং দশম মণ্ডলেই পরকালের বিষয় পরিস্ফুট এবং উন্নত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য মণ্ডলে পর-কালের কথা আছে সত্য,কিন্তু পরিস্ফুট ভাবে নাই। ঋগ্বেদের প্রথম এবং চতুর্থ মণ্ডলে দৃষ্ট হয় যে ঋভুগণ শিল্পচাতুরীর নিমিত্ত অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আর অনেক স্থল পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে ঋষিগণ পরকালকে সুখজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তে লিখিত আছে যে "আমরা সোম পান করিয়াছি, আমরা অমরত্ব লাভ করি-য়াছি, আমরা আলোকে প্রবেশ করিয়াছি, আমরা দেবগণকে জানিতে পারিয়াছি।" ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে দৃষ্ট হয় "যাঁহারা দান করেন তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন।" আর ১৫৪ সূক্তে লিখিত আছে "আমি যেন বিষ্ণুর সেই প্রিয় আবাসস্থান প্রাপ্ত হই যেখানে দেবভক্ত উপাসক সকল অমৃত পান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হয়েন।" ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে উল্লিখিত

হইয়াছে "ইন্দ্র তাঁহার উপাসকদিগকে প্রশস্ত স্থানে, স্বর্গীয় জ্যোতিতে, নিরাপদে এবং সম্পদে লইয়া যান।" প্রথম মণ্ডলের ৩১ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭ সূক্তে অগ্নিদেবকে অমরত্বদাতা বলা হইয়াছে।

দশম মণ্ডলের ১৪ এবং ১৭ সূক্তে বর্ণিত আছে যে যম বিবস্বৎ ও সরণ্যুর পুত্র। সরণ্যু ত্বষ্ট্‌দেবের কন্যা। যম প্রথম মনুষ্য বলিয়া অনেকত্র উল্লিখিত। যম মৃত্যুর পর পরলোকের পথ দেখিতে পান এবং তদবধি তাঁহার আবিষ্কৃত পথে মনুষ্যগণ পরলোকে নীত হইয়া সকলে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়। নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে দৃষ্ট হয় যে যম স্বর্গের অন্তরতম পবিত্র প্রদেশে স্বর্গীয় জ্যোতি মধ্যে বাস করেন এবং তিনি তথাকার রাজা। যে স্থানে তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের বাসের নিমিত্ত জ্যোতিঃপূর্ণ গৃহ সকল প্রদান করেন তথায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সুখে কালযাপন করেন। ঋগ্বেদের কুত্রাপি যমকে পাপীদিগের দণ্ডপ্রদাতা বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু কিয়দংশে যম ভয়জনক। দশম মণ্ডলের ১৪ সূক্তে যমের দুই ভয়ঙ্কর কুকুরের বর্ণনা আছে। ইহারা তাঁহার রাজ্যের পথ রক্ষা করে, তাঁহার দূতস্বরূপ লোকমধ্যে বিচরণ করে এবং লোকদিগকে যথাকালে যমালয়ে আনয়ন করে। মৃত্যুর পর মনুষ্যের শরীর ভস্মীভূত করা হয় কিন্তু আত্মা অসম্পূর্ণ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পিতৃগণের পথ দ্বারা দেবজ্যোতিতে ভূষিত হইয়া অনন্ত জ্যোতির প্রদেশে উত্থিত হয়। সে প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মা আপনার পূর্ব্বতন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, পিতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করে, যমের নিকট হইতে বাসার্থ সুখকর স্থান প্রাপ্ত হয় এবং অধিকতর সম্পূর্ণ জীবনে প্রবেশ করে। এই জীবনে সকল ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, দেবগণের নিকটে বাস করে এবং দেবগণের আনন্দের অংশী হয়। ইহাই পরকালের কথা। পরকালের সুখ সম্ভোগ ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল ১১৩ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। "হে পবিত্র সোম, আমাদিগকে সেই অক্ষয় ও অপরিবর্ত্তনশীল লোকে স্থাপন কর যেখানে অনন্ত জ্যোতিঃ এবং মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, যেখানে যমরাজ আছেন, যেখানে স্বর্গের পাবন ক্ষেত্র বিদ্যমান, যেখানে ইচ্ছা অনিয়ন্ত্রিত এবং মুক্ত, যেখানে সুখ এবং যেখানে লোকে কখন কোন বিষয়ে নিরাশ হয় না"

যে যে কার্য্য করিলে লোকে পরকালে সুখ প্রাপ্ত হয় এবং অনন্ত আনন্দ উপভোগ করে তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তে উল্লিখিত আছে। দেবগণকে আজ্যাদি নিবেদন, তপস্যাচরন, পরহিত সাধনে জীবন প্রদান, সদুদ্দেশ্যে দান, সদনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরের একাগ্র উপাসনা এই সমস্ত দ্বারা লোকে দুঃখ দ্বারা অসম্ভিন্ন আনন্দ পরকালে উপভোগ করে। ঋগ্বেদের ১।১২৫ ঋকে দেখা যায় যে "যিনি সৎপাত্রে দান করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন, দেবলোকে গমন করেন এবং অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন। দানশীল ব্যক্তিরা (১০।১০৭।২) কখন মৃত হয়েন না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন না এবং ক্লেশ ভোগ করেন না।

দশম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তে পিতৃগণের উল্লেখ আছে। পিতৃগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্ববংশীয়দিগের পূজ্য হইয়াছেন। পিতৃগণ অনেক বিধ—অঙ্গিরস, বৈরূপ, নরাস্ব, অথর্ব্বান্, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি। পিতৃগণের বংশীয় ভক্ত উপাসক সমূহ পিতৃগণের অর্চনা করে, অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, দোষ ক্ষমা করিতে বলে, ধনদান করিতে প্রার্থনা করে এবং স্বভক্তদিগকে রক্ষা করিতে

বলে। পিতৃগণ যম, বিবস্বৎ এবং অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত আগমন করেন এবং অর্পিত হবি গ্রহণ করেন। পিতৃগণ ইন্দ্রাদি দেবের রথে আরোহণ পূর্ব্বক যজ্ঞ-প্রদেশে আসিয়া থাকেন।

পাপের দণ্ড অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৫ সূক্তে দৃষ্ট হয় যে, দুষ্ট সত্যরহিত অবিশ্বস্ত ব্যক্তিরা অতল গভীর প্রদেশে পতিত হয়। ৭ মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে দৃষ্ট হয় ইন্দ্র এবং সোম হিংসাপ্রবণ রাক্ষসাদি জাতিকে অতল অন্ধকারপূর্ণ গহ্বরে নিক্ষেপ করেন। অধার্ম্মিক লোক সকল অধম তমসে নিপতিত হয়। কৃপণ ব্যক্তিরা নরকলোকে বাস করে।

বৈদিক কালে ঋষিদিগের পরকাল বিষয়ে মতামত বিবৃত হইল। পরকালের অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতেন। আত্মার যে পরকালে উন্নতি এবং সুখভোগ হয় তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার তাঁহারা মানিতেন। সৎকর্ম্ম-ফলে অমৃতত্ব লাভ এবং পরকালে আনন্দোপভোগ তাঁহাদিগের চিত্তকে সৎকর্ম্মের দিকে প্রবণ করিত। ঋষিদিগের ধর্ম্মভাব পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্ম বিষয়ে বৈদিক কালীন ঋষিগণের মতামত আমরা প্রস্তাবান্তরে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

বৈদিক সময়ের ঋষিগণ।

বৈদিক ঋষিগণ সমস্ত আর্য্য বংশকে মনু হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু আর্য্যদিগের আদি পুরুষ, ইহা বেদে অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। মনু হইতে উৎপন্ন বৈদিক আর্য্য ঋষিগণ সমাজে কিরূপ অবস্থায় থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন সামাজিক বিভাগ ছিল কি না তাহা প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ঋষিগণই বেদমন্ত্রের রচয়িতা। ঋষিগণ বেদমন্ত্র সমূহ স্বস্ব প্রণীত বলিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। বেদে বেদমন্ত্রের বহুবিধ নাম দেখিতে পাওয়া যায়; যথা অর্ক, উক্থ, ঋচ্, গির্, ধী, নিথ, নিবিৎ, মন্ত্র, মতি, সূক্ত, স্তোম, বচ, বচস্ প্রভৃতি। এই সমস্ত বাক্যের অর্থই বেদমন্ত্র। এতদ্ভিন্ন আর একটি শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মন্। ব্রহ্মশব্দের নানার্থ। সচরাচর বেদে ব্রহ্মশব্দ স্তুতিবোধক। কিন্তু যখন ব্রহ্মন্ শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন ইহা স্তুতিকারী বুঝায়। ঋকবেদের ভূরি ভূরি প্রয়োগ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যেস্থলে ব্রহ্মন্ শব্দের প্রথমতঃ স্তুতি অর্থ; দ্বিতীয়তঃ স্তুতিকারী অর্থ এবং তৃতীয়তঃ ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্-বিশেষ অর্থ। দ্বিতীয় স্তুতিকারী অর্থের আবার দ্বিবিধ প্রয়োগ আছে। কোন কোন স্থলে বিপ্র, বেধস্, কবি প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ এবং কোন কোন স্থলে যজ্ঞা, পুরোহিত প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্ব প্রথমে ঋষিগণই পুরোহিত ছিলেন, যেহেতু যে যে স্থলে তাঁহারা আপনাদিগের দানপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে অন্য কোন কার্য্যসম্পাদক পুরোহিতের উল্লেখ করেন নাই। যাঁহারাই বেদমন্ত্র রচনা করিতেন তাঁহারাই দেবগণের স্তব করিতেন এবং দানশীল ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। অন্য কোন পুরোহিত তৎকালে ছিল না। সেই আর্য্যসমাজের প্রথম অবস্থা। তখন যাঁহারাই বেদমন্ত্রের রচক কবি ছিলেন তাঁহারাই কার্য্যসম্পাদক পুরোহিত ছিলেন। ক্রমশঃ আর্য্যসমাজে যজ্ঞবাহুল্য বৃদ্ধি-

এবং যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অনেক পুরোহিতের প্রয়োজন হইল। তখন এক দল পুরোহিত হইলেন যাঁহারা বেদমন্ত্র-রচয়িতা ছিলেন না; কিন্তু কেবল মাত্র দেব-যজন করিতেন। পরে আর যত যজ্ঞ-বাহুল্য হইতে লাগিল ততই নানা প্রকার পুরোহিতের আবশ্যকতা হইল। হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, নেষ্টা, পোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি বহু সংখ্যক পুরোহিত উদ্ভূত হইলেন। এক ব্রহ্মন্ শব্দ এই তিন সময়ের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রথমে ইহা স্তোতা, কবি, বিপ্র প্রভৃতি বুঝাইত, পরে যজ্বা, পুরোহিত বুঝাইয়াছে এবং অবশেষে ব্রহ্মা নামে এক বিশেষ পুরোহিত বুঝাইল। ঋগ্বেদের ১মণ্ডলের ৮০ সূক্ত ১ ঋক্; ১।১৬৪।৩৪; ২।১২।৬; ৬।৪৫।৭; ৮।১৬।৭; ১০।৭০।১; ১০।৮৫।৩; ১০।১০৭।৬; ১০।১২৫।৫ প্রভৃতি স্থলে স্তোতা বিপ্র অর্থে ব্রহ্মা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল স্থলে ব্রহ্মা, স্তোতা, ব্রহ্মবাহস্, ঋষি, কবি, বিপ্র; সুমেধ, সামগ প্রভৃতি সমস্তই একপর্য্যায় শব্দ।

দ্বিতীয়তঃ ঋগ্বেদের ১ম ১০ সূক্ত ১ ঋক্; ১।৩৩।৯; ১।১০১।৫; ১।১০৮।৭; ১।১৫৮।৬; ২।৩৭।১; ৪।৫০।৭; ৪।৫৮।২, ৫।৩১।৪; ৫।৪০।৮; ৭।৭।৫; ৭।৩৩।১; ৮।৭।২০; ৮।১৭।২; ৮।৩১।১; ৮।৩২।১৬; ৮।৩৩।১০ ৮।৪৫।৩৯; ৮।৫৩।৭; ৯।৯৬।৬; ৯।১১২।১; ১০।২৪।১১; ১০।৮৫।১৯; ১০।১৪১।৩ প্রভৃতি স্থলে ব্রহ্মশব্দ পুরোহিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা বেদমন্ত্র রচনা করিতেন না কিন্তু অন্য ঋষি কর্ত্তৃক রচিত মন্ত্রের দ্বারা দেবার্চ্চনা ও উপাসনা করিতেন।

তৃতীয়তঃ ঋগ্বেদের ২।১।২; ৪।৯।৩; ১০।৫২।২; ১০।৯১।১০ প্রভৃতি স্থলে ব্রহ্মাশব্দ ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উদ্ধৃত প্রথম ও শেষ ঋকে অগ্নিকে হোতা, পোতা, নেষ্টা, অগ্নিৎ, প্রশস্তা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। ১০।৫২।২ ঋকে অশ্বিনীকুমারদিগকে উক্ত হইয়াছে "হে অশ্বিন, প্রতি দিন আমি আপনাদিগের অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিতেছি এবং ব্রহ্মা অগ্নি প্রজ্বালিত করিতেছেন।"

অতএব আমরা দেখিলাম যে ব্রহ্মাশব্দে আর্য্যসমাজের তিন ক্রমিক উন্নত অবস্থায় তিন অর্থ বুঝাইয়াছে। এক্ষণে দেখা উচিত ব্রাহ্মণ শব্দের ঋগ্বেদে কিরূপ ব্যবহার আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩ সূক্তের ২ ঋকে ব্রহ্মপুত্র শব্দ দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মপুত্র। ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৪৫ লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা চতুর্বিধ ভাষা জানেন কিন্তু সাধারণ লোকে এক প্রকার ভাষা মাত্র জানে। আর ৬।৭৫।১০; ৭।১০৩।১; ১০।১৬।৬; ১০।৭১।১; ১০।৯০।১১ প্রভৃতি ঋকে ব্রাহ্মণ শব্দ দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ সম্পাদক, সোমপায়ী, জাতবিদ্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র মান্য গণ্য এবং পূজনীয় হইতেন। ধনী ব্যক্তিরা এবং নৃপতিগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগকে দানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন। ঋগ্বেদ পাঠে আমরা অবগত হই যে সুদাস, পাকস্থমন, তুর্ব্বসু, চেদিবংশীয় কশু, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু প্রভৃতি রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ধনদান করিতেন। ব্রাহ্মণেরা রাজগণের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত দেবগণকে অর্চ্চনা ও উপাসনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিদ্যার আধার ছিলেন এবং মনুষ্য ও দেবগণের মধ্যস্থলীয়। দেবগণের প্রীতিসাধন করিতে হইলে ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় লইতে হইত। ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে দেবগণের অর্চ্চনা হইতে পারিত। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের এত অধিক গৌরব ও সম্মান ছিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণদিগের এক শ্রেণী হইয়া পড়িল।

সর্ব্বপ্রকার দেবকার্য্যেই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ গৌরব। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণেরা আধুনিক ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় জাতি হইয়া উঠেন নাই। পৌরোহিত্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণেরা পুরোহিত হইলেন। এই পুরোহিত-শ্রেণীর মধ্যে রাজন্য ঋষিরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে (১০।১০৯ প্রভৃতি স্থলে) এবং অথর্ব্ববেদে (৫।১৭।৪ প্রভৃতি স্থলে) দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণেরা রাজন্য এবং বৈশ্য বিধবাদিগকে বিবাহ করিতেন। বৈদিক সময়ে যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা অথর্ব্ববেদের ৯।৫।২৭ হইতে প্রমাণিত।

আর আমরা দেখিতে পাই যে (ঋগ্বেদ পঞ্চম মণ্ডল ৬১সূক্ত) রথবীথী রাজার কন্যার সহিত শ্যবস্ব ঋষির এবং শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি শর্য্যাতরাজপুত্রী সুকন্যার সহিত চ্যবন ঋষির বিবাহ হইয়াছিল। তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে ব্রাহ্মণেরা রাজন্য এবং বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবতি সূক্তের দশমাদি ঋকে যে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য এবং শূদ্রের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ কি? এই স্থলে এরূপ উল্লেখ নাই যে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, রাজন্য পুরুষের বাহু হইতে এবং বৈশ্য উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেবল শূদ্রের বিষয়ে পদ হইতে জাত বলা হইয়াছে। এই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহু ছিলেন এবং বৈশ্য উরু ছিলেন। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রাহ্মণেরা সকলের মান্য এবং পূজ্য ছিলেন। রাজন্যগণ সকলের রক্ষক ছিলেন এবং বৈশ্যগণ বাণিজ্য ব্যবসায়াদি দ্বারা সকলের ধারক ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলের পূজ্য ছিলেন বলিয়া পুরুষের মুখস্বরূপ। রাজন্যেরা সকলের পালক ও রক্ষক ছিলেন বলিয়া বাহুস্বরূপ। বৈশ্যেরা ব্যবসায়ী বলিয়া উরু স্বরূপ। শূদ্রেরা সকলের নিম্নস্থ ছিল বলিয়া পুরুষের পাদ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত পুরুষসূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা বৈদিক সময়ের চরম কালে রচিত হইয়াছিল। বেদসূক্তের প্রাচীনত্ব এবং নূতনত্ব জানিবার বিশেষ লক্ষণ আছে। যে সকল সূক্ত পাঠ করিলে ভাব সরল, ভাষা সরল, রীতি সরল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বাভাবিক বাক্যস্ফুরণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে সেই সকল প্রাচীন সূক্ত। আর যে সকল সূক্ত পাঠ করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয়, যজ্ঞবাহুল্যের কথা, ভাবের নবীনত্ব এবং ভাষার আধুনিকত্ব দেখা যায় সে সমস্তই অপেক্ষাকৃত নূতন সূক্ত। বিচার্য্যমান পুরুষসূক্তে ভাষার আধুনিকত্ব, ভাবের নূতনত্ব এবং রীতির নব্যত্ব দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা প্রাচীন সূক্ত নহে, শেষ সময়ের রচিত। এতৎ প্রমাণ সমূহ সত্ত্বেও যদি কেহ কেহ ইহার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে না ভাল বাসেন, আমরা তাহাদিগকে এই মাত্র বলিব যে তাহাদিগের অনুকূল তর্ক কিছুই নাই, প্রত্যুত অনেক প্রতিকূল তর্ক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলের শেষে এক মাত্র অস্পষ্ট বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ় প্রমাণাভাবে বৈদিক আর্য্যসমাজে জাতিভেদ প্রবল ছিল বলিয়া স্থির করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বৈদিক আর্য্যসমাজে অনেক প্রকার লোক ছিল; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা এবং রাজন্যেরা পুরোহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-ঋষিই অনেক কিন্তু রাজন্য-ঋষিও ছিলেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের অনুক্রমণি-

কাতে ঋজ্রাশ্ব, সহদেব, অম্বরীষ, ভয়মান, সুরাধস্ প্রভৃতিকে রাজর্ষি বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, পৃথিবৈন্য, কক্ষীবান্ প্রভৃতি বহু সংখ্যক রাজর্ষি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বেদ-সূক্তের রচয়িতা ঋষি ছিলেন। দুই এক স্থলে শূদ্র ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবষ ঐলূষ নামে দশম মণ্ডলে একজন নিষাদ ঋষি আছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে যে বৈদিক যুগে আধুনিক জাতিভেদ ছিল না। যাঁহারাই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া দেবযজনের এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণের উপযুক্ত এবং সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারাই ঋষি হইয়াছিলেন। যাঁহারাই আর্য্যসমাজে তখন পৌরোহিত্য করিতেন তাঁহারা ব্রহ্মা-শব্দের বাচ্য ছিলেন। বৈদিক ঋষিদিগের সমাজে বিশেষ আদর এবং সম্মান ছিল। ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে অশ্ব, গো, ধান্য, ধন প্রভৃতি প্রদান করিতেন। এই সকল দানশীল ব্যক্তিগণের অনেক স্তুতি ঋগ্বেদে আছে; তৎসমুদায়কে দানস্তুতি কহে।

বৈদিক আর্য্যসমাজে ঋষি এবং পুরোহিত ব্যতীত অন্য বহুবিধ ব্যবসায়ী বহু প্রকার লোক ছিল। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিদ্বেষী অনেক শত্রুও ছিল ঋষিগণ ইহাদিগের অদেব, অনিন্দ্র, অব্রত, অযজ্ঞ, অন্যব্রত, অপব্রত, দেবনিদ্, ব্রহ্মদ্বিষ প্রভৃতি বিশেষণ দিয়াছেন। আর এবম্ভুত অনেক লোক ছিল যাহারা বেদবোধিত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের পঞ্চম ঋকে উক্ত হইয়াছে "যে ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন কোন লোক অবিশ্বাস করে, সেই ইন্দ্রদেবের অস্তিত্ব এবং প্রভাবে বিশ্বাস কর"। পুনর্ব্বার ৮।৮৯।৩ ঋকে আছে, "ইন্দ্রকে স্তুতি কর, যদি তিনি থাকেন। কেহ কেহ বলে ইন্দ্র নাই, কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? তবে আমরা কাহাকে স্তুতি করিব? ভক্ত উপাসক এরূপ সন্দেহযুক্ত হইলে ইন্দ্র তাহাকে বলেন হে উপাসক, এই আমি আমাকে দর্শন কর, আমি সর্ব্বভূতময়।" যে সংশয়বাদ কপিল মুনিতে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুর ঋগ্বেদেও দৃষ্ট হয়। এই সকল সংশয়াত্মা দেববিদ্বেষী বৈদিক সময়ে থাকিলেও পুরোহিতগণ বেদ-বোধিত সদনুষ্ঠানে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন। ইহা কেবল তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানের এবং দেবার্চ্চনার প্রভাবে তাঁহারা করিতেন। তাঁহারা যে কেবল দেবকার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন তাহা নহে। বৈদিক সময়ের ঋষি ও পুরোহিতগণ আপনাদিগের নিমিত্ত ধন, ধান্য, পুত্র, গৃহ, গো, অশ্ব প্রভৃতি দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা সংসারানভিজ্ঞ ছিলেন না; কিন্তু কিরূপে সামাজিক সকল শ্রেণীকে চালিত করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে বৈদিক সময়ে পুরোহিতগণ দেবযজন, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বধর্ম্মপ্রচার এবং বেদমন্ত্র রচনা করিতেন। তাঁহারা এক প্রকার সমাজের নেতা এবং পথপ্রদর্শক ছিলেন।

যোগিগণের সাধনতত্ত্ব।

(যোগশাস্ত্র মূলক)

মনুষ্য বিনা চেষ্টায় কিছুই পায় না। এক একটি বিষয়ে সিদ্ধ হইতে যে মনুষ্যের কত অভ্যাস; কত আয়াস, কত অনুষ্ঠান ও কত উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক হয় তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন।

কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথম হইতে

প্রস্তুত হইতে হয়। অগ্রে প্রস্তুত না হইয়া, আপনাতে কার্য্য-শক্তির উদ্রেক না করিয়া সহসা যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কার্য্যসিদ্ধি দূরে থাকুক, হয়ত তিনি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতএব অগ্রে প্রস্তুত হইয়া পশ্চাৎ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করাই কর্ত্তব্য। প্রস্তুত হইবার অবলম্বিত বিষয় বিশেষের নাম অধিকার, আর যিনি প্রস্তুত হইয়াছেন তিনি অধিকারী। ইহাই অধিকার ও অধিকারীর সাধারণ লক্ষণ। যিনি যে কার্য্যের উদ্দেশে প্রস্তুত, তিনিই সেই কার্য্যকরণে অধিকারী বা যোগ্য পাত্র। যিনি প্রস্তুত হন নাই তিনি অনধিকারী বা অযোগ্য পাত্র।

"নহ্যনধিকৃতং কর্ম্ম কিঞ্চিদপি ফলংজনয়তি।"

যেহেতু অনধিকারীর কৃত কোন কর্ম্মই সুফল প্রসব করে না, সেই হেতু "অধিকারিণা ভবিতব্যম" অগ্রে আপনাতে অধিকারিত্ব সম্পাদন করিতে হইবেক।

"অগ্রে অধিকারী হইতে হইবেক" ইহাই যদি নিয়ম হইল, তবে যোগী হইতে গেলেও অগ্রে যোগাধিকার আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। অধিকারী না হইয়া, অগ্রে প্রস্তুত না হইয়া, যোগসাধনে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইলে যোগসিদ্ধি হওয়া দূরে থাক, বিপদ আসিয়া আশ্রয় করিবেক। এই জন্যই

"প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগমুপদিশন্তি সূত্রকারাঃ সামর্থ্য জননায়।"

যোগী হইবার সামর্থ্য উৎপাদনের নিমিত্ত যোগসূত্র-রচয়িতাগণ সর্ব্বাগ্রে ক্রিয়া-যোগের উপদেশ করিয়াছেন। "ভবিষ্যতে যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে প্রথমে ক্রিয়া-যোগ আশ্রয় করিবেক।"

"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"
(পা, সা,)

তপশ্চর্য্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, এই তিনটির নাম ক্রিয়াযোগ।

তপস্যা—কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ব্রত।

স্বাধ্যায়—প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ ও মোক্ষ শাস্ত্রের অনুশীলন।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করা।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তুলসীদাস ইহা উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যথা—

"তুলসী য্যাসা ধেয়ান ধর
য্যাসা বিয়ান্‌ কা গাই।
মুমে তৃণ চানা টুটে
চেৎ রাখয়ে বাছাই॥"

রে তুলসি! তুমি এরূপ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে, যেরূপ নবপ্রসূতা গাভী। নবপ্রসূতা গাভী কি করে? নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ চর্ব্বণ করে বটে কিন্তু তাহার চিত্ত বৎসের দিকেই থাকে।

এই নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ যোগীরা ঈশ্বর-প্রণিধান শিক্ষা করিবেন।

তপস্যা কেন? "নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।" সহস্র চেষ্টা করিলেও অতপস্বী ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হইবে না। জীবের চিত্তে অনাদি কালের বিষয়-বাসনা ও অবিদ্যা-বাসনা বদ্ধমূল হইয়া আছে। তপস্যা ব্যতীত তাহার লোপ সম্ভাবনা নাই। বাসনা থাকিতে যোগসিদ্ধি হয় না সুতরাং বাসনা ক্ষয়ের নিমিত্তই তপস্যা করিতে হইবে। বাসনা কি? তাহা একটু স্থিরচিত্তে বুঝ—

মনে কর, কোন যুবা আহারান্তে নিদ্রা গেল। দুই চারি দিন নিদ্রা যাইতে যাইতে তাহার এমনি অভ্যাস হইয়া আসিল যে আহারান্তে নিদ্রা যাইতেই হইবেক। এরূপ হয় কেন? না মনুষ্যের মন, বুদ্ধি, শরীর সমস্তই প্রসঙ্গপ্রবণ। যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করে সেই বিষয়েই নত হয়। যে রূপে, যখন ও যে আকারে

প্রসঙ্গ করে সেইরূপে, তখন ও সেই আকারে তদ্বিষয়ে উন্মুখ বা ধাবিত হয়। মন সেই ভাবে সেই সময়ে সেই দিকেই দৌড়ায়। এই প্রসঙ্গে প্রবণতাকেই লোকে নেসা বলিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে অভ্যাস, সংস্কার ও বাসনা নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যখন দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য দুই চারি দিন মাত্র স্ত্রী-প্রসঙ্গ ক্রীড়া-প্রসঙ্গ করিয়া তদুত্থ বাসনা-জালে অভিভূত হইয়া কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়ে, তখন সে অনাদি কালের বদ্ধমূল কর্ম্ম-বাসনা ও ক্লেশ-বাসনা-পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া কি প্রকারে দুঃসম্পাদ্য যোগ-ব্যাপার সাধনে সক্ষম হইবেক? অতএব কর্ম্ম-বাসনা ও ক্লেশ-বাসনা দগ্ধ করিবার নিমিত্ত, সাধক সর্ব্বাগ্রে ক্রিয়া-যোগ আশ্রয় করিবেন।

[স হি ক্রিয়াযোগঃ] "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।" [২]

উল্লিখিত ক্রিয়াত্রয় অনুষ্ঠানের অপর প্রয়োজনও আছে। ক্লেশ সকল ক্ষীণ করা এবং সমাধি অবলম্বনের শক্তি উৎপাদন করা। মনুষ্য যদি অকপট ভাবে তপশ্চর্য্যা করে, শ্রদ্ধা সহকারে প্রণব কি অন্য কোন ঈশ্বরের নাম জপ করে, বুঝিয়া বুঝিয়া জ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার চিত্ত ফিরিয়া দাঁড়ায়। বিষয়-বাসনার স্রোত ক্রমে অবরুদ্ধ হইয়া আইসে। ক্লেশ সকল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আইসে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এস্থলে ক্লেশ অর্থ দুঃখ নহে। ক্লেশ শব্দের অর্থ—

"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।"

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার মনোধর্ম্মকে যোগীরা ক্লেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পাঁচটি মনোধর্ম্ম আর কিছুই নহে, ইহা পাঁচ প্রকার বিপরীত জ্ঞান। এই পাঁচ প্রকার প্রত্যয় যত বৃদ্ধি হইবে তত প্রকৃতির অধিকার দৃঢ় হইতে থাকিবেক। যতই প্রকৃতির অধিকার দৃঢ় হইবেক ততই সুখ দুঃখের স্রোত বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এই পঞ্চবিধ মিথ্যা-প্রত্যয় যাহাতে দগ্ধ হয় তাহার চেষ্টা করা যোগীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।"

পাঁচটির মধ্যে প্রথমোচ্চারিত অবিদ্যাটিই পরবর্ত্তী চারিটির ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তি-ভূমি। এক অবিদ্যা হইতেই ক্রমে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল ক্লেশকে মানব-চিত্তে চারি প্রকার অবস্থায় বাস করিতে দেখা যায়। কেহ কখন প্রসুপ্ত অবস্থায় আছেন কখন বা তনু অবস্থায়। কেহ কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং কেহ কখন উদার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রভুত্ব করিতেছেন।

প্রসুপ্ত—বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ-শক্তি লীন ভাবে থাকে।

তনু—দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুর-শক্তি-হীন হইয়া থাকে।

বিচ্ছিন্ন—একটির প্রাবল্য দশায় যেমন অন্যটি অভিভূত ভাবে থাকে। যথা—রাগ-কালে ক্রোধ, ক্রোধ কালে রাগ।

উদার—জাজ্বল্যমান অবস্থা। যখন যে ক্লেশ সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহা উদার। অন্য গুলির কেহ প্রসুপ্ত, কেহ তনু, কেহ বিচ্ছিন্ন। ফল কথা এই যে কখন প্রকাশ্য কখন বা অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য রূপে থাকুক, আর অপ্রকাশ্য রূপেই থাকুক, থাকিলেই অনর্থ। সময় পাইলেই সে বিষয়ের অভিমুখে উত্থিত হইবে, নিবারণ করিতে পারিবে না। তবে যদি দগ্ধ বীজের

ন্যায় উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তবে নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞান-বল, যোগ-বল সাধিত হইতে পারে।

অবিদ্যা কি ?

" অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্ম-খ্যাতিরবিদ্যা। " (৫)

যাহা যাহার স্বরূপ নহে মনুষ্য যে তাহাই তাহাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে দেখে, সেই দেখার নামই অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যাই সকল অনর্থের মূল। ইহার বিবরণ এই যে, যাহা বাস্তবিক অনিত্য তাহাতেই নিত্যত্ব বুদ্ধি। যাহা বাস্তবিক অশুচি তাহাতেই শুচিত্ব বুদ্ধি। যাহা বাস্তবিক দুঃখ তাহাতেই সুখ বুদ্ধি। যাহা আত্মা নহে তাহাতেই আত্মত্ব বুদ্ধি। এতদ্রূপ সহজাত বা চির-স্বাভাবিক বিপর্য্যয় প্রত্যয়ের নাম অবিদ্যা-ক্লেশ। জীব, দেহগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এই অবিদ্যা-ক্লেশকে গ্রহণ করে এবং সেই কারণেই জীব অস্মিতার পরবশ হইয়া পড়ে। অস্মিতা কি, বলা যাইতেছে।

" দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা। " (৬)

আত্মার নাম দৃক্-শক্তি। আর বুদ্ধির নাম দর্শন-শক্তি। জীব যে, এই দুইটিকে প্রভেদ করিয়া জানে না, ইহাই জীবের অস্মিতা নামক ক্লেশ। জীব, বুদ্ধি বা মনকে 'আমি' ভাবিয়া রহিয়াছে বলিয়াই সে রাগ নামক ক্লেশের অধীন। রাগ কি ? শুন—

" সুখানুশয়ী রাগঃ। " (৭)

সুখের যে অনুশয়, তাহারই নাম রাগ। অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, আর বর্ণনার দ্বারাই হউক, যে কোন ক্রমে হউক, একবার সুখানুভব হইলে, সময়ান্তরে তাহা মনে হয় [আহা! ইহা এমন!] যেমন মনে হয় অমনি তাহার জন্য ব্যস্ত হয়। যেমন সেই সুখটি ভোগ করিবার ইচ্ছা হয় অমনি তাহার উপকরণের চেষ্টা জন্মে। অতএব বিষয়-সুখাভিজ্ঞের যে পুনঃপুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে লোভ জন্মে, তাহারই নাম রাগ। এই রাগ প্রবল থাকিতে যোগী হইবার সাধ্য নাই। এই রাগ হইতেই দ্বেষের উৎপত্তি। দ্বেষ কি ? তাহাও ব্যক্ত করিতেছি।

"দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।"

দুঃখের অনুবৃত্তির নাম দ্বেষ। যে বস্তুতে যে আকারের দুঃখ অনুভব হইয়াছে সংস্কার বশতঃ জীবের সেই দুঃখ পুনশ্চ স্মরণাত্মক একবার অনুবৃত্তি হয়। যেমন দুঃখের স্মরণ হয় অমনি তাহা যাহাতে না হয় তাহারই চেষ্টা জন্মে। যে বস্তুতে দুঃখ হইয়াছিল সেই বস্তুর প্রতি যে প্রতিঘাত-চেষ্টা, ক্রোধ ও হিংসা জন্মে তাহারই নাম দ্বেষ। এই দ্বেষ জীবের দুঃখদায়ক এবং এই বদ্ধমূল রাগদ্বেষ হইতেই জীবমাত্রের কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকলের চিত্তেই এক প্রকার অভিনিবেশ বদ্ধমূল হইয়া আছে। অভিনিবেশ কি ? তাহা বলা যাইতেছে।

" স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। "

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর অহং অর্থাৎ আমি এতদ্রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। এই জন্য, প্রাণিমাত্রেই সম্পর্ক-পাতান দেহের জন্য একপ্রকার প্রার্থনা করিতেছে, তাহার একক্ষণের জন্যও বিরাম নাই। সে প্রার্থনা কি ? না মরণ-ত্রাস—মরণ-দুঃখের অনুবৃত্তি-নিবারণ-প্রার্থনা "মা ন ভুবম্ ভুয়াসমেব।" কিসে আমি না মরিব, আমি যেন না মরি। তাহা এইরূপ প্রার্থনা। ইহারই নাম অভিনিবেশ এবং ইহাও দুঃখ মধ্যে গণ্য ; যেহেতু ইহা থাকাতেই জীবের অনেক প্রকার ক্লেশ সঞ্চার হই-

তেছে। এই অভিনিবেশ থাকাতেই জীব কার্য্য করিতে পারে না, সর্ব্বদাই "কিসে না মরিব" এই চেষ্টায় রত আছে।

পতঞ্জলি, এস্থলে একটি গূঢ় বিষয়ের উল্লেখ বা সঙ্কেত করিয়াছেন। সেটি কি? না পূর্ব্ব-জন্ম-সম্বন্ধ। পূর্ব্ব-জন্মের অনুভূত মরণ-দুঃখ হইতেই ইহ জন্মে উল্লিখিত অভিনিবেশ জন্ম লাভ করিয়াছে। কে বলিল আবার পূর্ব্ব-জন্ম আছে? "এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে ন চ অননুভূত-মরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবতি।" "আমি যেন না মরি—কিসে আমি মরণের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইব" জীব যে অহরহই এই রূপ প্রার্থনা করে, কেন করে? এত মরণ-ত্রাস কেন? অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সে কারণ অন্য কোন রূপ হইতে পারে না; ভোগ করিয়াছে, আর ভোগ করিতে চাহে না, ইহাই তাহার কারণ।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অনুভূত হইলে পুনশ্চ তাহাতে ইচ্ছার উদ্রেক হইবে এবং দুঃখও একবার অনুভূত হইলে তাহার প্রতি অনন্ত কালের নিমিত্ত দ্বেষ হইবে। জীবের যখন মরণের প্রতি এত দ্বেষ তখন নিঃসংশয়িত অনুমান হইতেছে যে, জীব মরণে যে কি এক কঠোরতর দুঃখ আছে তাহা সে নিশ্চিত ভোগ করিয়াছে। মরণে যদি দুঃখ না থাকিত, আর জীব যদি তাহা ভোগ না করিত তাহা হইলে কখনই জীবের মরণের প্রতি এত দীর্ঘ দ্বেষ হইত না। এই দ্বেষ অত্যন্ত হীনচৈতন্য কৃমি কীট ও সদ্যোজাত দেহীদিগেরও আছে। লোকে বলে মনুষ্য আপন স্ত্রীর সমস্তই দেখিতে পায় কেবল একটি পায় না। কি? না বৈধব্য। মনুষ্য একবার টের দুবার মরে না, সুতরাং বুঝিতে হইবেক যে, জীবিত মনুষ্য ইহ শরীরে মরণ-দুঃখ অনুভব করে নাই। দেহান্তরে করিয়াছিল, বর্ত্তমান দেহে তাহারই অনুবৃত্তি আসিয়াছে। এই অনুবর্ত্তন স্বরসবাহী অর্থাৎ বাসনা বা সংস্কারের স্রোতে আসিয়া পড়ে অথবা স্বভাবের স্রোতে আসিয়া পড়ে বলিয়া জীব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না যে, আমি একবার মরণ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি।

ক্রমশঃ

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত।)

পূর্ব্বসংখ্যায় ভারতীতে আমরা "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটির বিষয় আলোচনা করিয়াছি—এক্ষণে লেখক মহাশয় ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে যে সকল অবশ্য-পালনীয় নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তিনি বলেন—বাণিজ্য, শিল্প, রাজনৈতিক ভাব (Political spirit) ও বিজ্ঞান—এই গুলিই ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ অভাব—রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এই গুলিই মুখ্য নিয়ম ও সাধন—এই গুলিই আমাদের সকল রোগের মহৌষধি।

কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবর্ষবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দুজাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যে রূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়? যে জাতির মধ্যে একতাসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে—যাহারা সকলে এক ভাবে, এক উৎসাহে উত্তেজিত হয়—যে জাতির মধ্যে এক জনের বিপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ-বিপদ বলিয়া সকলে মনে করে, সেই জাতির জাতীয়তার প্রকৃত পত্তন-ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে—যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ সে জাতি জাতি-নামের যোগ্য নহে। বর্ত্তমান হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই—এখন হিন্দুজাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না। লৌকিক আচার ব্যব-

হার ভাষা প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ভিন্ন। এক্ষণে পঞ্জাবি, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী মান্দ্রাজি, মহারাষ্ট্রী প্রত্যেককেই এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। যত দিন না এই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বিজাতীয় বৈষম্যগুলি দূরীকৃত হইয়া একতা-সূত্রে নিবদ্ধ হইবে, ততদিন আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইব না, স্বাধীনতার অধিকারী হইব না, ততদিন আমাদিগের স্বাধীনতার আশা দুরাশা মাত্র। এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইযাছি, এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। অতএব সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একতার অভাবই প্রধান অভাব। এই একতা-সাধন পক্ষে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যে অতীব কার্য্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই—কোন জাতির মধ্যে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের রীতিমত উৎকর্ষ সাধন হইলে, সে জাতির মধ্যে শুধু যে একতার সুবিধা হয় তাহা নহে, কিন্তু একত্র হইয়া সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থ কি করিয়া কার্য্য করিতে হয়, কি করিয়া কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়—তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বন করিবারও ক্ষমতা জন্মে।

সহস্র বৎসর দাসত্ব ভারে প্রপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার স্বাভাবিক ভাব—স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি—স্বাভাবিক স্পৃহা আমরা হারাইয়াছি। আমরা হৃদয়ের দ্বারা এক্ষণে স্বাধীনতার আস্বাদ পাই না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা স্বাধীনতার উপকারিতা ও আবশ্যকতা আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে। হৃদয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনায় এক্ষণে আমরা একত্র হইতে পারি না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তবে আমাদিগকে ঐক্য-সাধনে চেষ্টা করিতে হয়। অতএব একতা-সাধন পক্ষে এক্ষণে জ্ঞানানুশীলন যে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের একটি স্বাভাবিক যোগ আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে। আমরা যদি প্রথমে জ্ঞানের কথায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই—আর যদি পুনঃপুনঃ সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকি—ক্রমে তাহা আমাদিগের ভাবের সহিত মিশ্রিত, হৃদয়ের সহিত জড়িত হইয়া যায়—ইহাই মানব-প্রকৃতির নিয়ম। আমরা যদি এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হই—ক্রমে আমরা ভাব দ্বারা চালিত হইয়া একত্র হইতে সমর্থ হইব। আমরা ভাবের সহজ পথ হারাইয়াছি—এক্ষণে আমাদিগকে দুরূহ জ্ঞানের পথ দিয়া ভাবের পথে উপনীত হইতে হইব। সাধারণ জ্ঞানানুশীলন ও শিক্ষা এই জন্য নিতান্ত আবশ্যক। উচ্চতর বিজ্ঞান-চর্চ্চাও যে একতা-সাধনের বিলক্ষণ সহায়তা করে, বিজ্ঞান-প্রসূত বাষ্পীয় শকট, তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত কেমন সহজ হইয়া পড়িয়াছে—বাণিজ্য-ব্যাপারের কেমন সুগমতা হইয়াছে—এইরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জাতিদিগের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় ও ভাবের বিনিময় দ্বারা একতার পথ কেমন অল্পে অল্পে উন্মুক্ত হইতেছে। তবে, এই সকল বাষ্পীয় শকট, তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যদি আবার আমাদিগের স্বজাতীয় বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল হইত—যদি স্বজাতীয় ধনে ও স্বজাতীয় চেষ্টায় ঐ সকল ব্যাপার আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে আর আমাদের সুখের সীমা থাকিত না—তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য আরও সফল হইত—দেশের শ্রী সৌভাগ্য আরও বর্দ্ধিত হইত—ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত। এক্ষণে "পর দীপ-মালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" অতএব বিজ্ঞান-চর্চ্চা যে জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান ও রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিশিষ্ট উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই একতা-সাধনের পক্ষে আমাদের দেশে অনেক গুলি বাধা আছে এবং আরও নূতন নূতন বাধা উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যে অন্য বিষয়ে যতই কেন বিভিন্নতা থাকুক না, তাহাদিগের ধর্ম্ম এক ছিল। হিন্দুধর্ম্ম হইতে নানা সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল বটে—কিন্তু সে সমুদায় হিন্দুধর্ম্মের শাখাপ্রশাখা বলিয়া পরিগণিত। বৌদ্ধধর্ম্ম যদিও হিন্দুধর্ম্ম হইতে প্রসূত, তথাপি হিন্দুধর্ম্মের অব্যবহিত অধীনতা স্বীকার না করায় উহা ভারতবর্ষে বহুদিন তিষ্ঠিতে পারে নাই। আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মদর্পণে যে উপ-ধর্ম্মমলা পড়িয়াছে, তাহা মার্জ্জিত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু নিরর্থক কোন নূতন ধর্ম্ম আনিয়া একতার বিঘ্ন সাধন করা স্বদেশবৎসলদিগের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই জন্য এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটি নূতন বিজাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ভাষার বিভিন্নতা আর একটি একতার ব্যাঘাত—কিন্তু ইহাকে আমরা তত গুরুতর বলিয়া মনে করি [illegible]—[illegible] না, হিন্দুস্থানী

ভাষা ব্যবহারতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। কি বাঙ্গালী—কি বোম্বাইবাসী—কি মান্দ্রাজি—প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও সাধারণ হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে অনায়াসে কথোপকথন চলিতে পারে। তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে সাধারণের মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার যাহাতে আরও অধিক চালনা ও শিক্ষা হয় তৎপ্রতি দেশহিতৈষী মাত্রেরই যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। এক কথায়—আচার ব্যবহারে, ভাবে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যতই ভারতবর্ষ একতার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই হিন্দুগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত [illegible]।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে আমাদিগের দুই প্রকার অভাব আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাব এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অভাব। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে একতার অভাব দেদীপ্যমান—এবং বিজ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি এই একতা-সম্পাদনের বিশিষ্ট উপায়—সুতরাং এ সকলও সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে গণ্য—এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশকেই সাধারণরূপে মনোযোগ দিতে হইবে—কিন্তু এই সাধারণ অভাব ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশের আবার বিশেষ বিশেষ অভাব আছে—যে প্রদেশের যে বিশেষ অভাব তৎ-মোচনার্থ সেই প্রদেশবাসীদিগের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। পঞ্জাবীদিগের শরীরে বল আছে, মনের তেজ আছে—হয়তো জ্ঞানের অভাবই তাহাদিগের মুখ্য অভাব। বোম্বাইবাসীদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের তেমন অভাব নাই—হয়তো মানসিক তেজের অভাব। হিন্দুস্থানীদিগের শারীরিক বলের অভাব নাই, হয়তো বুদ্ধির অভাব। বাঙ্গালীদিগের বুদ্ধির অভাব নাই—তাহাদিগের শারীরিক বল সাহস ও একতার নিতান্ত অভাব। এইরূপ প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভাব, এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ প্রত্যেক জাতির বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। অন্যান্য প্রদেশের কি কি বিশেষ অভাব তাহা আমরা নিশ্চয় রূপে অবগত নহি—বঙ্গদেশের যে বিশেষ অভাব, প্রথমে তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মনে স্বাধীনতা-স্পৃহা বলবতী হইয়াছে—এই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য প্রথমেই কি আবশ্যক? অন্য ভারতবাসীদিগের পক্ষে যাহাই হউক, বাঙ্গালীদিগের মুখ্য ও বিশেষ অভাব কি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের মুখ্য ও প্রথম সাধন কি?

কে না জানে, বাঙ্গালীজাতি শরীরের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার জন্য জগদ্বিখ্যাত। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতাই বাঙ্গালি জাতির কলঙ্ক। এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে চরিত্রের আর যে সকল দোষ স্বভাবতই উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার সমস্তই বাঙ্গালী জাতিতে বর্ত্তিয়াছে; আলস্য, জড়তা, নিরুৎসাহ, অমুদারতা, ক্ষুদ্রতা, বৃথা-অভিমান প্রভৃতি শারীরিক দুর্ব্বলতার যে সকল অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। অতএব এই অভাবটি যত দিন না মোচন হইবে তত দিন বাঙ্গালী জাতির কোন আশা নাই। এই অভাব মোচন না হইলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চাই হউক—বাণিজ্য শিল্পের অনুশীলনই হউক বা রাজনৈতিক উদ্যমের পরিচয় দিয়া (Political spirit) সভায় বক্তৃতারই ধুমধাম হউক, বাঙ্গালীর প্রকৃত অভাব কিছুতেই ঘুচিবে না—তাহারা কখনই প্রবল জাতিদিগের মধ্যে গণ্য হইবে না—তাহারা কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে না। এক্ষণে শারীরিক উন্নতির উপর আমাদিগের সকল উন্নতি নির্ভর করিতেছে। শরীর দুর্ব্বল হইলে—কি বিজ্ঞান, কি বাণিজ্য, কিছুতেই সম্যক্‌রূপে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। মাড়োয়ারিয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে যেরূপ শারীরিক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে, তাহা কি দুর্ব্বল বাঙ্গালীর সাধ্য?—সাধ্য নাই বলিয়া কেঁয়ে মাড়োয়ারিরা বাঙ্গালার সকল বিপণীতেই বাণিজ্য-ব্যাপারে বাঙ্গালীদিগকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতেছে। জ্ঞানের কথা যদি বল—এত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে—কৈ তাহা হইতে স্থায়ী ফল কি ফলিয়াছে? স্থায়ী ফল ফলিতেছে না কেন, তাহার কারণ কোন পূর্ব্ব সংখ্যার ভারতীতে যেরূপ চিত্রবৎ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "খর্ব্বকায় রুগ্ন শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে, অভাবে, শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে, পুরুষের মত, বীরের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এগন্ নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবে কি করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীন নেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্য্যগ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ সকল কি আমাদের দৃষ্টি-অভাবে চসমা চক্ষু, রাত্রি জাগরণে অজীর্ণরোগী, বিশ্রাম-অভাবে রুগ্ন দেহ, বায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বি এ এমের কর্ম্ম?"—যদি তর্কের খাতিরেও আপাতত স্বীকার করা যায় যে, জ্ঞানানুশীলন শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে না, তথাপি ইহা কে স্বীকার করিবে যে বিনা শারীরিক বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত বা রক্ষিত হইতে পারে? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বাহুবল অর্জ্জনই প্রথম সাধন। শারীরিক বলই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম পত্তন-ভূমি। তবে, বাহুবল ও জ্ঞানবলের মধ্যে জ্ঞানবল যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, বাহুবলের সীমা আছে, জ্ঞানবলের সীমা নাই। এখনকার যুদ্ধ-বিগ্রহে বাহুবলের অপেক্ষা জ্ঞানবলের উপরেই অনেকটা জয় পরাজয়

নির্ভর করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এক্ষণে বাহুবলের প্রয়োজন যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে—বরং দুই পক্ষের মধ্যেই যদি জ্ঞানবল সমান থাকে—এবং উহার এক পক্ষে বাহুবলের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে যে পক্ষে বাহুবলের আধিক্য, সে পক্ষ যে জয় লাভ করিবে তাহা এক প্রকার নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে। অতএব বিজ্ঞান-অনুশীলনই কি বাঙ্গালির পক্ষে যথেষ্ট?—বিজ্ঞান হইতে আমরা বন্দুক লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু সেই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ১০। ২০ ক্রোশ অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইয়া ভীষণ বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া কি শারীরিক বল ও সাহসের কর্ম্ম নহে? লেখক মহাশয় তো এক স্থলে আপনিই বলিয়াছেন যে—"Nay history proves more—It proves that even if the conquering race occupy an inferior scale of civilization, even if it be destitute of those arts and sciences which are generally recognized as the inevitable concommitants of a civilized life and have no other qualities to recommend itself but manly courage, abounding energy and undisguised frankness, its hammering down the tottering remnants of a highly civilized but exceedingly corrupt nation is of rare service to humanity as a whole. It is hardly necessary to allude to those whom we mean. We mean of course the Franks, the Goths and the Vandals." অতএব তিনি এই স্থলে আপনিই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বিজ্ঞান শিল্পই মুখ্য সাধন নহে—এবং ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-স্থল। কিন্তু তিনি আর এক স্থলে বিজ্ঞানকে স্বাধীনতা লাভের মুখ্য সাধন বলিতেছেন—"Thus science—that which our present wise and benevolent Ruler has already proposed seems to be the chief remedy—yea the panacea to say to all the frightful maladies which our dear country is so intensely suffering from. Following his advice, let us direct our efforts to a thorough cultivation and as much as possible to a wide diffusion of Science. It is Science, it is 'Culture' in the German sense of that word that should now engage our best energies, in order that we may in due time reap its golden fruits which are:—National Prosperity, National Liberty, and as the full mature outcome of all, a free vigorous and noble National Literature." অতএব উদ্ধৃত দুই স্থল যে পরস্পর বিরোধী তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। এবং লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শারীরিক বল ও সাহস এবং ধৈর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বীরধর্ম্মকে একেবারেই ধরেন নাই বলিয়াই এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বলি—সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বিজ্ঞান ও বাহুবল উভয়ই আবশ্যক। ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি বিজ্ঞান-শিল্প-বিহীন অসভ্যেরা যদি কেবল পৌরুষ, সাহস, অপরিমিত উদ্যম এবং অপ্রচ্ছন্ন সরলতার বলে জগদ্বিজয়ী রোমকদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালিজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কি বিজ্ঞান শিল্পই বিশিষ্ট উপায়—মুখ্য সাধন—সকল রোগের মহৌষধি? যদি জগদ্বিজয়ী রোমকদিগের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে পৌরুষ সাহস প্রভৃতিই নিতান্ত আবশ্যক হয় এবং সেই সকল গুণের অভাবই তাহাদিগের পতনের কারণ হয়, তাহা হইলে চির দাসত্ব-পীড়িত হীনবল ভীরু বাঙ্গালি জাতির পক্ষে কি ঐ সকল গুণের অর্জ্জন চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আরও প্রয়োজন নহে? বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমরা অনাদর করিতে বলিতেছি না—অনাদর করা দূরে থাকুক, বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির প্রধান সোপান বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, কেবল মাত্র বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের বলে কোন জাতি এপর্য্যন্ত স্বকীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পক্ষে এখন শারীরিক বল ও সাহসের নিতান্ত প্রয়োজন। লেখক মহাশয় লর্ড লিটনকে এই জন্য সাধুবাদ দিয়াছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের দিন এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন যে, হিন্দুদিগের শিক্ষা ও উন্নতির পক্ষে বিজ্ঞান যেমন উপকারী, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু আমরা বলি, লর্ড লিটন মুখে মাত্র এই বক্তৃতা করিয়া যত না আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, তদপেক্ষা আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব বিদ্যার্থীদিগের জন্য ব্যায়ামচর্চ্চা ও কর্ম্মার্থীদিগের জন্য অশ্বারোহণ শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগের অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে জ্ঞানানুশীলনে যেরূপ সকলে মনোযোগী হইতেছেন, শারীরিক বল, সাহস, উদ্যম, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণসকল যে উপায়ে বাঙ্গালিরা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহারও প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য বীর্য্য দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণসকল যে অনেক পরিমাণে শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদিও কেবল সুশিক্ষার প্রভাবেই অনেক সময় আমাদিগের কর্ত্তব্য-বোধ ও অন্যান্য উচ্চতর স্পৃহা মনে উদ্বোধিত হইয়া আমাদিগকে পুরুষোচিত মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে শারীরিক বল আমাদিগের সহায় না থাকিলে আমরা সেই সকল কার্য্যে আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হই না, আমাদিগের উক্ত স্পৃহা সকলকে কার্য্যে সম্যক্‌রূপে পরিণত করিতে পারি না। শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ অনেক সময় [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]

কারণ কি?—কারণ আর কিছুই নহে—শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের মনে নানা প্রকার উচ্চ স্পৃহা উদিত হয়—কর্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সেই সকল স্পৃহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা অনেক বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করি কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের স্বাভাবিক দৈহিক দুর্ব্বলতা-প্রসূত জড়তা আসিয়া আমাদিগকে সেই সকল অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিতে দেয় না কিম্বা সমাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে স্থায়ী করিতে দেয় না।

এক্ষণে বঙ্গবাসীগণ কি উপায়ে শারীরিক বল ও সাহস সঞ্চয় করিবেন ভাবিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়। আমাদের দেশের জল বায়ু, ভূমি ও ভৌগোলিক সংস্থান সকলই শারীরিক বলের বিরোধী—মনটেস্ক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বকল ও টেন পর্য্যন্ত সকলেই জাতীয় চরিত্রের উপর বাহ্য প্রকৃতির কত দূর প্রভাব তাহার ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন—এই বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব ভাবিতে গেলে বাঙ্গালীরা যে কোন কালে বীর-জাতি হইবে এরূপ আশা মন হইতে একেবারে দূর করিতে হয়। কিন্তু বাহ্য প্রকৃতিকেও জয় করিতে পারে এরূপ আর একটি প্রবলতর শক্তি মনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে—সেটি মনের শক্তি—ইচ্ছার শক্তি—অধ্যবসায়ের শক্তি—এই শক্তির প্রভাবেই মনুষ্যগণ বাহ্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যেও সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—নীরস মরুভূমিকেও প্রফুল্ল উদ্যানে পরিণত করিতে পারিয়াছে—অপার সাগরকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা যখন জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়াছি যে, শরীরের দুর্ব্বলতাই আমাদিগের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ—তখন যদি আমরা ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া অধ্যবসায়সহকারে—যে সকল সামাজিক প্রথা আমাদের শরীরের বল-নাশক, সেই সকল সামাজিক প্রথাকে উন্মূলিত করিয়া—স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ও ব্যায়াম চর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া শারীরিক বলের সাধনা করি—তাহা হইলে কি আমরা জল বায়ু ভূমি প্রভৃতির প্রাকৃতিক প্রভাবকে কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিতে পারি না?—বকল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জাতীয় চরিত্রের উপর জল বায়ুর প্রভাব যত দূর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ততদূর বাস্তবিক কিনা তাহা অধুনাতন কোন কোন চিন্তাশীল লেখক সন্দেহ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত লেখক Bagehot তাঁহার "Physics and Politics" গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "Climate and physical surroundings, in the largest sense, have unquestionably much influence; they are one factor in the cause, but they are not the only factor; for we find most dissimilar races of men living in the same climate, and affected by the same surroundidgs; and we have every reason to believe that those unlike races have so lived as neighbours for ages." প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Wallace সাহেব বলেন Papuan ও Malay জাতি একই গ্রীষ্ম-প্রধান প্রদেশে যুগ-যুগান্তর হইতে পাশাপাশি রহিয়াছে অথচ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিভিন্নতা বিদ্যমান। তাঁহার গবেষণায় আরও প্রকাশ পায় যে, জন্তুদিগের পক্ষেও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাব, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় বলবৎ নহে। তিনি বলেন—"Borneo closely resembles New Guinea, not only in its vast size and freedom from volcanoes but in its variety of geological structure, its uniformity of climate, and the general aspect of the forest-vegetation that clothes its surface. The Moluccas are the counterpart of the Philipines in their volcanic structure. their extreme fertility, their luxuriant forests, and their frequent earthquaqes; and Bali, with the east end of Java, has a climate almost as arid as that of Timor. Yet between those corresponding groups of islands, constructed, as it were, after the same patern, subjected to the same climate, and bathed by the same oceans, there exists the greatest possible contrast, when we compare their animal production. Nowhere does the ancient doctrine- that difference or similarities in the various forms of life that inhabit different countries are due to corresponding physical differences or similarities themselves —meet with so direct and palpable a contradriction. Borneo and New Guinea, as alike physically as two distinct countries can be, are zoologically as wide as the poles asunder; while Australia with its dry winds, its open plains, its stony deserts and its temperable climate yet producess birds and quadrupeds which are closely related to those inhabiting the hot, damp, luxuriant forests which everywhere clothe the plains and mountains of New Guinea"—অতএব বাঙ্গালী যুবকগণ যদি অধ্যবসায়সহকারে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায়ের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কেনই বা না বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া শারীরিক বল সঞ্চয়ে সমর্থ হইবেন? কিন্তু এই প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল যাঁহারা অচিরাৎ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন—কেন না, যে নিয়মে আমরা পূর্ব্বপুরুষের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হই, সেই কৌলিক নিয়মের প্রভাবে আমরা আমাদিগের অধ্যবসায় সত্ত্বেও—পূর্ব্বপুরুষদিগের দুর্ব্বল শারীরিক গঠন ও প্রকৃতির উত্তরাধিকার হইতে একেবারেই অব্যাহতি পাইব না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে বহুকালব্যাপী চেষ্টা ও অধ্যবসায় কৌলিক অধিকারের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি কিম্বা জাতির উন্নতির মূলে—এমন কি, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি মূল নিয়ম দৃষ্ট হয়। একটি কৌলিক গুণ-প্রবাহের নিয়ম (Principle of Heredity) আর একটি উপযোগিতার নিয়ম (Principle of Adaptibility.) এই দুইটি নিয়মই মনুষ্য-সমাজে একত্র কার্য্য করিতেছে। প্রথমোক্ত নিয়মটির প্রভাবে আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষ গুণের উত্তরাধিকারী হই, এবং শেষোক্ত নিয়মটির অনুযায়ী আমাদিগের নিজ চেষ্টায় আপনাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হই। যাহা বরাবর হইয়া আসিয়াছে তাহাই রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহারই স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি নিয়ম সতত চেষ্টা করে, অপর নিয়মটি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আমাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তনের দিকে—উন্নতির দিকে লইয়া যায়—এক কথায় একটি রক্ষণশীল—আর একটি পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল। এই দুই নিয়মে সমাজের শ্রেণীগত সাদৃশ্য রক্ষিত হয় ও ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। নূতন নূতন ঘটনা ও অবস্থা-স্রোতে আমরা একেবারে ভাসিয়া না যাই, কৌলিক নিয়ম আসিয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে এবং কৌলিক নিয়মানুসারে যে দোষ-প্রবাহ বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইবার কথা, উপযোগিতার নিয়ম আসিয়া তাহার পরিশোধন চেষ্টা করে; এইরূপে এই দুই নিয়মের ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্য সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

আমরা বাঙ্গালি জাতি যেমন একদিকে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে দয়া, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্গুণের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ আর এক দিকে তাঁহাদিগের ভীরুতা, নির্ব্বীর্য্যতা প্রভৃতি দোষেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি। এইক্ষণে এই দোষগুলি আমাদিগের চরিত্র হইতে অপনীত করিবার জন্য বাহিরের ঘটনাবলী ও অবস্থা কতদূর অনুকূল ও উপযোগী দেখা আবশ্যক। বলিষ্ঠ সাহসী ইংরাজ-জাতির সংশ্রব ও দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন এই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে উপযোগী, সেইরূপ আর একদিকে ইংরাজি সভ্যতা তাহার প্রতিকূল কি না তাহা আমাদিগের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। Mill মিল তাঁহার সভ্যতা নামক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে বলেন যে, ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে ইংরাজদিগের বীর্য্য দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তিনি বলেন—"There has crept over the refined classes. over the whole class of gentlmen in England, a moral effemminacy, an inaptitude for every kind of struggle. They shrink from all effort, from every thing which is troublesome and disagreeable. The same causes which render them sluggish and unenterprising, make them, it is true for the most part, stoical under inevitable evil.. But heroism is an active not a passive quality, and when it is necessary not to bear pain but to seek it, little needs pe expected from the men of the present day. They can not undergo labour, they can not brook ridicule, they can not brave evil tongues: They have not hardihood to say an unpleasant thing to any one whom they are in the habit of seeing, or to face even with a nation at their back, the coldness of some little coterie which surrounds them."

যদি বলিষ্ঠ ইংরাজজাতিকেও ইংরাজি সভ্যতা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে চির-দুর্ব্বল বাঙ্গালি জাতি তো উহার দ্বারা আরও দুর্ব্বল হইবার কথা। এখনও ইংরাজদিগের প্রকৃতিতে কুল-পরম্পরাগত এতখানি সার সঞ্চিত আছে, অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্সন রক্তের এত অধিক তেজ আছে যে, তাহারই বলে তাহারা ইংরাজি সভ্যতার দৌর্ব্বল্যজনক প্রভাব কথঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালিজাতির সে সারও নাই, সে তেজও নাই, অথচ সেই ইংরাজি সভ্যতার সমস্ত ভার তাহাদিগের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। বাঙ্গালিজাতির পরম্পরায় অর্জ্জিত অন্তরের সারবত্তা ও শারীরিক বল নাই বলিয়াই তাহারা কোনও বিদেশীয় জাতির প্রভাব এ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল, তখন আমরা মুসলমানদিগের সভ্যতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে আবার ইংরাজি সভ্যতায় সম্পূর্ণ রূপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। মুসলমানদিগের আমলে তাহাদিগের অনুকরণে চাপকান কাবা পরিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার একেবারেই হ্যাট্ কোট্ পেণ্টুলুন পরিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমানি সভ্যতা ইংরাজি সভ্যতা অপেক্ষা আরও দৌর্ব্বল্যজনক। মুসলমানদিগের তুলনায় ইংরাজের সংশ্রব আমাদের পক্ষে যে অনেক উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান সভ্যতার সহিত আলস্য ও বিলাসের মূর্ত্তিমান প্রতিরূপ-আতর গোলাব তাকিয়া গদি প্রভৃতি যেন একেবারে জড়িত, এবং ইংরাজি সভ্যতাগত বিলাস সামগ্রীর মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কার্য্যতৎপরতা ও উদ্যমের ভাব লক্ষিত হয়। ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, ইংরাজদিগের সংসর্গে, শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে আমাদিগের কার্য্য-তৎপরতা ও শ্রমশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক নহে, সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করা যায় না। শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তি হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে উদ্যম-তৎপরতা প্রসূত হয়, তাহাই অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ ও স্থায়ী। ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে আমাদের এত অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আর অল্পে সন্তুষ্ট হইবার যো নাই। জীবিকার উপায় করিবার জন্য আকুল হইয়া সকলকে ইতস্ততঃ বেড়াইতে হইতেছে, এমন কি, উহার জন্য আমাদিগের যুবকদিগকে সাত সমুদ্র পার হইয়া দূর দেশে যাইতে হইতেছে। এক [illegible]

শরীরে কি সহ্য হইবে? এক্ষণে ইংরাজদিগের শাসনে আমাদিগের মধ্যে যেরূপ এক দিকে কার্য্য-তৎপরতা, উদ্যম ও স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হইতেছে—সেইরূপ আর এক দিকে আমাদিগের দৈহিক বল-সঞ্চয়ের প্রতি লোকের কি সেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দেখা যায়? মুসলমানদিগের আমলে তেমন সুশাসন ছিল না—দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং সকলকে দায়ে পড়িয়া শারীরিক বল ও সাহস অর্জনের চেষ্টা করিতে হইত। তখন লেখা পড়ারও এত চাপ ছিল না, সুতরাং শরীরের প্রতি অনেকটা লোকের দৃষ্টি থাকিত। বিপদের সহিত সংগ্রাম না করিলে কখনই সাহস ও আত্ম নির্ভরের শিক্ষা হয় না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বিপদের লেশমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা শান্তির ক্রোড়ে দিব্য আরামে শুইয়া আছি। রাজপুরুষদিগের উপর সমস্ত নির্ভর, আপনার উপর কিছুই নির্ভর করিতে হয় না। পুলিসের এমনি শাসন, জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমাদিগের নিজের কোন চেষ্টা পাইতে হয় না। এই জন্য শারীরিক বল ও সাহস অর্জনের নিমিত্ত আমাদিগের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তাতে আবার লেখা পড়ার এত চাপ যে, এতদ্দেশীয় যুবকেরা শরীরের প্রতি মনোযোগ দিতে অবকাশ পান না এবং রাজপুরুষদিগেরও সে দিকে দৃষ্টি নাই। আমরা এ কথা বলি না যে, অরাজকতা হউক, অশান্তি হউক, লেখা-পড়া দেশ হইতে উঠিয়া যাউক, কেবল শারীরিক বল অর্জনে লোকের চেষ্টা হউক। তাহা আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় নহে। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, জ্ঞান-বিরহিত শারীরিক বল পশুতেই শোভা পায়—তাহা মনুষ্যের উপযুক্ত নহে, এবং ইহাও বিলক্ষণ জানি যে, যদি কোন জনসমাজে অরাজকতা অশান্তি থাকে, জীবন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তই সকলকে আকুল হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমাজের অন্তর্ভূত কোন ব্যক্তি শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আমাদিগের সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা শারীরিক বল ও সাহস অর্জনের অনুকূল নহে, সেই জন্যই আরও দেশের লোক ও রাজ-পুরুষদিগের এই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। আমরা এক্ষণে যে শান্তি উপভোগ করিতেছি তাহা নির্জীবের শান্তি—তাহা মৃতদেহের শান্তি—তাহা বলবান জীবন্ত পুরুষের শান্তি নহে। শান্তিকে রক্ষা করিবার জন্যও বলের প্রয়োজন। যদি আমাদিগের নিজের বল না থাকে, তাহা হইলে শান্তি রক্ষার জন্য চিরকালই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে, যে শান্তি রক্ষার জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে শান্তির স্থায়িত্ব কোথায়? আজ যদি ইংলণ্ড আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান, আমাদিগের এতটুকুও কি বল-সঞ্চয় হইয়াছে যে, আমরা নিজ বলে আপনাদিগের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারি? সত্য, ইংলণ্ডের প্রসাদে আমরা তাড়িত-বার্ত্তাবহ পাইয়াছি—বাষ্পীয় শকট পাইয়াছি, বাষ্পীয় আলোক লাভ করিয়াছি, কিন্তু ইংলণ্ড যদি আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান—তা হইলে উহার অবশিষ্ট আর কি থাকে? তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি কি তড়িতের ন্যায় তিরোহিত হয় না? এবং বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি কি বাষ্পের ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইয়া যায় না? ইংলণ্ডের কামান বন্দুক রেয়লেট্টা শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে সত্য—কিন্তু ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে কি আমরা শিশুর ন্যায় একেবারে অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ি না।

আমরা ইংলণ্ডের নিকট আর কিছুই চাহি না—আমাদিগের বাহ্য সুখ সমৃদ্ধি হোক্ বা না হোক্ তাহাতে ক্ষতি নাই। তিনি যদি আমাদিগের মৃতবৎ নির্জীব দেহে এতটুকু বল সঞ্চার করিতে পারেন যে আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি—আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারি—আপনার উন্নতি আপনারাই সাধন করিতে পারি—তাহা হইলেই আমরা তাঁহার নিকট প্রকৃত উপকার লাভ করিব—এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইব।—তিনি যদি আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লন—তিনি যদি উপযুক্ত দেশীয় লোকদিগকে রাজ্যের উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে কৃপণতা করেন—তিনি যদি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য বীজ বপন করেন—তিনি যদি দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি বিদ্বেষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন—তিনি যদি দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করেন—তিনি যদি দেশীয়দিগকে পদে পদে অবিশ্বাস করেন—তিনি যদি আমাদিগকে চিরকাল শৈশব দশায় রাখিতে চেষ্টা করেন—তাহা হইলে আমরা কি কখন স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইতে পারি? স্বীকার করি আমাদিগের নিজের চেষ্টা, নিজের অধ্যবসায়ের উপর অনেকটা নিজের উন্নতি নির্ভর করে কিন্তু আমরা সহস্র বৎসরের অধীনতায় একেবারে চিররোগীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—আমাদিগের দুর্ব্বল চেষ্টায় কত দূর হইতে পারে? তাহাতে যদি আবার কোন উচ্চতর প্রভুশক্তি আসিয়া আমাদিগের উন্নতির পথে সহায়তা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাতে কণ্টক রোপণ করেন, তাহা হইলে কি আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি? লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন 'Do you think if we *deserve* liberty, that is to say, if we have slowly but surely developed those conditions which alone entitle a nation to that grand golden privilege, England would be willtng to withhold us from it—England, the land of noble herbic patriots ?"

লেখক মহাশয়ের ন্যায়, স্বাধীনতার জন্মভূমি ইংলণ্ডও অনেক সময়ে আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়া থাকেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও...তবে তোমাদিগকে আমি উক্ত অধিকার প্রদান করিব—কিন্তু উপযুক্ত হইবার অবসর না দিলে কেহ কখন কি উপযুক্ত হইতে পারে?—পিতা যদি তাঁর দুর্ব্বল সন্তানকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়া তাহাকে বলেন যে, অগ্রে তুমি

উপযুক্ত হও তবে তোমাকে আমি পদচারণা করিতে দিব—সে যেরূপ আশ্বাস-বাক্য ইহাও তদ্রূপ। শিশুকে পদচারণা শিক্ষা দিবার সময় শিশু পদে পদে স্খলিত-পদ হয়—কিন্তু এই রূপ পদস্খলনের ওজর করিয়া যদি তাহাকে বলা হয়—তোমার এখনও উপযুক্ত বল হয় নাই, যখন বল হইবে তখন পদচারণা করিও—এ যেরূপ কথা উহাও সেই রূপ। সমস্ত হিন্দুজাতি জেতৃজাতির ইচ্ছামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে—লেখক মহাশয় এইরূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, কিন্তু চিরকাল শৈশব দশায় থাকা অপেক্ষা একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়াই কি প্রার্থনীয় নহে?

ইংলণ্ডের একবার ভাবা উচিত, কি মহান ভার বিধাতা তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন—বিংশতি কোটি মানবের সুখ-শান্তি স্বাধীনতা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি প্রথমে জয় করিবার উদ্দেশে এখানে আসেন নাই—বাণিজ্যের জন্যই আসিয়াছিলেন—মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে আমাদিগের সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াছি বলিলেও হয়। একবার তিনি স্মরণ করিয়া দেখুন, যে পলাশির যুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন, সে যুদ্ধে কাহার সাহায্যে তিনি জয় লাভ করিলেন!—আমরা দাসত্ব অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবার জন্য তাঁহাকে ডাকি নাই, দাসত্ব অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম—এই মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্যই বিধাতা ভারতবর্ষকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব ইংলণ্ড আমাদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও আশা উদ্দীপিত করিয়া যেন তাহা আবার কঠোর ফুৎকারে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা না পান—এখন তিনি যেন না বলেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, পরে তোমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। তিনি আমাদিগকে অগ্রে স্বাধীনতার অবসর দিন—স্বাধীনতা-স্ফূর্ত্তির পরিসর দিন—স্বাধীনতার শিক্ষা দিন—তাহার পরে বলুন "অগ্রে স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত হও, পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও।"

ACT III OF 1872.

The *Tattwa Koumudi* and the *Brahmo Public Opinion* have replied to our article on this subject published in our issue for *Agrahayana* last. Our contemporaries contend that what is required by the Act to be done by the bride and the bridegroom before the Registrar is a simple declaration and not regular marriage. Granted. But the main argument remains unanswered that, when the marriage takes place in the solemn presence of God, it is unnecessary, nay sacrilegious, to bring in a human being to witness it *to secure its validity*. We are surprised to note that our God-fearing and God-honouring contemporaries do not perceive the above.

The *Tattwa Koumudi*, in one of its articles on the subject, says that the word "Brahmo" denotes a difference between Brahmos and Hindus. We maintain the very contrary. We urge that the word "Brahmo" denotes the Hindu character of Brahmoism and that the distinction which our friends make between Brahmos and Hindus vitally injures the cause of Brahmoism since it unnecessarily isolates Brahmoism from Hinduism and creates ill-feeling between Brahmos and Hindus whereas there is no necessity for such isolation and the creation of such ill feeling. There are two kinds of Hinduism, idolatrous Hinduism and non-idolatrous Hinduism. The latter is Brahmoism which, as inculcated by those old Theists, the ancient Rishis, has recently received certain modifications at the hands of Ram Mohun Roy and Debendra Nath Tagore. This is owing to its progressive character as Theism. The bride and the bridegroom are required to say before the Registrar that they do not believe in Hinduism. They are thereby made to utter a falsehood since the very term "Brahmo" signifies they are Hindus and therefore believe in non-idolatrous Hinduism. Those, who do not believe that Brahmoism, in addition to its catholic character, is Hinduism, should renounce the name of Brahmo. Our contemporaries say that the word "Hinduism" in the Act means "popular Hinduism" but, according to the genius of the English language, it evidently means all kinds of Hinduism.

Our contemporaries charge us with having attempted to have the designation of the Bill which was at first named "the Brahmo Marriage Bill," changed. We were obliged to do so both on catholic and national grounds. The Theists of England and America do not come under the designation of Brahmos. The Brahmos of the Adi Brahmo Samaj maintain that Brahmos form a component part of the Hindu community and do not wish to be ticketted as Brahmos by having a different marriage law made for them. They observe the old marriage ritual, bereft of its idolatrous portions and accompanied by Brahmo prayers.

We are really sorry for our contemporaries and the members of the Samaj which they represent. By placing themselves under a Government Act in matter of marriage, they have subjected their vital interests to the whim and caprice of a foreign government. The permission for divorce which the Act grants is revolting to the national idea and is likely to slacken the marriage bond and introduce immorality among Brahmos.

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় ... ১
বেদান্ত প্রবেশ ১
স্মৃতি ১
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ... ১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? ।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৴০
গীতাঙ্কুর ... ... ।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ... ॥০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা ॥০
A Discourse against Hero-making in religion As 12
Science of Religion 4

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) ১৸৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে) ... ... ২॥৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ... ।৴০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ ॥৵০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ... ।৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ ... ৶০
গৃহকর্ম্ম ৶০

	As.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	0
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi-Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query: What is Brahmoism? ...	3	0
Theistic Toleration and Diffusion of Theism ...,	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible ...	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব ... ৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ... ৶০

বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ... ।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ।০
মাঘোৎসব ... ... ॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৶৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ... ।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৶১
ভবানীপুর সাংবৎসরিক সমাজের বক্তৃতা (১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ... ৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১
অধিকারতত্ত্ব ... ... ।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি ... ... ॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ... ... ।১০
তত্ত্বপ্রকাশ ... ... ।১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ... ... ।১৫
ব্রহ্মোপাসনা ... ... (১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ... ... (১০
ব্রহ্ম স্তোত্র ... ... (১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা ... ... ।০
প্রবচন সংগ্রহ ... (১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ... ।০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ... ।০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ৶০
কুমার শিক্ষা ৶০
প্রশ্নমঞ্জরী ... ... ।০
প্রভাত-কুসুম ৶১০
উদ্বোধনাঞ্জলি ... ... (১০
ধর্ম্ম দীক্ষা ... ... (১০
ব্রহ্মসাধন ... ... ।০
ব্রহ্মজ্ঞান ... ... (১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ... ।১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ... (১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ... ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন সমাজের সম্বন্ধ (১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব (১০
উপদেশ ... ... (৫
দুর্গোৎসব ... ... (১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১০
বর্ণমালা প্রথম সংখ্যা ... (৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ... (১০

	Rs.	As.	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book ...			6
Signs of the Times ...			6
Vedantic Doctrines Vindicated ...		1	0
Doctrine of Christian Resurrection		1	0
Physiology of Idolatry ...		1	0
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	0

নির্দ্ধারিত বিক্রি মূল্য।

ধর্ম্মোপদেশ	৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	।০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	(১০

১৭৭০ শক অবধি ১৭৯৮ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২৷৷০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২৷৷০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ ই মাঘ রবিবার দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটি সভা হইবে। উক্ত সভার কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীমত সম্পাদিত হইবে। ব্রাহ্ম মহাশয়গণ উক্ত সভায় আগমন করিয়া কার্য্য সুসম্পাদন করিবেন।

বিষয়	বক্তা
১। সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বিষয়ে সংক্ষেপ বক্তৃতা	শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্ম সঙ্গীত।	
৩। রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা	শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৪। রামমোহন রায়ের প্রশংসাসূচক সঙ্গীত।	
৫। রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য	শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র বসু।
৬। রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত।	
৭। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে রামমোহন রায়ের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতা পাঠ	শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
৮। রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত।	

শেষে সকলে আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া সমস্বরে ঈশ্বরবন্দনা করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগামী ৭ই মাঘ রবিবার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা উপলক্ষে তথায় তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি নগদ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

পুস্তকের নাম	মূল্য
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী,১ম হইতে ১০ম সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা	৷৷০
Hindu Theism	।০

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পুস্তকরক্ষক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ১১ই মাঘের উৎসবে অত্যন্ত জনতা ও লোকেরা দুঃকষ্ট হয়, তজ্জন্য ঐ দিবসে রাত্রিকালের উপাসনায় সময় উপাসনা ক্ষেত্রের বসিবার স্থান লোকপূর্ণ হইলে, প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ...	...	১৪২৪
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৩৩৷৷৶০
সমষ্টি		১৬৫৭৷৷৶০
ব্যয় ...	...	১৫১২ ৶১৫
স্থিত ...	...	১৪৫ ।৶৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৯২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৭২
পুস্তকালয়	৪৫ ।৶১৫
যন্ত্রালয়	৬৪৪ ৵১৫
গচ্ছিত	৬৮ ৵৶১০
সমষ্টি	১৪২৪

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৮০।৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৮৯
পুস্তকালয়	১২৭৮৶০
যন্ত্রালয়	৮৪৬ [illegible]
গচ্ছিত	৬৯ ।৶৫
সমষ্টি	১৫১২ ৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
,, রমণীমোহন চৌধুরী রায়বাহাদুর ...	২৫
,, নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
,, তারকনাথ দত্ত	১০
,, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৫
,, অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়	৫
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
,, হরকুমার সরকার	২
,, রাজনারায়ণ বসু	১
,, গুরুচরণ মিত্র	১
,, মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৫
	১৪৬

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী রায়বাহাদুর ...	১৫
,, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২
	১৭

দানাধারে প্রাপ্ত	[illegible]
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	[illegible]
	১৯২

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd No 52.

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৫২৭ সংখ্যা | ফাল্গুন ১৮০০ শক। | ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০০ শক।

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ির বক্তৃতা।

সেই এক সময়, যখন এই ভারতভূমি, বঙ্গভূমি ঘোর কুসংস্কার মোহ কাল্পনিক ধর্ম্ম ও পাপের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। হা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! যখন ধর্ম্মের নামে যার পর নাই নিষ্ঠুর ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত হইত, এক পবিত্র ধর্ম্মের অভাবে - ঈশ্বরের ধর্ম্মের অভাবে যখন চারি দিকে হাহাকার—গৃহস্থের গৃহ শ্মশান-সমান, সেই দুঃখের রজনী ভেদ করিয়া যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ তেজঃপুঞ্জ তপন বঙ্গভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দিন এগারই মাঘ। ইহারি নিমিত্ত এই দিন স্মরণীয়। ইহারি নিমিত্ত এই দিনের এত গৌরব। ইহারি নিমিত্ত এই দিন ব্রাহ্মমণ্ডলীর মহোৎসবের দিন।

এমন এক সময় ছিল, যখন নির্জ্জন-প্রিয় কৃতাত্মা ঋষি সকলই কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আর জন-সাধারণ কেবল বিষয়-কর্ম্মরূপ মৃত্যু-পাশেই বদ্ধ থাকিত। এই ১১ই মাঘেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, কৃপাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে, এই জন-সম্বাধ মহানগরীর মধ্যে এই স্থানে সেই অমৃত ফলের বীজ রোপণ করেন, যাহা অঙ্কুরিত হইয়া নয়নরঞ্জনকর শোভাময় বৃক্ষ-রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহারি নিমিত্ত এই পবিত্র স্থান ও এই পবিত্র ১১ই মাঘ ঈশ্বরপরায়ণ মাত্রেরই হৃদয়-মন-প্রাণ আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ স্বাভাবিক। সুতরাং এই মহোৎসব স্বাভাবিক। কাহারও কল্পনা হইতে ইহা সমুত্থিত হয় নাই। ইহা সেই দেব-দেব কর্ত্তৃক প্রেরিত। তিনি এই উৎসবের প্রাণ। এই উৎসবে তাঁহার আবির্ভাব কেমন সুস্পষ্ট। আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে এই উৎসব-ক্ষেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিব বলিয়া আমরা যেমন ব্যাকুল, তিনিও তেমনি পরমাশ্চর্য্য অরূপ-রূপ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর যিনি পাপরূপ

শলাকা দ্বারা বিশ্বাস-চক্ষু ভক্তি-চক্ষু নষ্ট করিয়াছেন—তিনি যে অরূপ-রূপ-মাধুরীর কথা কি বুঝিবেন।

হা। তিনি শিব সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য্যের সার। তাঁহার সৌন্দর্য্য আমাদের হৃদয়-প্রাণ-মনকে এপ্রকার অপ্রতিহত ভাবে আকর্ষণ করিতেছে যে আমরা এখন উদাস হইয়া আপনা হইতেই বলিতেছি, "তাঁর সমান কেহ চক্ষে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে"! ব্রাহ্মগণ কি পবিত্র সময়। কোথা আমরা ক্ষুদ্র মলিন মানব, আর কোথা তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরিশুদ্ধ। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়কুটীরে উপস্থিত। ধন্য দেব! ধন্য তোমার করুণা! তোমার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের আত্মা এখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "ডাকে এক-টীরবাসী অতিশয় যতনে, মুক্ত করি মলিন গৃহ অশ্রুবারি নিক্ষেপণে। তুমি আমার স্পর্শমণি, আঁধার ঘরের আলো, সুখশান্তি, সব তুমি শুভালোক এজীবনে"।

এই পবিত্র কালে আমরা এখন কোথায় রহিয়াছি। আমরা এখন ভূলোকেও নাই দ্যুলোকেও নাই। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায়, এখন আমরা সেই পরম লোকেই অবস্থিতি করিতেছি।

পাপালাপ—পাপচিন্তা—পাপ-অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়া—সংসার-আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, এই পরম লোকে এই পরব্রহ্মে অবস্থিতি করাই আমাদের মহোৎসব। তাঁহার সহবাস-সুখে সংতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার যশোগান দ্বারা জীবনকে কৃতার্থ করাই আমাদের উৎসব।

পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎযোগই এই উৎসবের ভিত্তিভূমি। যিনি অতি সাবধানে তাঁহার সহিত যোগরক্ষা করেন, তিনিই কেবল এই উৎসব-বিনির্গত অমৃতরস পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। তাঁহার সহিত যোগরক্ষা করাই ব্রাহ্মজীবনের ব্রত।

এই যোগ কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ চাই? কে শিশুকে তাহার মাতার নিকটে যাইয়া তাহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা দিয়াছে? কে তাহাকে বলিয়া দিয়াছে যে তাহার জননীর ক্রোড়ই তাহার নিরাপদ দুর্গ ও শান্তিনিকেতন।

যদিও আমরা তাঁহার সকল স্বরূপ জ্ঞাত নহি, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? ইহাত আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে তিনি আছেন—সর্ব্বত্র আছেন এবং আমাদের অন্তরে আছেন, তিনি আমাদের জনক জননী, আর আমরা তাঁর—আদরের ধন—স্নেহের ধন সন্তান। আমরা যাহা করিতেছি তিনি তাহা দেখিতেছেন, আমরা যাহা বলিতেছি তিনি তাহা শ্রবণ করিতেছেন। তিনি আমাদের সকল শক্তির মূলে। এই জ্ঞান যাহার হৃদয়ে শয়নে স্বপ্নে দিনে নিশীথে পলকে পলকে জাগে, তিনিই ব্রহ্মযোগে যোগী। যিনি একবার তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিয়াছেন, যিনি তাঁহার মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার অবক্তব্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছেন, তিনি পুনঃপুনঃ তাঁহাতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে চাহেন না এবং বিস্মৃত হইতেও পারেন না। যত তাঁহার যোগ বদ্ধমূল হয়, ততই তিনি দেখিতে পান, যে এক ঈশ্বরই আত্মোন্নতির মূল। যেমন লৌহ, চুম্বক-প্রস্তরে বারংবার ঘর্ষিত হইলে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মা পুনঃপুনঃ পরমাত্মায় সংঘর্ষিত হইলে দেব-ভাব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ। যিনি তাঁহার সহিত

সংযুক্ত হন, তাঁহারি আত্মা পাপ হইতে মুক্ত হয়—আনন্দ সুধারস পান করে—দুর্জ্জয় বল ধারণ করে—এবং মৃত্যু-ভয় ও মৃত্যু-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে।

এই যোগ জীবনে না থাকিলে জীবন প্রকৃতই মৃত্যু-সমান হইয়া উঠে। সেই ভারবহ জীবন যে কি ক্লেশাবহ তাহা তিনিই জানেন, যিনি তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসার-যন্ত্রণা ও মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। হে পরমেশ্বর! এ প্রকার দুর্গতি যেন কাহাকেও না ভোগ করিতে হয়।

আমাদের যে সকল ভ্রাতা এই দেব-দুর্ল্লভ উৎসবে বঞ্চিত, যাঁহারা অমৃতময় ঈশ্বরের সহিত যোগরক্ষা না করিয়া, মৃত্যুরূপ সংসারের সহিতই কেবল যোগরক্ষা করেন—আমি তাঁহাদের জন্য,হে পরমেশ্বর! তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যে তুমি তাঁহাদিগকে তোমার সেই তুলনারহিত সৌন্দর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করিয়া—তোমার মুক্তিপ্রদ উপাসনায় নিযুক্ত কর—কি প্রকারে তোমার সহিত যোগরক্ষা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহারা ব্রহ্মোৎসব-বিনির্গত অমৃতরস পান করিয়া চরিতার্থ হইবে, এবং আমাদেরও মনোরথ পূর্ণ হইবে।

অখিল জগতের জনক জননি! আমাদের এ ক্ষুদ্র রসনা তোমার করুণার কি পরিচয় দিবে। আমাদের মত ক্ষুদ্র পাপ-তাপে মলিন কীট যে তোমার প্রেরিত উৎসব-বিনির্গত সুধারস পান করিতেছে, ইহা স্মরণ মাত্রেই শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। মনে যে কি ভাব উদয় হইতেছে তাহা অবক্তব্য। এই যে আমরা সকলে একহৃদয় হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছি—এই যে তুমি স্নেহময়ী মাতা হইয়া আমাদিগকে তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া অমৃতরস পান করাইতেছ, ইহাতে তোমার বাৎসল্য ও কৃপা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।

স্নেহময়ী জননি! তোমার সর্ব্বত্র-প্রসারিত অনন্ত ক্রোড় কি সুধাময়! কি মধুময়! মাতঃ! চির দিন ঐ ক্রোড়ে স্থান দাও। সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা ও ভয় হইতে বিমুক্ত হই। মরণের সময় যখন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইব, তখন যেন মনে এই ভাব জাগে যে আমি আমার স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছি। পরলোকে আবার তাঁহারি ক্রোড়ে যাইয়া জাগ্রত হইব। জননি! তুমি সহায় জীবনে—তুমি সহায় মরণে—তুমি সহায় ইহলোকে—তুমি সহায় পরলোকে। তুমি আত্মার পরম আনন্দ!

সে কি মহোৎসবের দিন যখন আমরা তাঁহার প্রসাদে দেবলোকে যাইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রেমময়ের প্রেম গান করিব। অদ্যকার এই উৎসব সেই মহোৎসবের পূর্ব্বাভাসমাত্র। তথাপি এই উৎসবের গৌরব ও আনন্দ আমরা কি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি? কি পবিত্র আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এস ব্রাহ্মগণ! এমন পবিত্র সময়ে আমরা আপনাপন আত্মাকে এই স্বর্গের বারিতে নির্ম্মল করি এবং শান্ত ও সমাহিত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র চরণ পূজা করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

মনুষ্য শরীর মন আত্মার সমষ্টি। মনুষ্যের শরীর লইয়া কেবল গণনা করিতে গেলে, সে জড়ের মধ্যেই পরিগণিত হয়। তাহার শরীর ও মনই সর্ব্বস্ব বলিতে গেলে, তাহাকে পশু অপেক্ষা আর বড় উচ্চ শ্রেণীতে স্থান-দান করা যায় না। তাহার আ-

ত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলেই অতি সহজে জানা যায়, যে মনুষ্য অপেক্ষা আর উচ্চতর জীব ভূমণ্ডলে বর্তমান নাই। মনুষ্যই জীব-রাজ্যের রাজা, মনুষ্যই মর্ত্ত্য লোকের অলঙ্কার। মনুষ্য, জড় উদ্ভিদের সঙ্গে, পশু পক্ষীর সঙ্গে একত্রে বাস করিলেও, তাহার আশা অধিকার উচ্চতর; তাহার জ্ঞান প্রেম মহত্তর, তাহার ক্রিয়াকাণ্ড মধুরতর। জড় উদ্ভিদের ন্যায় সে অচল নহে, পশু পক্ষীর ন্যায় তাহার আত্মসুখই সর্ব্বস্ব নহে। জগতের কল্যাণ সাধন, স্বীয় স্রষ্টা পাতা বিধাতার লক্ষ্য সম্পাদন করাই তাহার জীবনের সারতম কার্য্য। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্যই তাহার সম্মুখে এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে; সেই পবিত্র কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তই তাহার শরীর মন আত্মাতে দেবদত্ত দুর্লভ উপকরণ সকল প্রদত্ত হইয়াছে। সুগভীর সাগর-গর্ত্তে যেমন লক্ষ লক্ষ প্রবাল-কীট একত্রিত হইয়া, প্রবল তরঙ্গ তুফান সহ্য করত আপনারদের শরীর ত্যাগ করিয়া ভাবী মনুষ্য-জাতির জন্য বিশাল দ্বীপপুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, মনুষ্য তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের জন্য জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া আপনারও পারলৌকিক সম্বল সংগ্রহ করত প্রস্থান করিবার জন্যই এই মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়াছে। মনুষ্য এখানে রাজ্য সাম্রাজ্যই বিস্তার করুক, খ্যাতি প্রতিপত্তিই লাভ করুক, তাহাকে কালেতে সকলই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সে স্বীয় উপার্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞানবলে যে সকল কার্য্যই সংসাধন করুক, তাহাকে সকলই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেহই তাহার সঙ্গী, কিছুই তাহার সম্বল হইবে না। অধিক কি, তাহার পার্থিব শরীরকে পৃথিবীতেই রাখিয়া যাইতে হইবে; তাহার স্নেহ মমতার সামগ্রী সমস্তই পরিত্যক্ত হইবে, কেবল এক আত্মাই লোকান্তরে আবার উচ্চতর কার্য্যসাধনের জন্য চলিয়া যাইবে। আত্মাকে দেখিলে, আত্মাকে লইয়া গণনা করিতে গেলেই, মনুষ্য যে কি, তাহার প্রকৃতি যে কি প্রকার উচ্চতর, তাহা বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই জন্যই সকল দেশে, সকল বিদ্যা মধ্যে আত্ম-জ্ঞান—আত্ম-তত্ত্বই গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই আত্ম তত্ত্ব-বিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই সকল জনপদমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সংসার-সমরে যে পরিমাণে জয় লাভ করিতে পারেন, যে মনুষ্য পরমার্থসাধনে যত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি সেই পরিমাণেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের সন্নিধানে শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ গম্য পথও ততই সরল ও সুগম করিতে সুপারগ হয়েন।

আপাততঃ দেখিতে গেলে, মনুষ্যের অবস্থা যেন কেবল সংগ্রামের অবস্থা বলিয়াই বোধ হয়। তাহার সম্মুখ পশ্চাতে কেবলই প্রতিবন্ধক, তাহার চতুর্দ্দিকে কেবলই বাধা বিঘ্ন। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, যে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করা, যে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করা তাহার জীবনের সারতম কার্য্য, তাহার প্রাণ ধারণের প্রধান-তম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই, তাহাকে ঘোর যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বাহিরের শত্রুর কথা দূরে থাকুক, তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মনের বৃত্তি প্রবৃত্তির প্রতিকূলেই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইতে হয়। এই যে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, ইহার চেতন অচেতন পদার্থ-পুঞ্জ যেন সমবেত যত্নে তাহার কার্য্য

কলাপকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। পার্থিব শোভা সৌন্দর্য্য সকল, যেন তাহাকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিবার জন্যই সমুৎসুক হইয়া থাকে। আত্মারই লক্ষ্য সাধনের জন্য এই সুকৌশল-সম্পন্ন শরীর, এই পরমাদ্ভুত-বৃত্তি-প্রবৃত্তি-সমন্বিত মন, প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা আত্মারই দাসত্বে, আত্মারই লক্ষ্য সাধনার্থে নিয়োজিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যকালে যেন তাহারা তাহার অনিষ্টসাধনেই অগ্রসর হইয়া থাকে। আত্মা, নেত্র-গবাক্ষ দিয়া বহির্জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রেম-ছবি দেখিবার জন্য অভিলাষ করে, নয়নযুগল পার্থিব সৌন্দর্য্যেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। আত্মা, শ্রবণ-ইন্দ্রিয় সহকারে ব্রহ্মসংগীত শুনিবার জন্য আগ্রহবান হয়, শ্রবণযুগল কেবল শব্দমাধুর্য্যে মোহিত হইয়া যায়। আত্মা, শরীর-বাহনে আরোহণ করিয়া, এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে, স্রষ্টা পাতার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থে প্রবৃত্ত হয়, শরীর কেবল আত্মসুখ সাধনের জন্য লালায়িত হইয়া আত্মাকে নিরাশ-পঙ্কে নিক্ষেপ করে। আত্মা, ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম লাভের জন্য পিপাসু হইয়া মানসিক বৃত্তি প্রবৃত্তি সকলকে তাহা আহরণ করিবার জন্য আদেশ করে, তাহারা সাংসারিক অনিত্য বস্তুর লোভে মোহিত হইয়া, আত্মার মহান্ লক্ষ্য সাধনে নিবৃত্ত হয়। বস্তুতই কি শরীর মন, আত্মার শত্রুতা সাধনের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে? বস্তুতই কি এই বাহ্য জগৎ, আত্মার শিক্ষা-সাধন-পথ নিরোধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? যে মঙ্গলময় পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর আত্মার স্রষ্টা-পাতা-বিধাতা, মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে উন্নতিশীল আত্মার সৃষ্টিতেই যাঁহার জ্ঞান প্রেম অমৃত ভাব বিশেষ রূপে সুব্যক্ত হইয়াছে, তিনি এই শরীর-সংসারকে কখনই আত্মার কারাগৃহ করিয়া দেন নাই। প্রত্যুত ইহারদিগকেই তিনি আত্মার লক্ষ্য সাধনের সোপান, আত্মার জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জনের মহত্তর উপায় অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম পাদ-চালনার সময় যেমন শিশু পুনঃ পুনঃ পতিত হয়, প্রথম শিক্ষার সময় যেমন বালক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, সেই রূপ সাধকের পক্ষে পরমার্থ সাধনের প্রথম অবস্থাতেই সকল বস্তুই বাধা বিঘ্নকর বলিয়া বোধ হয়। শিশু, যখন পাদ চালনা শিক্ষা করিয়া দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া যৌবন-সীমায় উপনীত হয়, তখন সে সহজেই হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিতে পারে; জ্ঞানপিপাসু ছাত্র যখন বহু কষ্ট ক্লেশের পর জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আর কোন বাধাকেই বাধা বলিয়া বোধ হয় না; তেমনি সাধক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যখন একবার ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হন্, তখন সমুদ্রসমান বাধা, তাঁহার নিকট শিশিরবিন্দুতুল্য; হিমালয়-সমান প্রতিবন্ধক তাঁহার সন্নিধানে বালু কণার ন্যায় সামান্য বোধ হয়। প্রথম অশ্ব-আরোহণ শিক্ষা করাই কষ্টকর, একবার সুনিপুণ আরোহী হইয়া উঠিলে, অশ্ব তাহার পদানত দাস হইয়া পড়ে। প্রথম ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়াই দুঃসাধ্য, একবার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই, তাহারা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় ইঙ্গিত মাত্রেই ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অরূপী অশরীরী ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা, ধ্যান-ধারণা-অভ্যাসের সময়েই নানা বিঘ্ন বিপত্তি, একবার তাহা অভ্যস্ত হইলেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম-লাভের উদ্যোগ উদ্যমই অমানুষিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু যখন ঈশ্বর একবার সাধকের আত্মাতে প্রকাশিত হন্, তখন তাঁহাকে "করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ" বোধ হয়।

এই জন্যই তপঃসিদ্ধ আপ্তকাম ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ব্রহ্ম-বিদাপ্নোতি পরম্।" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে, চরিত্রশোধনে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে সুনিপুণ হইয়া, ব্রহ্মলাভে কৃত-কার্য্য হওত উৎসাহের সহিত ভবিষ্যৎ বংশের জন্য এই নিশ্চয়াত্মক আশাপ্রদ উপদেশ বাক্য রাখিয়া গিয়াছেন; আমরা বর্ত্তমানে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে তাহাই অবলম্বন করত ব্রহ্মলাভের চেষ্টা করিতেছি। ভবিষ্যৎ বংশও এই আশা-সূত্র অবলম্বন করিয়া আত্মোন্নতি সাধনে যত্ন-যুক্ত হইবে। ব্রহ্মলাভ যেমন আত্মার লক্ষ্য, মানব আত্মাতে প্রকাশিত হওয়াও তেমনি আবার ব্রহ্মের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা সংসাধনের জন্যই এই শরীর, এই মন, এই আত্মার সৃষ্টি। সেই লক্ষ্য সম্পাদনের নিমিত্তই এই পরমাদ্ভুত-কৌশল-পূর্ণ বিচিত্র বিশ্বের রচনা। যে পরিমাণে আমরা সাধন-নিপুণ তপঃসিদ্ধ হইতে থাকিব, সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হইব; সেই পরিমাণেই আমারদের শরীর মন আত্মা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর হইবে, সেই পরিমাণেই এই বিশ্বসংসার ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের সুবিমল ছবি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়া আমারদের আত্মাকে ব্রহ্মলাভে প্রোৎসাহিত করিতে থাকিবে। ইহাই সাধকের জপতপঃ, যাগ যজ্ঞ——ইহাই ব্রহ্মোপাসকের ব্রত ধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল।

এখনই দেখ!—এখনই সকলে এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। আমরা শান্ত সংযমী হইয়া এই উৎসবক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শনের জন্য সমাসীন হইয়াছি, উপরে এক সূর্য্য সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া এক ঈশ্বরের শক্তি সত্তা প্রদর্শন করিতেছে। এই এক পৃথিবী বিবিধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া আমারদের সম্মুখে সেই একেরই কীর্ত্তিকলাপ প্রদর্শন করিতেছে। আজিকার প্রাতঃসমীরণ—আনন্দ হিল্লোল কেমনি নিঃশব্দে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া আত্মার মধ্যে সেই এক অদ্বিতীয় অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে। আমরা চর্ম্ম-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জগন্মন্দিরে যেমন জগদীশ্বরকে সহজে নিরীক্ষণ করিতেছি, তেমনি জ্ঞান-নেত্র উন্মুক্ত করিয়া আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করত কৃতার্থ হইতেছি। এই যে ব্রহ্ম-দর্শন-জনিত আনন্দ উৎসব, ইহা কি সাধকের একদিনের যত্ন চেষ্টা, উদ্যোগ উদ্যমের ফল? যিনি এই উৎসব-ভূমিতে অদ্য প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হয় তো ব্রহ্মোপাসকদিগের আধ্যাত্মিক বাক্যালাপ তত তৃপ্তি-কর উৎসাহকর বলিয়া বোধ হইবে না। অরূপী অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে যে কেমন করিয়া অন্তরে বাহিরে জাগ্রৎ জীবন্তরূপে উপলব্ধি করা যায়, কেমন করিয়া যে সেই বিশ্বস্রষ্টা অখিলবিধাতা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ পিতা মাতা, সুহৃৎ বন্ধু সখা বলিয়া প্রতীতি করত ব্রহ্মোপাসকগণ তাঁহার পূজার্চ্চনা, ধ্যান ধারণা করিতেছেন, হয় তো তিনি তাহা কখনই বিশদরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। যাঁহারা সাধনপরায়ণ, তাঁহারাই প্রকৃতরূপে এই পুণ্য দিনের এই মঙ্গল মুহূর্ত্তের যথার্থ মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারাই মাঘের একাদশ দিবসকে ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্যের অভ্যুদয়-দিন জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আর্য্যকুল-দেবতা ব্রহ্মেরই জয়ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহারা দূরদর্শী, তাঁহারা

এই পবিত্র দিবসকেই সমগ্র পৃথিবী মধ্যে শান্তি-যুগ প্রবেশের দিন বলিয়া অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্যে ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব হে ভারত-বাসি! হে সমগ্র ভূমণ্ডল-নিবাসী নর নারীগণ! সকলে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আনন্দ মনে, একাগ্র হৃদয়ে এই উৎ-সব-ভূমিতে অবতরণ কর। সকলে বিমল-হৃদয়ে সেই বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বরকে হৃদ-য়ের শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া জীবনকে সার্থক কর, বসুমতীকে পুণ্যবতী কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার। তরঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্গই সার।

অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আনিবে তত ক্ষুদ্র তৃণটীর মত দেখিবে সংসার।

কত ঝড় বহে যাবে হৃদয় অটল রবে, কি ভয় কি ভয় তবে।

অতিক্রমি দুখ শোকে অনন্ত অনন্ত লোকে, নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার।

একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০০ শক।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

জনসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ইহা কেবল বিবাদ কলহে, নিন্দা অসূয়ায়, বিদ্বেষ অশান্তিতে পরিপূর্ণ!! সংসারের মধ্যে যেন মঙ্গল অ-পেক্ষা, অমঙ্গলের ভাগই অধিক, সুখ অপেক্ষা এখানে অসুখেরই একাধিপত্য; সদ্ভাব ভ্রাতৃভাবের পরিবর্ত্তে এখানে যেন বিদ্বেষ ও শত্রুতাই অধিকতর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে ধনী, নির্ধনের নির্যা-তনে দৃঢ়ব্রত; জ্ঞানী অজ্ঞানের প্রতি পশু-বৎ আচরণে নিরত; ভ্রাতা ভ্রাতার সর্ব্বস্ব শোষণে নিযুক্ত, প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। লোক-সমাজের মধ্যে বিষয়ের সম্মান সমাদর ধর্ম্মেরই অধিকতর অসম্মান ও অনাদর দৃষ্ট হয়। অন্যের মজ্জা শোণিত শোষণ করিয়া যিনি স্বীয় শরীরকে পোষণ করেন, সহস্র ব্যক্তিকে যিনি নিঃসম্বল করিয়া আপনার সুখ ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করেন, মনুষ্য-সমাজে তিনি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, আর যিনি আপনার যথা-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে, লোকের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সম্পাদনে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাকেই নিন্দিত ঘৃণিত, প্রতারিত অপমা-নিত হইতে দেখা যায়। এখানে লোকে কেবল মান সম্ভ্রমের জন্য, খ্যাতি প্রতিপত্তির নিমিত্তই, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিত্য সংগ্রামে নিযুক্ত হওত কেবল সত্যের অস-ম্মান, ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে। সংসার কি ভয়ানক স্থান। মনুষ্যসমাজের এরূপ পশুবৎ ব্যবহার দৃষ্টি করিলে, কোন্ চিন্তা-শীল ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়? কোন্ সাধু সদাশয় মনুষ্যের না সংসারের প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়া থাকে? কিন্তু আমরা যে বসুধা-বক্ষে অবস্থান করিতেছি, যে সকল বৃক্ষ লতায় পরিবৃত রহিয়াছি, যে সকল পশু পক্ষী অবলোকন করিতেছি, তাহারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। ভৌতিক জগতের একটি সূক্ষ্মতম বালুকণাকে দেখ,

তাহার মধ্যেও মঙ্গল লক্ষ্য সঞ্চরণ করিতেছে, একটি সামান্য বৃক্ষপত্রের রচনা-কৌশল পরীক্ষা কর, তাহার অভ্যন্তরেও মঙ্গল উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছে, পশু পক্ষীর গুণ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, তাহার মধ্যেও কল্যাণ-কামনা দীপ্তি পাইতেছে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে। কে না জানে যে চন্দ্র ও সূর্য্য জড় উদ্ভিদ, জীব ও জন্তু জগতের জীবন। কে না জানে, যে জল ও বায়ু, স্থাবর জঙ্গমপূর্ণ পৃথিবীর প্রাণ? কে না জানে, বৃক্ষ লতা—ওষধি বনস্পতি সমূহ, জীব রাজ্যের প্রত্যক্ষ ঔষধ ও উপজীবিকা? এই সমুদায় সৃষ্টিতে কি বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের শুভ কামনা দীপ্তি পাইতেছে না? ইহারা কি সমবেত যত্নে অহোরাত্র আমাদের কল্যাণ সম্পাদন করিতেছে না? চন্দ্র সূর্য্য, ওষধি বনস্পতির কথা দূরে থাকুক তাহারা মনুষ্যের অনেক নিম্ন শ্রেণীতে অবস্থান করিতেছে। তাহারা দুশ্ছেদ্য ভৌতিক নিয়মের দাস, তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, স্বেচ্ছাশক্তি প্রভৃতির অসদ্ভাব। যাহাতে জ্ঞান শক্তি স্বাধীনতা বর্ত্তমান, সেই মনুষ্যের শরীর মন আত্মাকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহার শরীরের অস্থি চর্ম্ম শিরা শোণিতে, তাহার মনের বৃত্তি-প্রবৃত্তিতে, তাহার আত্মার ভাব ও অধিকারে সেই মঙ্গল লক্ষ্য, সেই কল্যাণ কামনা, সেই শুভ উদ্দেশ্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে কি না? শরীর সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম হয়, এই উদ্দেশেই তাহা বিচিত্র উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে; মন, জ্ঞান বিজ্ঞান উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, আপনার ও অন্যের সুখ সাধনে কৃতকার্য্যতা লাভ করে, এই কামনাতেই তাহাতে দুর্লভ বৃত্তি প্রবৃত্তি সকল প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্নপ্রকৃতি, বিভিন্নস্বভাব-বিশিষ্ট মনুষ্যসমাজ মধ্যে, বিচিত্র ঘটনার অভ্যন্তরে যাহাতে আত্মা বিভ্রান্ত ও দিশাহারা হইয়া না যায়, যাহাতে পশুগণমধ্যে পরিগণিত হইয়া না পড়ে, সেই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর আত্মাকে অসদৃশ উন্নত ভাব ও উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে আত্মা, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল, অশান্তির মধ্যে শান্তি, অনৈক্যের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করিয়া শান্তি-মঙ্গল-সদ্ভাবে জগতের উন্নতি-সাধন করিয়া, আপনাকেও উন্নত করিতে পারে, এই শুভ উদ্দেশে করুণাময় পরমেশ্বর তাহার অভ্যন্তরে তাহার শিক্ষা-সাধান, ক্রিয়া-কর্ম্মের অভ্রান্ত আদর্শ রূপে আপনিই নিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। সেই হৃদিস্থিত অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে আদর্শ করিয়া—তাঁহার আদেশ উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে সংসার সুখের আধার, শান্তির আলয়, আনন্দের নিকেতন হইয়া উঠে, মনুষ্যও ক্রমে দেবভাবে উন্নত হইয়া পৃথিবীর মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে। সেই আদর্শকে ছাড়াইয়া মনুষ্য-সমাজের এই বিষম দুঃখ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। পিতাই সকল সম্বন্ধের মূল, পিতা হইতেই আমরা সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ গণনা করি। সেই পিতাকে পরিত্যাগ করিলে আর কাহারও সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ সংযোগ থাকে না। যত দিন পিতা বর্ত্তমান থাকেন, ভ্রাতা-ভগিনীগণের মধ্যে সহস্রবিধ অনৈক্যের কারণ থাকিলেও তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। বরং পিতার আদেশ উপদেশে তাহা সমূলে নির্ম্মূলিত হইয়া থাকে। পরিবারের মধ্যে শান্তি-সদ্ভাবই সঞ্চরণ করে। কিন্তু পিতৃহীন পরিবারের কি ভয়ানক দুঃখ-দুর্গতি! ভ্রাতা, ভ্রাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে; সহোদরা, সহোদরার সর্ব্বস্বান্ত করিতে কৃত-সংকল্প

হয়। সেই শান্তির আলয় পিতৃ-নিকেতন একবালে বিবাদ-বিসম্বাদ, অমঙ্গল অশান্তির আধার হইয়া উঠে।

সেই ব্যক্তিগত মঙ্গল ভাব, মঙ্গল লক্ষ্য; সেই ব্যষ্টিগত জ্ঞান প্রেম, শান্তি মঙ্গলের পূর্ণ আদর্শকে সমষ্টির মধ্যে লইয়া চল; ক্ষুদ্রায়তন গৃহ পরিবার হইতে, সুবিশাল সংসার মধ্যে তাঁহাকে আনয়ন কর, সকল অন্ধকার চলিয়া যাইবে, সকল বিবাদ তিরোহিত হইবে, সকল দুঃখ দুর্গতি পলায়ন করিবে। মনুষ্য, তাঁহাকে নেতা না করিয়া —তাঁহার উদার উন্নত মঙ্গল আদর্শের অনুবর্ত্তী না হইয়াই সংসারের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার আদেশ উপদেশের বশবর্ত্তী না হইয়াই স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। লোকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসনে ভ্রম-প্রমাদপরিপূর্ণ স্বার্থঅন্ধ মনুষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া—সেই দূষিত আদর্শে পরিচালিত হইয়াই ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য, প্রণয়ের মধ্যে অপ্রণয়, শান্তির মধ্যে অশান্তি, মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গল, অমৃতের মধ্যে বিষ-রাশি, ধর্ম্মের মধ্যে অধর্ম্ম আনয়ন করত ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্যকে ছারখার করিতেছে!!

এই দুঃখ দুর্গতি পরিহারের কি কোন উপায় নাই? এই শোচনীয় অনৈক্যের মধ্যে কি প্রণয় ঐক্য স্থাপনের কোন পন্থা নাই? চিরকালই কি আনন্দময়ের রাজ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, দুঃখ-নিরানন্দ বর্ত্তমান থাকিবে? চির কালই কি মনুষ্য এখানে মনুষ্যের কুহকে পতিত হইয়া প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত হইবে? চির দিনই কি মনুষ্য, অসম্পূর্ণ জীবের বিদ্যা বুদ্ধির, গতি-প্রবৃত্তির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-ধর্ম্ম-স্রোতে ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে? পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধি সহকারে কি ঈশ্বরের সুবিস্তৃত পরিবার, মনুষ্য-জাতি শতধা বহুধা হইয়া—ছিন্ন ভিন্ন উৎসন্ন হওত নানা দলে বিভক্ত হইয়া কেবল হীনবল হইয়াই পড়িবে? তাহারদের কি দাঁড়াইবার ঐক্যস্থল নাই? তাহারদের প্রতি কি কাহারও স্নেহ-দৃষ্টি, প্রীতি-দৃষ্টি নাই? তাহারদের উপরে কি দেব-প্রসাদ বর্ষিত হইতেছে না? তাহারদের অন্তরে কি আত্ম-প্রভাব দীপ্তি পাইতেছে না? সংসারের প্রতি ঈশ্বরের স্নেহ-দৃষ্টি, প্রীতি-দৃষ্টি না থাকিলে ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে, এখানকার প্রতি বৃক্ষপত্রে, শৈবাল-সূত্রে কেন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা মুদ্রিত থাকিবে? এখানকার প্রত্যেক ঘটনাতে কেন তাঁহার শুভ সঙ্কল্প প্রকাশ পাইবে? মনুষ্যের হৃদয়-কন্দরে কেন স্নেহ প্রীতি দয়া ধর্ম্মের সুবিমল উৎস উৎসারিত হইবে? মানব আত্মাতে তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল রূপ কেন মুদ্রিত থাকিবে? ভারতের অন্ধতম সময়ে কেন এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে? মনুষ্য সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—সহস্রবিধ সুখ সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া কেন আত্মপ্রভাবে সত্যের দিকে, মঙ্গলের দিকে, ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হইবে?

সেই বিশ্বজনসম্ভজনীয় পরমেশ্বরই সমগ্র দেব মনুষ্যের একমাত্র গম্য স্থল। পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই সমুদায় মনুষ্য-জাতির একমাত্র ঐক্য-ভূমি। সেই অমৃত নিকেতনের প্রতি অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইলে, এই ঐক্য-ভূমি-স্বরূপ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ায় উপনীত হইলেই পৃথিবী হইতে বিবাদ কলহ, দ্বন্দ্ব বিচ্ছেদ, সকলই তিরোহিত হইয়া যাইবে।

নদ নদী সকল যখন দেশ প্রদেশ মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন তাহারা সঙ্কীর্ণ ভাবে নানাদিকে ধাবিত হইতে থাকে, কিন্তু যত সিন্ধু সাগরের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই যেমন

তাহারা উদার-ভাবে একমুখ হইয়া পড়ে, তেমনি মনুষ্য-জাতি যখন কর্ম্মভূমিতে বা বিষয়ক্ষেত্রে গমন করে, তখন তাহারদের বিচিত্র রুচি প্রবৃত্তি নিবন্ধন গম্যপথ শতমুখ বহুমুখ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে যাইবার সময় সকলেরই গতি সেই "একায়নং" সেই একেরই দিকে। তাঁহার দিকে যাইয়াও যদি ঐক্য লাভ না হয়, তাঁহার ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় উপনীত হইয়াও যদি শান্তি মঙ্গল লাভ না হয়; তাঁহার সেবক উপাসক হইয়াও যদি বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব কলহ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারা যায়, তবে নিশ্চয় জানিও যে, এখনও সেই সরল বর্ত্ম প্রাপ্ত হই নাই; এখনও সেই অমৃত পথের যাত্রী হইতে পারি নাই; এখনও সেই "বিগতবিবাদ" মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্যপরায়ণ ভক্ত হইতে সমর্থ হই নাই, এখনও ভ্রান্তিচক্রে ঘূর্ণিত হইতেছি, এখনও ঈশ্বর হইতে বহু দূরে নিপতিত রহিয়াছি। ঈশ্বর-উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল আরাম; ব্রহ্মসাধনের নিশ্চিত পুরস্কার শান্তি; ব্রহ্মলাভের অব্যর্থ ফল মুক্তি। যখন এখনও আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাহা লাভ করিতে পারি নাই, তখন সেই লক্ষ্য স্থলে যে এখনও উপনীত হইতে পারি নাই, তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। কিন্তু যখন রোগ নির্ণীত হইয়াছে, তখন আরোগ্য লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা হইতেছে। যখন জানিতেছি যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া—তাঁহার উদার উন্নত নিষ্কলঙ্ক স্বরূপের অনুকরণ না করিয়াই, জনসমাজের এই দুঃখ দুর্গতি, অমঙ্গল অধোগতি প্রাপ্তি হইতেছে, তখন কি আর বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে? তাঁহার আদেশ উপদেশের অনুবর্ত্তী না হইয়াই, যখন এখানে এত দ্বন্দ্ব কলহ উপস্থিত হইয়াছে, তখন কি আর মানব-জাতি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মনুষ্যের কুটিল বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিবে? তাঁহার অনুগত শরণাগত না হইয়া কি মনুষ্য আর নিশ্চিন্ত থাকিবে?

এখনই দেখ! সকলে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন কর, এই অতি অল্প কালের জন্য আমাদের আত্মা সেই ব্রহ্মের অভিমুখীন হইয়াছে; আমারদের বৃত্তি প্রবৃত্তি সকল, সেই পরব্রহ্মের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; আমারদের সকলেরই লক্ষ্য সেই একেরই প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখন আমারদের মধ্যে কেমন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে! কেমন দুশ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব অভ্যুদিত হইয়াছে। চারি দিকে কেমন আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সকলেরই হৃদয় মন প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে! এই উৎসব-বর্ত্তিকা নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মর্ত্ত্য লোক হইতে এই দেবভাব তিরোহিত না হয়। বহু কষ্ট ক্লেশের পর আমরা যে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যসম্পদ লাভ করিয়াছি—আমরা যে ঐক্য আরাম-স্থলে উপনীত হইয়াছি, এই সুখযামিনী অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহা অপহৃত না হয়! ভৌতিক জগতের ন্যায় আমারদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের পক্ষেও অদ্য শুক্ল প্রতিপদ মাত্র। আমরা দেবলোক হইতে দেবলোকে, ব্রহ্ম-পূজা-জনিত যে সকল মহান্ উৎসব লাভ করিতে থাকিব, মর্ত্ত্যের এই মহোৎসব তাহার ছায়া মাত্র। আমারদের আত্মা লোকলোকান্তরে ঈশ্বরের যে অযুত অগণ্য শান্তি-মঙ্গল-জ্যোতিতে অনুরঞ্জিত হইয়া দীপ্তি পাইবে, এখানকার সদ্ভাব ধর্ম্মভাব সকল তাহার একটি ক্ষীণ রশ্মি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বর্ত্তমানের শান্তি মঙ্গলের আভাস মাত্র পাইয়া যেন পরিতৃপ্ত না হই—যেন আমরা আপনারদিগকে কৃতকার্য্য মনে না করি। আত্মার

আশা অধিকার অনন্ত; আত্মার শিক্ষা-শোধন-ক্ষেত্র অসীম; আত্মার লক্ষ্য-ভূমি বহু দূরে। এক ব্রহ্মের উপাসনাতেই সে সকল আশা পূর্ণ হইবে; সকল অধিকার হস্তগত হইবে; সকল শিক্ষা লব্ধ হইবে, ইহারই জন্য এখানে এই উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অতএব আইস সকলে সেই উৎসব-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই। আইস সকলে অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্যে তাঁহার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি "বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।" হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর—আমারদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর। "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ তাহাই আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

বহুক ঝটিকা ঝড়, কাঁপায়ে ভূধরবর,
ভবের তরঙ্গ ভঙ্গে বিচলে কি এ হৃদয়,
ধরিয়ে চরণ যাঁর, বিচরি এ পারাবার,
সর্ব্বশক্তিমান তিনি তাহাতে মঙ্গলময়,
ঘিরুক্‌না ঘোর ঘন দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
নিরখিব ধ্রুব তারা সে মুখ চাহিয়ে,
আশ্রয় অভয়দাতা ভ্রূক্ষেপি সহস্র বাধা
লুকাব অমৃত ক্রোড়ে কিসে আর করি ভয়।

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

রাজরাজেশ্বর ওহে দীন জনে দেখা দাও
করুণা ভিখারী আমি করুণা-কটাক্ষে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ
সংসার-অনল-কুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃত প্রায়, হয়ে আছি দয়াময়
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়ে লও।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

১০ মাঘ বুধবার ১৮০০ শক।

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড, ৩য় অ, ১ম শ্লোক।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
ঐ ঐ ঐ ২য় শ্লোক।

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক।

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

পুণ্যাত্মা কাহাকে বলে এবং পুণ্যাত্মা ও পাপিষ্ঠের মধ্যে প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সামান্যতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, যিনি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করেন, সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাঁহার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, যিনি কখনও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কার্য্য করেন না, কর্ত্তব্যসাধনের কোন প্রকার ত্রুটি হইলে যাঁহার মন বিষম আত্মগ্লানিতে পরিপূরিত হয় তাঁহাকেই পুণ্যাত্মা বলে। এবং যে তাহার বিপরীত, যাহার দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ প্রকৃত রূপে অনুষ্ঠিত হয় না, কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে যাহার দৃষ্টি নিতান্ত ক্ষীণ সেই ব্যক্তিই পাপিষ্ঠ। যাহাতে আমরা পুণ্যাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, সাধুর লক্ষণ সমস্ত আমাতে অবস্থিতি করে, এবং যাহাতে আমি প্রকৃতরূপে পুণ্য-পথের পথিক হই, তাহার ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেরই না থাকুক, কিন্তু অনেকের মনে যে সেই ইচ্ছা বিশেষ প্রবল সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল মাত্র ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে? চেষ্টার অভাবে এই অভিলষিত সামগ্রী লাভে অনেকেই বঞ্চিত; এবং চেষ্টা থাকিলেও আমাদিগের কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য, তাহার জ্ঞান না থাকায় আমরা কর্ত্তব্য সাধনে অক্ষম হই। এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করা

আমাদিগের সকলেরই উচিত। সাধারণতঃ সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের যে সমস্ত কর্ত্তব্য তাহাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা বিশেষরূপে অবগত না থাকায় আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। অনেকে হয়ত কেবল মাত্র ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদকেই ঈশ্বরপরায়ণতার শেষ মনে করেন। পরমেশ্বরে পূর্ণ প্রীতি ও ভক্তি শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে যে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কর্ত্তব্য সাধন হয় না একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি না করেন তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কি রূপে সম্ভবে? ঈশ্বরকে প্রীতি না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সমূহের সম্পাদন কর্ত্তব্য শব্দের ব্যভিচার মাত্র। প্রীতি কর্ত্তব্যের আধার, ঈশ্বর-প্রীতিই আমাদিগের কর্ত্তব্য সমূহের ভিত্তিস্বরূপ। ভিত্তিহীন প্রাসাদের কল্পনা যে রূপ উপহাসের যোগ্য প্রীতিবিহীন কর্ত্তব্যসাধনের মননও সেই প্রকার অকর্ম্মণ্য। কিন্তু যেমন কেবলমাত্র ভিত্তিকে আমরা প্রাসাদ মনে করিতে পারি-না, সেইরূপ কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদ দ্বারা আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সমূহ সম্পন্ন হয় না; বরং বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে কেবল মাত্র এই সকলের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই সম্পাদিত হয় না। আপাততঃ শুনিতে এই কথা নিতান্ত ভয়ানক বোধ হয়। ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হয় না একথা সহজে প্রায় কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না; কিন্তু তাহা অন্য আকারে উপস্থিত করা গেলে বোধ হয় তাহার যাথার্থ্য ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে প্রায় কেহই কোন সন্দেহ করিতে পারিবেন না। সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বরের উপাসনাই ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য। যিনি ভ্রমপ্রমাদ বিরহিত হইয়া সরল চিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতে পারেন যে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহা কর্ত্তৃক যে ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য—কেবল ঈশ্বরের প্রতি কেন, তাঁহার দ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহা মুক্ত কণ্ঠে এক বাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর মধ্যে যত মনুষ্য আছে সকলকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কয় জন এপ্রকার ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু আছেন যিনি বলিতে পারেন যে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে দেখিতে পাই যে "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"; কিন্তু প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য-সাধন পরস্পর এ প্রকার দৃঢ় গ্রন্থি দ্বারা মিলিত যে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব কখনই সম্ভবে না। যেখানে প্রকৃত প্রীতি সেই খানেই প্রিয় কার্য্য সাধন। অকৃত্রিম প্রীতির পরীক্ষাই প্রিয় কার্য্য সাধন। যিনি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন না তিনি নিশ্চয় জানিবেন যে তিনি ঈশ্বরকে প্রীতিও করেন না; কেননা প্রীতির প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা প্রিয়তমের প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে মনুষ্যকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না; প্রিয় কার্য্য সাধনই প্রীতির জীবন। অতএব যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন তিনি কেবল মাত্র ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদ দ্বারা আপনাকে আপ্তকাম মনে করেন না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করেন। এ কথায় কেহ ইহা

বুঝিবেন না যে ধ্যান ধারণা ও স্তুতিবাদ নিরর্থক অমূলক অপ্রাসঙ্গিক শব্দমাত্র; তাহা নহে, সে সমস্তেরও কার্য্য আছে তৎসমুদায় প্রীতির চিহ্নমাত্র কিন্তু তাহা পূর্ণ প্রীতি নহে; এই নিমিত্তই তৎসমুদায়কে প্রীতি হইতে এবং কাজেই ঈশ্বরোপাসনা হইতে পৃথক করা গেল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গেলে—প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের উপাসক হইতে ইচ্ছা করিলে—তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা আবশ্যক, এবং তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না; এবং প্রিয়কার্য্য সাধনই প্রীতির পরীক্ষা এ নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন না করিলে তাঁহাকে প্রীতি করাও হয় না। এই সমস্ত কারণে প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় কার্য্য কি তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কি তৎসমুদায় বিশেষ বিশেষ রূপে নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত কঠিন, এবং তৎসমুদায়ের নির্ব্বাচনও অনেক পরিশ্রম ও সময়-সাপেক্ষ; এখানে তাহাদিগের কেবলমাত্র একটী সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং এক্ষণকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। সেই সাধারণ লক্ষণ এই, করুণাময় পরমেশ্বর আমাকে যে উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যের সংসাধনই আমার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যেমন কোন প্রভু যদি আপন ভৃত্যের হস্তে কতকগুলি দ্রব্য সমর্পণ করেন, তাহাতে সেই সমস্ত সামগ্রী যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা না করিলে ভৃত্যকে যেমন প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য-বিমুখ বলা যায়, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের হস্তে যাহা কিছু সমর্পণ করিয়াছেন তৎসমুদায় যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা না করিলে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের ব্যাঘাত হয়। এই ভূমণ্ডলে যাহা কিছু দেখিতেছি সমুদয়ই ঈশ্বরের, আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি সমুদয়ই ঈশ্বর-প্রদত্ত এনিমিত্ত তৎ সমুদায়ের সদ্ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য; এবং তন্মধ্যে কোন একটীর অসদ্ব্যবহার করিলে আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই, এমন কি আমাদিগের যে সময় আছে তাহারও সদ্ব্যবহারের ভার করুণাময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; যদি আমাদিগের সময় বৃথা অতিবাহিত হয় তাহা হইলেও আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই। সকলেই জানেন যে এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি চিরজীবন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া কেবল মাত্র এক দিবস কোন প্রকার পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে না পারায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "হায়! কি দুর্দ্দৈব, আমার এক দিবস বৃথা নষ্ট হইল।" সেই রূপ আমাদিগের পুত্র কন্যার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; এবং তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে গৃহস্থ স্বীয় পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক এবং কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক। সেই বিদ্যাভ্যাস এবং শিক্ষা কি তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, যে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে সেই বিদ্যাভ্যাস বা শিক্ষাকার্য্য কোন প্রকারেই সম্পন্ন হয় না। যে আর্য্য সন্তানেরা ধর্ম্ম-বিষয়ে দীক্ষিত না হইয়া পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিতে পারিতেন না, ব্রহ্মচর্য্যই যে বিদ্যাভ্যাসের প্রারম্ভ, যে মহর্ষিরা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতিকে অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া গণনা করিয়া

ছেন, এবং যাঁহাদিগের মতে যদ্দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় কেবল তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত, যে আর্য্য স্ত্রীরা বলিয়াছেন যে যাহার দ্বারা আমরা অমর না হই তাহা লইয়া কি করিব? সেই মহর্ষিরা যখন পুত্র কন্যাকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার ও শিক্ষা দিবার উপদেশ দিতেছেন তখন যে তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও যদ্দ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ে জ্ঞান জন্মে ও সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তদ্বিষয়েই যে শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। যে কালে এই সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল সে সময়ে বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষাপ্রদান শব্দের অর্থেই ঈশ্বর-জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা বুঝাইত। এবং জ্ঞানাপন্ন আচার্য্যের কর্ত্তব্যই এই ছিল যে "উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক শান্ত শমান্বিতচিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন"। তৎকালে এই প্রকার ঋষিবাক্য অনুসারেই বিদ্যাভ্যাস হইত এবং বিদ্যাভ্যাস ধর্ম্মোপদেশের প্রতিবাক্য স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষার্থী মাত্রেই অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার আলোচনা করিতেন, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন, এবং জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মোন্নতি হইতে থাকিত; অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা সমুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার চর্চ্চা হইত। কিন্তু আমাদিগের আধুনিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় দেখা যায়। যাহাতে পুত্র কন্যার, অন্ততঃ পুত্রদিগের জ্ঞানোন্নতি হয়, যাহাতে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ মার্জ্জিত ও সম্যক রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য অনেককেই বিশেষ যত্নবান্ দেখা যায়। কিন্তু কিসে তাহাদিগেরে ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইবে—কি উপায়ে তাহারা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করত প্রকৃত রূপে মনুষ্য-নামের যোগ্য হইবে, সে বিষয়ে প্রায় সকলেরই বিশেষ ঔদাস্য দৃষ্ট হয়। সন্তান সন্ততিদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান পিতামাতার যে প্রকার কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান যে তদপেক্ষা সহস্র গুণে প্রয়োজনীয়, এবং তজ্জন্য যে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী তাহা কখন ভ্রমেও মনে করেন না। এবং এই প্রকার নিরীশ্বর শিক্ষার প্রভাবে আত্মার যে কতদূর অবনতি হয়, এবং জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোন্নতির অভাবে দেশের যে কি বিষম অনিষ্ট হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন আমরা যে কি প্রকার গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতেছি, কি ঘোরতর পাপে নিপতিত হইতেছি, তাহা ক্ষণমাত্রও কেহ চিন্তা করেন না। পুত্র কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ভার পিতামাতার প্রতি এবং ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের ভার তাহাদিগের নিজের প্রতি, এই ভ্রমাত্মক সংস্কার যাঁহাদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ আছে, এবং যাঁহারা সেই ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন এবং পুত্রের মানসিক উন্নতি সম্পাদন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে আপ্তকাম মনে করেন, এবং পুত্র কন্যাদিগের প্রতি এবং তজ্জনিত ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইল বিবেচনা করেন; তাঁহাদিগেরও জানা আবশ্যক যে ধর্ম্মশিক্ষা পুত্রের নিজের কর্ত্তব্য হইলেও যে পিতামাতা বাল্য কালে পুত্র কন্যাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান না করেন এবং যাহাতে ঈশ্বর-বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং তাঁহার প্রতি পূর্ণ প্রীতি সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্ না হয়েন, তাঁহারা প্রকৃত রূপে পুত্রের ভাবি ধর্ম্মজ্ঞানের পথে কণ্টক রোপণ করেন; তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ জঘন্য পাপে লিপ্ত না হইলেও তাঁহাদিগের

কার্য্যের দ্বারা এই বিসময় ফল উৎপন্ন হয়। কেননা যেমন সামান্য বিষয়ে আমরা জানি যে নূতন পাত্রে সংলগ্ন কলঙ্কের ন্যায় বাল্যকালের সংস্কার সহজে দূর হয় না; সদ্যোত্থিত যথেচ্ছ-গমনোন্মুখী লতিকাকে প্রথমতঃ যে দিকে নত করা যায় তাহা সেই দিকেই নত হয়, এবং তৎপরে তাহাকে দিগন্তরগামী করিবার চেষ্টা সহজে সুসিদ্ধ হয় না; সেইরূপ বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতেই ঈশ্বরের দিকে না লওয়াইলে প্রথম হইতেই তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে সবল না করিলে শেষাবস্থায় তাহাদিগের ধর্ম্মে মতি সহজে হয় না। এনিমিত্ত হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি প্রবল করা যদি সন্তান সন্ততিদিগের নিজের কার্য্য হয়, তাহা হইলেও প্রথমাবস্থাতে তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্ম ও প্রীতির বীজ বপন না হওয়ায় পরে তাহা তাহাদিগের পক্ষে যে প্রকার দুরূহ হয়, বয়োধিক্য নিবন্ধন হৃদয় শুষ্ক হওয়াতে নূতন বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারা প্রযুক্ত তাহাদিগের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহার জন্য কে দায়ী? যে ব্যক্তির সমস্ত ভার কিছু কালের নিমিত্ত আমার হস্তে ন্যস্ত ছিল, আমার ঔদাস্য প্রযুক্ত অবশেষে সে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইল, আমার দোষে সে প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইল; এই ঘোরতর অপরাধের জন্য কে অপরাধী? যে পুত্র কন্যার সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধনের ভার আমাতে অর্পিত হইয়াছিল আমার যত্নের অভাবে বা বুদ্ধির দোষে তাহারা পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইল—শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সামঞ্জস্যের অভাবে অন্যান্য বৃত্তি প্রবল হইল এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় অসাড় ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িল—ইহা অপেক্ষা আমার কর্ত্তব্য সাধনের ত্রুটি আর কিসে প্রতিপন্ন হয় সন্তান সন্ততিদিগকে ধর্ম্মজ্ঞানে বঞ্চিত রাখিয়া কে বলিতে পারেন্ যে ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্ত্তব্য সমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে? এই নিমিত্ত আমাদিগের সকলেরই এই একটী প্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ভারতে কৃতবিদ্য যুবকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; বিদ্যা-চর্চ্চা সহকারে জ্ঞানালোচনা এবং মানসিক উন্নতি সাধনের বিশেষ সাহায্য হইতেছে; কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে, এবং আত্মা ক্রমে জ্যোতিঃবিহীন ও ম্রিয়মান্ হইয়া পড়িতেছে। প্রথমাবস্থাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য সমুদায়ের প্রতি, এবং সেই কর্ত্তব্য হইতে সমুদ্ভূত ও তাহার এক অঙ্গস্বরূপ সন্তান সন্ততিদিগের প্রতি আমাদিগের যে কর্ত্তব্য তৎপ্রতি, প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিলে এই দুরবস্থা সহজেই নিবারণ হইতে পারে। ঈশ্বরপ্রীতি এবং ধর্ম্মভাব সুকুমারমতি শিশুর সরল চিত্তে যেরূপ সহজে নিবিষ্ট হয়, শিশুহৃদয়ে সেই ভাব সংস্থাপন করা যে প্রকার অনায়াস-সাধ্য, তাহাতে যদি আমরা প্রথম হইতেই চেষ্টা করি তাহা হইলে শিশুর আত্মায় পবিত্র ব্রহ্মমূর্ত্তি অনায়াসে অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত হইতে পারে। এবং ঈশ্বরপ্রীতি একবার যাঁহার অন্তরে স্থান পাইয়াছে, ব্রহ্মোপসনার সুমধুর আস্বাদ যিনি মুহূর্ত্ত মাত্রও গ্রহণ করিয়াছেন, মঙ্গলময়ের নিরুপম মঙ্গল ভাব প্রীতি-নেত্রে যিনি কখনও দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি যাঁহার আত্মাকে ক্ষণমাত্রও প্রদীপ্ত করিয়াছে তিনিই জানেন যে সেই প্রীতি সেই জ্ঞান সেই জ্যোতিঃ কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না। হিমালয় চূর্ণ

হইতে পারে, মহাসাগর সমস্ত শুষ্ক হইতে পারে, সূর্য্যের জ্যোতিঃ তমসাবৃত হইতে পারে,কিন্তু অবিনাশী আত্মার বিশ্বাস বা ঈশ্বর-জ্ঞান নষ্ট হইবার নহে; ভক্ত-হৃদয়ের মধুরতা বা শান্তি-রস শুষ্ক হইতে পারে না; ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি কোন কালেই জ্যোতিঃহীন হইবে না; শিশুর আত্মা প্রথম হইতে ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইলে তাহা কল্পান্তস্থায়ী হইবে এবং সেই জ্ঞান ইহ জীবনে আরম্ভ করিয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবে। আত্মার যেমন নাশ নাই, আত্মজ্ঞানেরও সেইরূপ শেষ নাই তাহা অবিনাশী অনন্তকাল স্থায়ী। পুত্র কন্যাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান হইয়া, আমরা কিসে তাহারা সংসারে মান মর্য্যাদা বা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবে, কিসে লোকের নিকট জ্ঞানবান ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইবে, কিসে সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবে কেবল সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকি; এবং কেবল সেই বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আপনাদিগকে আপ্তকাম মনে করি,এবং তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় সুসম্পন্ন হইল বলিয়া মনকে স্তোভ দিই। কিন্তু যাহাতে তাহাদিগের যথার্থ উন্নতি—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হয়,যাহাতে তাহারা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অথবা যাহাতে তাহারা প্রকৃত সুখ এবং অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য কেহই চেষ্টিত হয়েন না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের চালনার অভাবে তাহাদিগের আত্মা যে নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে তাহার প্রতি কেহই লক্ষ্য করেন না। মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্ফূর্ত্তি লাভ এবং জ্ঞানোন্নতি যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু তাহার সহিত ধর্ম্মোন্নতির প্রভেদ এই যে যেমন পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ; একাধারে যদি দুই গুণই প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে তদপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু দেখিতে মনোহর গন্ধবিহীন পুষ্প অপেক্ষা যেরূপ দৃষ্টি-কুৎসিৎ সুবাসিত পুষ্প অধিক আদরণীয়, সেই প্রকার অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জ্ঞানবান ও বিদ্বান অথচ ধর্ম্মহীন পুরুষ অপেক্ষা ঈশ্বরপরায়ণ বিদ্যাবিহীন সাধু সর্ব্ববিধায়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর আদরণীয়। এক্ষণে দেখা যাউক যে, যে উপায়ের দ্বারা বালক বালিকাকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যাইতে পারে তাহা এরূপ কঠিন এরূপ কষ্টসাধ্য কি না যে তাহা সহজে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হয় না। কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে সেই উপায় সমস্ত নিতান্ত সহজ এবং অনায়াস-সাধ্য। যে মানসিক জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত,যে পার্থিব বিদ্যালাভের নিমিত্ত সকলেই লালায়িত, সেই জ্ঞানালোচনা সেই বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা যাইতে পারে। যাহারা পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে জড় জগতের সৃষ্ট পদার্থ সকলের দোষ গুণ এবং কার্য্যকারিতার বিচার করিতেছে তাহাদিগকে সেই সঙ্গেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে সেই সমস্তের যিনি স্রষ্টা তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার অখণ্ড নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত পদার্থ স্থিতি করিতেছে, এবং তাহাদিগের উপযোগিতার দ্বারা সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত জড় পদার্থের দ্বারা মনুষ্য কত প্রকারে উপকৃত হইতেছে বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সমস্ত পদার্থের দ্বারা তাবৎ জীবের এবং জন

সমাজের কতপ্রকার উন্নতি সাধন হইতেছে, ইহা যখন বালক বালিকারা বুঝিতে পারে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানময়ের অনন্ত জ্ঞান, এবং যাবদীয় পদার্থকে মনুষ্যের উন্নতি সাধন এবং সুখসমৃদ্ধির উপায় করিয়া দেওয়াতে সেই করুণাময়ের অপার করুণার বিষয়, কত সহজে বালক বালিকার হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে। জ্যোতির্বিদ্যা-শিক্ষার্থীরা যখন গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির স্থিতি গতি ও পরস্পরের সম্বন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত এবং পুলকে পূর্ণিত হয়, তখন যদি তাহাদিগের চিত্ত সেই বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত কৌশলের প্রতি আকর্ষণ করা যায়, তখন যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে সেই জ্যোতির্ময়ের জ্যোতির নিকট প্রভাকর প্রভাহীন হয়, তাঁহার অচিন্ত্য অত্যাশ্চর্য্য কৌশলেই গ্রহ নক্ষত্রাদি স্ব স্ব পথে ভ্রমণ এবং নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, এবং সমুদায় একীভূত হইয়া সেই ভূমা পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছে; তাহা হইলে কত সহজে তাহাদিগকে ঈশ্বর-চিন্তায় রত করা যাইতে পারে; এবং মনোবিজ্ঞানের অধ্যেতাদিগকে আরও কত সহজে ঈশ্বরের দিকে এবং ধর্ম্মপথে লওয়ান যাইতে পারে এবং এইরূপে জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-চিন্তা এবং ধর্ম্মশিক্ষা কত সুলভ হইয়া পড়ে। এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় বিশেষ রূপে আলোচনা করিবার এ সময় নহে এবং আর অধিক দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথা প্রতিপন্ন করাও নিস্প্রয়োজন; কেবল মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন শাস্ত্র নাই যাহার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের চেষ্টা না করা যায়—অধিক কি শাস্ত্র দূরে থাকুক, এই সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা হইতে চেষ্টা করিলে আমরা ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে বা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইতে না পারি। কোন এক মহানুভব ঈশ্বর-পরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ কবির বিষয়ে ইহা কথিত আছে যে, তিনি স্বীয় পুত্রের মত ও মনের গতি নাস্তিকতার পক্ষপাতী দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন; এবং তাহাকে ঈশ্বরের দিকে আনিবার ও তাহার মত পরিবর্ত্তন করিবার অন্য কোন প্রকার সুযোগ না পাইয়া একটী সুকৌশল উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে পুত্রের পুষ্পোদ্যানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে; এবং তাহা হইতে তাহার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সংস্থাপন করা সহজ হইবে; এই বিবেচনায় তিনি কতকগুলি পুষ্পশ্রেণী এই রূপে সাজাইলেন যে তাহাতে তাঁহার নাম পড়া যাইতে লাগিল। পরে এক দিবস তাঁহার পুত্রের সহিত সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আসিলে পুত্র পুষ্পশ্রেণী দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিয়া উঠিল "ইহা কাহার রচনা"। পিতা উত্তর করিলেন যে, ইহা আপনা হইতেই ঐরূপ হইয়াছে। পুত্র তাহা নিতান্ত অসম্ভব বুঝিয়া যখন বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, তাহা আপনা হইতে কখনই হইতে পারে না; নিশ্চয়ই কাহারও রচনা হইবে। তখন পিতা উত্তর করিলেন যে, যদি এই সামান্য রচনা-কৌশল দেখিয়া তোমার মনে হয় যে ইহা কখনই আপনা হইতে উদ্ভব হইতে পারে না; তবে এই বিশ্ব-সৃষ্টিতে যে অনন্ত কৌশল দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহা আপনা হইতে উদ্ভব হওয়া কি প্রকারে সম্ভব বিবেচনা কর। সেই অবধি পুত্রের জ্ঞান জন্মিল, এবং তিনি সৃষ্টির পদার্থমাত্রেই ঈশ্বরের পবিত্র হস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং প্রত্যেক সামগ্রী হইতে বিশ্বপাতা জগৎপিতার অচিন্ত্য মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, এবং অপার করুণার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। আমরাও সেই রূপ যত্ন করিলে অতীব ক্ষুদ্র বিষয় হইতেও

পুত্র কন্যার ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পবিত্র করিতে পারি। কিন্তু এই প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন —এই সাধু উদ্দেশ্য সুসিদ্ধির জন্য—একটি সার কথা আমাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, একটী মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা যাহা সুসিদ্ধ হয় শত শত উপদেশেও তাহা সম্পন্ন হয় না। পিতা যখন পুত্রকে ধর্ম্ম-পথে—ঈশ্বরের দিকে লওয়াইতেছেন, তখন যদি তিনি নিজে সেই পথের পথিক না থাকেন, তিনি স্বয়ং যদি ঈশ্বরপরায়ণ না হন তবে তাহার চেষ্টা সমুদয় বিফল হইবে। অতএব যেন আমাদিগের নিজের হৃদয় সকল সময়ে সকল অবস্থায় ঈশ্বর-প্রীতিতে পূর্ণ থাকে; আমাদিগের আত্মাকে যেন কখন শুষ্ক হইতে না দিই; এবং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ ও শুদ্ধাচারী হইয়া যেন সন্তান সন্ততির শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে আমাদিগের সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদিগের উপদেশের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হইবে, এবং সেই কারণে আমরা আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে এবং আয়াস ও যত্নের সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু যদি আমাদিগের উপদেশ এক প্রকার এবং কার্য্য অন্য প্রকার হয়—পুত্র কন্যা-দিগকে ঈশ্বরপরায়ণ হইতে বলি অথচ নিজে প্রীতিশূন্য হই—স্বয়ং ধর্ম্মপথ পরি-ত্যাগ করত সন্তান সন্ততিদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা পাই—সদুপদেশের খনি অসদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা লোপ করি; তাহা হইলে আমাদিগের যত্ন ও চেষ্টা সমুদায়ই বিফল হইবে; উদ্দেশ্য যতই মহৎ, আশা যতই উচ্চ হউক না কেন, কার্য্য-দোষে সকলই হীন মলিন হইয়া পড়িবে; স্বয়ং মোহান্ধ হইয়া অন্যের পথপ্রদর্শক হইবার চেষ্টা করিলে উভয়েই দুস্তর ভ্রান্তি-সাগরে পতিত হইবে। অতএব যখন আমরা পুত্র কন্যার শিক্ষায় প্রবৃত্ত হই, যখন তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিবার চেষ্টা করি, যখন তাহাদিগকে সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হই; তখন যেন নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে; যেন স্বয়ং শান্ত শমান্বিতচিত্ত হইয়া পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করি, এবং স্বীয় আত্মাকে ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ করিয়া পবিত্র হৃদয়ে, প্রীতি সহকারে সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার অসীম মহিমা, অনন্ত জ্ঞান এবং অপার করুণার বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করি। এবং স্বয়ং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া সন্ততির ধর্ম্মোন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হই।

পুত্র কন্যার বিদ্যাভ্যাস ও ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল; তাহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে পুত্র সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যা-ইতে পারে, কিন্তু কন্যা সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করা যায় না। মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে নর নারীর যে সমান অধিকার সে বিষয় তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে পুত্র কন্যা সম্বন্ধে কিছুই ইতর বিশেষ নাই। যেমন পুত্রদিগের বিদ্যা-ভ্যাস অর্থাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে পিতা মাতার কর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছে; সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কথিত হই-য়াছে যে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া" কন্যা-কেও এইরূপে পালন করিবেক এবং "শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ অতিযত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক। ইহাতে পুত্রের শিক্ষা এক প্রকার এবং কন্যার শিক্ষা ভিন্ন প্র-কার এরূপ কোন প্রভেদ করা হয় নাই। বরং যে ব্রাহ্মধর্ম্মে "দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা" কন্যাকে "ধনরত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান" করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; তাহাতেই দেখিতে পাই যে "নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্" "কন্যা যত দিন ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না" ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে কন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা পিতা মাতার যে প্রধান কর্ত্তব্য পুরাকালীন

মহর্ষিরা তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। কিন্তু যদি ঋষিবাক্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও বিবেচনা করা যায়, যদি কেবল মাত্র যুক্তির পথ অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও কন্যাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান এবং তাহাদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন পিতা মাতার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিশেষ রূপে সাব্যস্ত হইবে। যে বিষয় যাহার উপযোগী তাহাকে সেই বিষয়ে নিয়োগ করাই যুক্তির পথ, এবং উপযুক্তের উপযোগিতা সম্পাদনই বিশ্বময়ের বিশ্বভাণ্ডারের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল। যদি আমরা সেই যুক্তি এবং বিশ্ববিধাতার সেই অখণ্ড নিয়মের প্রতি দৃষ্টি করি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে যখন পবিত্র প্রীতি নারী-হৃদয়ের যে প্রকার নিরুপম শোভা সম্পাদন করে প্রীতির এরূপ অসামান্য সৌন্দর্য্য আর কিছুতেই দৃষ্ট হয় না; অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভক্তি এবং অটল বিশ্বাস রমণীর অন্তরে যেরূপ দৃঢ় নিবদ্ধ হয় এরূপ পুরুষের আত্মাতে প্রায় দেখা যায়না; তখন ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় যেন করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রীজাতির আত্মা ঈশ্বর-ভাবের প্রকৃত আধার রূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধর্ম্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপযোগী করিয়াছেন। অতএব আমরা পুত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস ও ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইয়া যেন কন্যা সন্তানদিগকে বিস্মৃত না হই, একের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ হইয়া যেন অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত না জন্মাই। কিন্তু যেন আমরা সকল সময়ে সকল অবস্থাতে উভয়ের প্রতি সমভাবে সমানরূপে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উভয়কেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বব্যাপিতা ও উদারতা প্রতিপন্ন করি; এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমস্ত সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হই।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আমরা ঈশ্বর-প্রসাদে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দিন দিন যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি; অহোরাত্র যে সত্যের শিক্ষা পাইতেছি, যেন কার্য্যের দ্বারা তৎসমুদায়কে নষ্ট না করি। যেন আমাদিগের শিক্ষা ও উপদেশ এক প্রকার, এবং কার্য্য ও ব্যবহার অন্য প্রকার না হয়। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা জ্ঞাত হইয়াও যেন আমরা কর্ত্তব্যবিমূঢ় না থাকি। অনেক সময়ে আমরা মনে করি যে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন অতি সহজ, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান নিতান্ত কঠিন; এবং এই ব্রাহ্মানুচিত, ধর্ম্মবিরুদ্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকি, এবং সময়ে সময়ে এতদূর নিশ্চেষ্ট এবং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হই যে অতি সুলভ ও অনায়াসসাধ্য কর্ত্তব্য সাধনেও আমাদিগের ঔদাস্য দৃষ্ট হয়। করুণাময় পরমেশ্বর কর্ত্তব্যানুষ্ঠান আমাদিগের পক্ষে কি এতই কঠিন এরূপ দুঃসাধ্য করিয়াছেন যে আমরা বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হইব না; ভক্তবৎসল ভগবান্, স্নেহময়ী জননী সন্তানদিগের পক্ষে ধর্ম্মপথ কি এতদূর ভয়ানক কণ্টকাবৃত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গমন করিবার সোপান কি এরূপ দুরারোহ ও সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন যে ইচ্ছা করিলে এবং প্রকৃতরূপে সচেষ্ট হইলেও তাঁহার পথের পথিক হইতে পারিব না? ইহা কখনই সম্ভবে না; এ কথা নিতান্ত অবিশ্বাসীর চিত্তমুগ্ধকর স্তোভ বাক্য। ইহা মনে করিলে পরম করুণাময়ের অপার করুণার প্রতি দোষারোপ করা হয়, কোন ব্রাহ্মই সর্ব্বমঙ্গলময়ের মঙ্গলস্বরূপের এ প্রকার অপভ্রংশের অনুমোদন করিতে পারেন না। অতএব আমরা এ প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথায় কর্ণপাত করিবার পূর্ব্বে যেন স্বীয় অন্তরের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি করি এবং আপন আপন আত্মার প্রকৃত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই; এবং তাহা হইলেই দেখিতে পাইব যে কর্ত্তব্য সাধনের প্রকৃত কাঠিন্য কিছুই নাই; কেবল যত্নের অভাবে চেষ্টার অভাবে আমরা কর্ত্তব্য সাধনে বিরত থাকি। কিন্তু যদি আমাদিগের চেষ্টার ও প্রকৃত যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের ন্যায় সহজ কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! ঈশ্বর-প্রীতি যাহাদিগের সমস্ত চিন্তা ও কার্য্যের উদ্বোধক, পরম পিতার প্রিয় কার্য্য সাধন যাহাদিগের

প্রকৃত উদ্দেশ্য. ঈশ্বর তাঁহাদিগের সহায়, সেই বিশ্বনিয়ন্তা তাহাদিগের নেতা, এবং এই উচ্চ উন্নত সহায়তা যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন বোধ হয় না। অতএব ভ্রাতৃগণ, আর নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই; এই উপস্থিত মহোৎসব হইতেই দেখিতে পাই যে ঈশ্বর যাঁহাদিগের সহায় তাঁহারা কত প্রকার বাধা ও বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছেন। ঊনপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে একটী মাত্র ব্রাহ্মসমাজেও লোকে নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতে সাহসী হইত না; এবং যদিও আমাদিগের আশানুরূপ পূর্ণ ফল এ পর্য্যন্ত ফলিয়া না থাকে, তাহা হইলেও এক্ষণে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত দেখিতেছি, এক্ষণে ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যে পর ব্রহ্মের স্তুতিবাদ হইতেছে, ইহাতে কাহার মন আশা এবং আনন্দে পরিপূর্ণ না হয়। এক্ষণে যে ব্রহ্মপূজার মন্দির কেবল মাত্র স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে তাহা যে অচিরে গৃহে গৃহে দেখিতে পাইব অন্তরের এই চিরপোষিত প্রবল আশার বেগ কে নিবারণ করিতে পারে? কিন্তু আমাদিগের আয়াস ও যত্নের নিতান্ত প্রয়োজন; এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের যে উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা পুত্র কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলাম; সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে প্রতি গৃহে অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ঈশ্বরপূজার মন্দির সংস্থাপিত হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ। সংশয় শঙ্কা বিরহিত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করত স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই আমাদিগের একমাত্র কার্য্য জানিয়া, সেই পূর্ণ প্রীতিতে আত্ম সমাধান কর; পরমাত্মাতে প্রাণ মন ও আত্মা সমুদয় সমর্পণ করত অনন্ত জীবন ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা ও উদারতা প্রতিপাদন কর; এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে চির দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত সেই করুণাময়ের সেবায় রত থাকিয়া যাহাতে সকলে সেই অমৃতের পরম সেতু প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য যত্নবান্ হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	৩
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য	...	৪৷৷০
ডাক মাশুল (অগ্রিম দেয়)	...	।৶০

ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

আয় ব্যয়

পৌষ ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	২৫৭।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৪৫।৶০
সমষ্টি		৪০৩৶৫
ব্যয়	... ...	২৫২৸/
স্থিত	... ...	১৫০।/০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৩৷৷০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	... ...	১৮৸১০
পুস্তকালয়	... .	৩৷৷৶১০
যন্ত্রালয়	... ...	১৮৪
গচ্ছিত	.. ..	১।৸০
সমষ্টি	... ..	২৫৭৷৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৬৭৸৫/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	... ...	৯৬৶৫
পুস্তকালয়	... ...	১৮/১০
যন্ত্রালয়	... ...	৬৮৸৫
গচ্ছিত	... ...	১৸৶০
সমষ্টি	... ...	২৫২৸/০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	... ...	৩৷৷০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৯ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ ফাল্গুন বুধবার।

Registerd No 52.

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব - তাল ঝাঁপতাল।

প্রভু পূজিব তোমারে বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয় কপাট খুলি পেতেছি মন আসন।
ভক্তির গেঁথেছি হার দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন ছিটা এই মাত্র আয়োজন।
নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময় ভক্তে দিবে দরশন।
এসো তবে দীনবন্ধু এসো করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদবিন্দু সফল কর জীবন।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক।

"তুমি প্রাতঃকালের ন্যায় আর আমি নির্জ্জনাগারের প্রাতঃকালের বর্ত্তিকা স্বরূপ। তুমি একবার হাস্য কর এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কবিরা অতি সহজে সত্য দৃষ্টি করেন এবং তাহা দৃষ্টি করিয়া এমন ভাষায় ব্যক্ত করেন যে তাহা শুনিবামাত্র মনুষ্যের আত্মা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দেয়। ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত সহস্র প্রমাণ-প্রয়োগ ও সহস্র যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা যে সত্য আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করেন কবি তাহা এক কথায় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। যে কবি হইতে আমি এই মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করিলাম, সেই অত্যদ্ভুত কবি ঈশ্বর-প্রেমে গদগদ হইয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া এমন একটি কথা বলিয়াছেন যাহা কেহ কখন বলে নাই। "তুমি প্রাতঃকালের ন্যায়।" প্রাতঃকাল আমাদিগকে ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ, অনন্তহ, পবিত্র স্বরূপ, শান্ত স্বরূপ, সুন্দর স্বরূপ, অন্তঃস্নিগ্ধকারিণী শক্তি এবং নবজীবন-প্রদায়িনী শক্তি, স্মরণ করাইয়া দেয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃকালের শুভ্র জ্যোতি ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার জ্যোতি চর্ম্ম-চক্ষু দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ। জ্যোতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। তিনি সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আশ্রয়। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

প্রাতঃকালের শুভ্র জ্যোতি অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পায়। প্রাতঃকালের শুভ্র জ্যোতির অনন্ত ভাব ঈশ্বরের অনন্ত ভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আকাশের অতীত হইয়াও স্থিতি করিতেছেন। তিনি বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং।" জগৎকে ব্রহ্মমন্দির বলা উচিত হয় না তাহা হইলে ঈশ্বর জগতের দ্বারা ব্যাপ্য এইরূপ বুঝায় বরং ঈশ্বর জগতের মন্দির বলিলে শোভা পায়। ঈশ্বর যেমন অনন্ত-দেশ-ব্যাপী তেমনি অনন্ত-কাল-স্থায়ী, তাঁহার শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, করুণা অনন্ত। ঈশ্বরের অনন্তত্বে বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, এই বিশ্বাস সঙ্কুচিত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক ভাবাপন্ন হয়।

প্রাতঃকালের পবিত্রতা ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর পবিত্র স্বরূপ। আমরা যেমন কখন সাধু, কখন অসাধু, ঈশ্বর সেরূপ নহেন। "ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নোএব অসাধুনা কনীয়ান্" সাধু কর্ম্মে তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন না আর অসাধু কর্ম্মে তিনি অশ্রেষ্ঠ হয়েন না। সাধু অসাধু শব্দ তাঁহাতে খাটিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই পবিত্র স্বরূপ। তিনি যেমন নিজে পবিত্র স্বরূপ তেমনি অন্যকেও তিনি পবিত্র করেন। তাঁহাকে চিন্তা করিলে আমরা পবিত্র হই; তাঁহার প্রসঙ্গ করিলে আমরা পবিত্র হই; তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে আমরা পবিত্র হই।

প্রাতঃকালের প্রশান্ত ভাব ঈশ্বরের সেই শান্ত স্বরূপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদিগের চিত্তের উপর রিপু সকল নিরঙ্কুশ আধিপত্য করিতেছে; তাহারা আমাদিগের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে; কিন্তু রিপু সকল তাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না। পাপ-প্রবৃত্তি আমাদিগের শান্তিভঙ্গ করিতেছে, দুঃখ ক্লেশ আমাদিগের শান্তিভঙ্গ করিতেছে, কিন্তু পাপ-প্রবৃত্তি এবং দুঃখ ক্লেশ তাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না। নানা কারণ বশতঃ আমাদিগের চিত্তের বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য হইতেছে; তাঁহার এরূপ চাঞ্চল্য নাই। তিনি নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সমুদ্রবৎ প্রকাশ পাইতেছেন। ঈশ্বর যেমন নিজে শান্ত স্বরূপ, তিনিই কেবল আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিতে পারেন। শান্তির জন্য ধনের দ্বারে উপনীত হও, ধন এই কথা বলিবে "পৃথিবীর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে দিতে পারি, তোমার সম্বন্ধে পৃথিবীকে সকল বিত্ত দ্বারা পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু শান্তি-রত্ন তোমাকে প্রদান করিতে অক্ষম।" শান্তির জন্য মানের দ্বারে উপনীত হও, মান তোমাকে এই কথা বলিবে "তোমাকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিতে পারি, সংসারের সকল ব্যক্তিকে তোমার পদতলে আনয়ন করিয়া দিতে পারি, কিন্তু শান্তি প্রদান করিতে পারি না।" শান্তির জন্য যশের দ্বারে উপনীত হও যশ তোমাকে এই কথা বলিবে "আমি এমন করিতে পারি যে সমস্ত পৃথিবী তোমার খ্যাতিরবে নিনাদিত হইবে, সকলেই তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে কিন্তু শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম নহি।" এই রূপে শান্তি লাভ না করিয়া আমরা সকল দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সাংসারিক দুঃখ ক্লেশে ম্রিয়মাণ হইয়া আমরা শান্তিকে আহ্বান করি কিন্তু শান্তি আগমন করে না।

"অধীর হইয়া হেন উপদ্রবে
শান্তি শান্তি করি হৃদয় সদা ডাকে আর্ত্তরবে।
শান্তি মনে করি অশান্তিরে ধরি
চাই এক পাই আর এ বিচিত্র ভবে॥"

সংসারানলে দীপ্তশিরা হইয়া আমরা যেখানে গমন করি না কেন, কোন থানেই শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হই না, কেবল ঈশ্বরের নিকট গমন করিলে শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হই।

প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাতঃকালের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র সৌন্দর্য্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সে সৌন্দর্য্য চিন্তা করিলে মন মোহিত হয়। জগতে অনেক সুন্দর পদার্থ আছে কিন্তু সেই রূপহীন সৌন্দর্য্যের নিকট রূপ-বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য একেবারে পরাভব মানিয়াছে।

প্রাতঃকাল স্নিগ্ধকাল। প্রাতঃকালে স্বভাবতঃ রিপুর উত্তেজনা ও পীড়ার যাতনা অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হয়। প্রাতঃকালের স্নিগ্ধ ভাব ঈশ্বরের অন্তঃস্নিগ্ধকারিণী শক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করিলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়, প্রাণ মন শীতল হয়। অন্তঃশীতলতার প্রতি সুখ নির্ভর করে। অন্তর যদি শীতল থাকে তবে সমস্ত জগৎ শীতল বোধ হয় আর অন্তর যদি উত্তপ্ত থাকে তবে সমস্ত জগৎ উত্তপ্ত বোধ হয়।

"অন্তঃশীতলতাযাং হি লব্ধায়াং শীতলং জগৎ।
অন্তস্তাপাভিতপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ॥"

প্রাতঃকাল ঈশ্বরের নব-জীবন-প্রদায়িনী শক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাতঃকালে যেমন মনুষ্য মৃত্যুর প্রতিরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হয়। রজনীর অন্ধকারের অবসানে যেমন জগৎ আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আত্মার জাগরণের পর অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইলে ও জ্ঞানচক্ষু স্ফূর্ত্তি পাইলে, ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয়েন। প্রাতঃকালে যেমন জীব সকল নব জীবন লাভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আত্মা উল্লিখিত আধ্যাত্মিক প্রাতঃকালে নব জীবন লাভ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

কবি বলিতেছেন "তুমি প্রাতঃকালের ন্যায় আর আমি নির্জ্জনাগারের বর্ত্তিকা স্বরূপ। তুমি একবার হাস্য কর ও দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।" ঈশ্বরের নিকট নম্রতা স্বীকার ও তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ তাঁহার প্রতি আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। "আমি নির্জ্জনাগারের বর্ত্তিকা স্বরূপ" এই বাক্য দ্বারা কবি ঈশ্বরের নিকট নম্রতা স্বীকার করিতেছেন আর "তুমি একবার হাস্য কর আর দেখ আমি কিরূপ তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি" এই বাক্য দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করিতেছেন।

প্রাতঃকালের আলোকে যেমন বর্ত্তিকার আলোক ম্লান ও নিষ্প্রভ হয় তেমনি ঈশ্বরের জ্যোতির সহিত তুলনা করিলে শরীর-রূপ নির্জ্জনাগারের বর্ত্তিকা স্বরূপ আত্মার জ্যোতি ম্লান ও নিষ্প্রভ বোধ হয়। চন্দ্রের জ্যোতিতে যেমন খদ্যোতের জ্যোতি বিলুপ্ত হয় তেমনি ঈশ্বরের জ্যোতিতে আত্মার জ্যোতি হারাইয়া যায়। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা করিলে আত্মাকে কি অধম বোধ হয়! তিনি কি প্রভাবশালী, দীপ্তি-বিশিষ্ট ও সুন্দর! আমরা কি দীন হীন ও মলিন!

কবি তৎপরে শুভ্র পবিত্র প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্যের ন্যায় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ও ঈশ্বর-প্রেমে গদগদ হইয়া তিনি এক্ষণে ঈশ্বরকে আত্মার্পণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "তুমি একবার হাস্য কর

এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।" ঈশ্বরের হাস্য, ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন, সাধকের একমাত্র ধন। সেই প্রসন্ন বদন ধার্ম্মিককে সংসারের সকল দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষম করে। মনে কর কোন ধনাঢ্য ধার্ম্মিক সম্পদ-ভ্রষ্ট হইয়া দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছেন। তিনি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, এক্ষণে মৃত্তিকা তাঁহার শয্যা হইয়াছে, পৃথিবীর পরম উপাদেয় দ্রব্য সকল আহার করিতেন, এক্ষণে শাকান্ন আহার করিতে বাধ্য হইতেছেন, পূর্ব্বে অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা সেবিত হইতেন, এক্ষণে আবশ্যক কর্ম্ম সকল অতি কষ্ট করিয়া নিজের হস্তে সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার অবস্থা এই রূপ হইলেও তাঁহাকে দরিদ্র মনে করিও না, তিনি এখনও সম্পূর্ণ ধনবান, তাঁহার নিকট এখনও এমন একটি ধন আছে যাহা চোর অপহরণ করিতে পারে না এবং যাহার উপর কাল আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থাতেও তিনি ঈশ্বরকে বলেন "তুমি একবার হাস্য কর এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।" উল্লিখিত দারুণ ক্লেশের অবস্থায় পতিত হইলেও উক্ত কথা বলিলে তাহা অতিরিক্ত বোধ হয় যেহেতু দরিদ্রাবস্থা দ্বারা সহসা লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয় না কিন্তু যদি এমনই হয় যে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হয় তথাপি তিনি মৃত্যু হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যদি ধর্ম্ম জন্য নিষ্ঠুর রাজা কর্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং তজ্জন্য তিনি বধ্যভূমিতে আনীত হয়েন তখন তিনি উক্ত কথা সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। "তুমি একবার হাস্যকর ও দেখ কিরূপ তোমার জন্য আমি প্রাণ সমর্পণ করি।" বস্তুতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই ভৌতিক জীবন জীবন নহে ঈশ্বর-প্রীতিই তাঁহার জীবন, ঈশ্বর-বিস্মরণই তাঁহার মৃত্যু। ঈশ্বরই তাঁহার আত্মার একমাত্র আশ্রয়-ভূমি। বৃক্ষ কি কখন মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে, না নদী প্রস্রবণ হইতে পৃথক হইয়া প্রবাহিত হইতে পারে? বৃক্ষ যেমন মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, নদী যেমন প্রস্রবণ হইতে বিযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে পারে না তিনি তেমনি ঈশ্বর হইতে পৃথক থাকিতে পারেন না। সাধক এই রূপ ঈশ্বর-গত-প্রাণ হইয়া সর্ব্বদাই গভীর আনন্দ উপভোগ করেন। কোন বিপদই সে আনন্দ ক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

এরূপ অবস্থা কি প্রার্থনীয় নহে? কিন্তু এরূপ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কেবল একটি মাত্র নিয়ম পালন আবশ্যক করে, সে নিয়ম নিষ্পাপ হওয়া। নিষ্পাপ হও আর আনন্দের আপণ এই জগতের সমস্ত আনন্দ অবাধে লুণ্ঠন কর। যদি আমরা নিষ্পাপ হইতে পারিলাম তবে আর আমাদিগকে কে পায়?

হে পরমাত্মন্! হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুব তারা! তুমি যেন আমাদিগের দৃষ্টিপথের কখন অন্তর্হিত না হও। তোমার প্রসন্ন বদনই আমাদিগের একমাত্র ধন। তাহা আমাদিগের হইতে কখন লুক্কায়িত রাখিও না, তাহা হইলে আমরা সকলই হারাই। হে সৌন্দর্য্যের আধার ও একমাত্র প্রেমাস্পদ! আমরা যেন অন্তরের সহিত বলিতে পারি "তুমি হাস্য কর এবং দেখ কিরূপ আমি তোমার জন্য প্রাণ সমর্পণ করি।"

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

আমরা আনন্দিত চিত্তে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট ব্রাহ্মদিগের অশেষ ঋণভার ব্রাহ্মেরা যে বিস্মৃত নহেন, তাঁহারা সম্প্রতি তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত বিজ্ঞাপনানুসারে ৭ ই মাঘ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বিস্তীর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণে উক্ত মহাত্মার স্মরণার্থ একটী সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। ইহার মধ্যে বিস্তর বিদ্বান ধার্ম্মিক ও উচ্চপদস্থ লোক ছিলেন। সকলে সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া উৎসাহপূর্ণ চক্ষে বক্তার প্রতীক্ষা করিতেছেন ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্থিত হইয়া জ্বলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত কহিলেন—

প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি এই একটি কথা বলিতে চাই যে, আমি কোন দলবদ্ধ সমাজ-বিশেষের প্রতিনিধি হইয়া অথবা তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অদ্যকার এই সভা আহ্বান করি নাই; রামমোহন রায়ের নাম-মাহাত্ম্য নির্ব্বিশেষে সকল ব্রাহ্মের গৌরবস্থল, এবং তাহার গুণে ব্রাহ্মেরা আধুনিক বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাতন অথচ চির নূতন—সনাতন যে একটি ভাব তাহা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক সকল প্রকার মনোমালিন্য এবং হৃদয়বেদনা ধৌত করিয়া ফেলিবেন, এই আশাতে উৎসাহিত হইয়া আমি অদ্যকার এই শুভ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি ঈশ্বর করুন যেন তাহা

রামমোহন রায় সেই শ্রেণীর ব্যক্তি যাঁহারা পৃথিবী হইতে অবসৃত হইলেও স্বদেশের হৃদয় হইতে অবসৃত হন না, তাহা শুধু নহে—স্বদেশের হৃদয়ে দিন দিন ক্রমশই বদ্ধমূল হইতে থাকেন—তাঁহাদের রোপিত মঙ্গলবৃক্ষ বাহিরে যতই ফলবান্ হইতে থাকে তাঁহাদের নাম ভিতরে ততই বদ্ধমূল হইতে থাকে। এরূপ মহাত্মাগণের স্মরণার্থে সভা আহ্বান করা এক প্রকার বাহুল্য মনে হয়;—স্বদেশ যাঁহাদিগের নিকট এত ঋণ-পাশে বদ্ধ যে ভুলিব মনে করিলেও তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারে না, তাঁহাদের স্মরণের জন্য সভা আহ্বানের আয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? বাল্মীকি মুনির স্মরণার্থে কে কবে সভা আহ্বান করিয়া থাকে—তাঁহার রামায়ণে তিনি কি জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজ করিতেছেন না? দেশের চর্ম্মচক্ষু হইতেই তিনি অন্তর্ধান হইয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া দেশের মনশ্চক্ষু হইতে তিনি কি অন্তর্দ্ধান হইতে পারিয়াছেন না, কোন কালে পারিবেন? রামমোহন রায় যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা যদি নিস্ফল হইত, তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যখন ইহারি মধ্যে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেও কি তিনি প্রত্যক্ষ হইতেছেন না—চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে? রামায়ণ যখন যুবা পুরুষের ন্যায় নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বিচরণ করিতেছে তখন বাল্মীকির স্মরণার্থে আর কে কি করিবেন—করিবার আর আছে কি? ব্রাহ্মসমাজ যখন নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্ম লোকের আত্মার অন্তরতম প্রদেশ শীতল করিতেছে, তখন আবার কেন রামমোহন রায়ের স্মরণার্থে আয়াস পাওয়া! ইহাত আশ্চর্য্য নয় যে এত দিন আমরা তাঁহার স্মরণার্থে কিছু করি নাই, ইহাই আশ্চর্য্য যে, তাঁহার কার্য্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন না করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতেছি — জীবন্ত ব্যাপারকে মৃত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছি। কিন্তু আর এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা আশ্চর্য্য নহে; যাহার নিকট উপকার-ঋণে বদ্ধ তাঁহাকে স্মরণ করিতে এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। কিন্তু আমরা শুদ্ধ কেবল রামমোহন রায়কে স্মরণ করিতে এখানে

আসি নাই ; তাঁহার বিরচিত ব্রহ্মসঙ্গীতে আমরা তাঁহার মনের কথা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ শুনিব এবং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ঈশ্বরবন্দনা করিয়া সেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভবনে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ধন্য হইব বিশেষতঃ এই অভিপ্রায়ে আমরা সকলে অদ্য এখানে আনন্দে সম্মিলিত হইয়াছি।

রামমোহন রায় এমনি লোক ছিলেন যে যাঁহারা তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াছেন এবং দুই এক দিবস তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্রে তাঁহাদের চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, আর যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্রে তিনি তাঁহাদের মনশ্চক্ষুতে আবির্ভূত হন। এরূপ যে হয়—সে কি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি বা ক্ষমতার প্রভাবে হয় ? তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতার প্রভাব ইংলণ্ডের মহাসভায়, তথাকার নীতিশাস্ত্রবিৎ বিদ্বজ্জনের মধ্যে, নবদ্বীপের শাস্ত্র-বিশারদ মহামহা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যতদূর কার্য্য করিবার তাহা করিয়া—বঙ্গভূমিতে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়া—অন্তর্দ্ধান করিয়াছে. তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিবে যে—সে ব্যক্তি কোথায় ? আর একজন তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে সে ইত্তাহাতে সমর্থ হন ! বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার প্রভাবে নহে কিন্তু স্বদেশের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের যে একটি আন্তরিক ভালবাসা ছিল—সে ভালবাসা শুধু মুখের ভালবাসা নহে কিন্তু কাজের ভালবাসা—যাহার জন্য সূর্য্য চন্দ্র তারকার সমুজ্জ্বল মুখের নিকট হইতে জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করিয়া সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা-পরিত্যক্ত নীহারাচ্ছন্ন সপ্তসিন্ধুপারে আপনার অমূল্য প্রাণকে বিসর্জ্জন দিলেন—আহা সে সময় একটিবার স্বদেশের মুখদর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ—রামমোহন রায়ের প্রাণ—জননীর ক্রোড়-বিরহিত শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিল ইহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—সেই তাঁহার উদার অকৃত্রিম ভালবাসার গুণেই আমাদের দেশের হৃদয়াভ্যন্তরে তিনি চিরস্থায়ী সত্ত্ব কিনিয়া রাখিয়াছেন। স্বদেশের মঙ্গল সাধন সকলেই করিতেছেন, রামমোহন রায়ের মঙ্গলসাধন প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহার উদার প্রশস্ত হৃদয় একবারে মঙ্গলের মূলে পৌঁছিয়া সেই মূলে জল সিঞ্চন করিয়া ফল ফলাইতে প্রভূত চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; তিনি মঙ্গলের এক একটি ক্ষুদ্র শাখা লইয়া ব্যস্ত হন নাই,—শাখায় জল সিঞ্চন করিলে হইবে কি, বৃক্ষে যদি জল সিঞ্চন করিতে হয় তবে মূলেই জলসিঞ্চন কর যে ফলের উৎপত্তি হইবে। কতশত প্রখরবুদ্ধি এই সহজ সত্যটি বুঝিতে না পারিয়া জল সিঞ্চন করিয়াই সারা হন, অথচ ফল কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না ; হাত বাড়াইলেই ফল পাইবেন মনে করিয়া তাঁহারা শাখায় বসিয়া শাখাতেই জল সিঞ্চন করেন, ফল হইতে দূরে পড়িবার ভয়ে মূলে নাবিতে চাহেন না। রামমোহন রায়ের বুদ্ধি যদিও দূর দূর স্থিত বিদেশ পর্য্যন্ত, বুদ্ধির আদর্শস্থল বলিয়া গ্রহীত হয় তথাপি তাঁহার বুদ্ধি ওরূপ শাখাসক্ত ছিল না—নিখিল শাস্ত্র সমূহের মূলে সে বুদ্ধি কার্য্য করিয়াছিল—তাই আজি আমরা তাহার ফল উপার্জ্জন করিতেছি। আমাদের দেশের সেই পবিত্র নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস যে উপনিষদ শাস্ত্র তাহা সরস্বতী নদীর ন্যায় প্রায় অন্তর্হিত হইবার যো হইয়াছিল, তিনি তাহাকে বহু যত্নে উদ্ধার করিলেন—ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা কেবল নহে—স্বদেশের প্রতি কি যে আন্তরিক তাঁহার ভালবাসা ছিল তাহা দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে ; শর্করা বালুকামিশ্রিত হইলে পিপীলিকাই তাহা চিনিয়া লইতে পারে—অন্য কোন জীব তাহা পারে না, কেন না পিপীলিকাই তাহার আস্বাদ জানে, রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে অনেক মহামহা পণ্ডিত জন্মিয়াছেন তাঁহারা স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি লইয়াই কাল যাপন করিতেন—তাঁহারা উপনিষদাদি বেদান্ত শাস্ত্র আছে বলিয়া জানিতেন কি না তাহাই সন্দেহ, যদি বা জানিতেন সে জানা না জানারই তুল্য, কেন না তাহার আস্বাদ তাঁহারা জানিতেন না। রামমোহন রায় আপনার প্রশস্ত হৃদয়ের জ্যোতিতে সেই সকল প্রচ্ছন্ন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্য্যাদা অবগত হইয়া সেই মূল প্রদেশে আপনার সমুদয় যত্ন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাই আজিকার দিনে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া এই তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। উপনিষদাদি শাস্ত্র সকল আমরা বিস্মৃত ছিলাম, তাহাদিগকে আমাদের স্মৃতিপথে আনিবার জন্য

যিনি আপনার জীবনের সারাংশ ক্ষেপণ করিলেন, তাঁহাকে স্মৃতি-পথে আনিবার জন্য আমাদের কোন আয়াস পাইতে হইতেছে না—এই সমস্ত বিস্তীর্ণ বঙ্গভূমির মধ্যে একজনও এমন পাওয়া যাইবে না যে তাঁহার নামোচ্চারণে আপনাকে এবং আপনার দেশকে গৌরবান্বিত মনে না করে—অতএব সর্ব্ববাদী-সম্মত অদ্যকার এই কার্য্যে আনন্দের সহিত আসুন আমরা প্রবৃত্ত হই—তাঁহার জীবনবৃত্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার রচিত গীত সমস্তে তাঁহার মনের কথা অবগত হইয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ-মন্দিরে ঈশ্বর-বন্দনা করিয়া—অদ্যকার দিনের সার্থক্য সম্পাদন করি।

অদূরে উন্নত ভূমির উপর গায়কেরা বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা মধুর ও উচ্চস্বরে গম্ভীর মহোচ্চ ভাব-পূর্ণ তানলয়বিশুদ্ধ এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি গাইতে লাগিলেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তদ্বিদামুপদেশং।
দিনকরশিশিরকরাবতিশাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতোজগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর দেব মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রিয় সহচর ও বন্ধু। তাঁহারই প্রস্তাবে রামমোহন রায় প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। তিনি অসুস্থতা ও অক্ষমতা নিবন্ধন সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অনেকেই উৎসুক ছিলেন কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে এই বিষয়ে তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ হয় নাই। চন্দ্রশেখর বাবু আহ্বান পত্র পাইয়া যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করেন এবং অনুপস্থানের জন্য দুঃখিত হইয়া যেরূপ লিখিয়া ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু সেই দুই খানি পত্র পাঠ করিলেন।

BURDWAN, 26th Dec, 1878

My dear Rajnarayan Babu

In reply to your kind letter of the 24th, I beg to assure you, that I shall be most happy indeed, to deem it an honour to be allowed, to join the meeting on the 9th January next, in honour of the memory of Rajah Rammohun Roy, at the house of our revered Pradhan Acharjya.

I must however tell you beforehand that it shall be impossible for me in the present state of my health to take any very active part in your proceedings on the occasion.

Trusting you have been well,

I remain yours truly,
C. S. DEB.

BURDWAN, 18th January 1879.
Sunrise.

My dear Rajnarain Babu

Having had an attack of asthma since the night before last, I am afraid it shall be impossible for me to attend the meeting at Babu Devendra Nath Thakur's tomorrow afternoon. You must therefore excuse me if I fail to go down in time

I remain yours very truly,
C. S. DEB.

অনন্তর বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্থিত হইলেন। এই উৎসাহশীল যুবক ব্রাহ্মসমাজের এক জন সুপরিচিত বন্ধু। ইহাঁর সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি ও জীবন ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত। ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা। তেজস্বী অগ্নিময় বাক্যে চিত্ত উত্তেজিত করিতে এবং করুণ ও কোমল বাক্যে চিত্ত আর্দ্র করিতে ইহাঁর ন্যায় অতি অল্প লোকই পারেন। ইহাঁর উদ্দীপনায় শ্রোতৃ-

গণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ভাবের প্রখর স্রোতে নীয়মান হয়। তৎকালে কাহারই তার স্বাধীন চিন্তার অবসর থাকে না। বক্তার ভাষা সাধারণের বোধ-সুলভ ও ওজস্বী; ফলতঃ আমরা ইহাঁর বক্তৃতা-শক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত পাঠকগণকে জানাইতেছি যে আমরা স্থানাভাবে তাহার বক্তৃতার কঙ্কালমাত্র সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

নগেন্দ্র বাবু কহিলেন, আজ কি সৌভাগ্যের দিন! যে গৃহে রাজা রামমোহন রায় নিয়ত গমনাগমন করিতেন, সেস্থানে বসিয়া তিনি জনসমাজের হিতকর নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন, যে গৃহের সুকুমার শিশুদিগকে তিনি ক্রোড়ে লইতেন আজ সেই গৃহে তাঁহারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সমাগত হইয়াছি। নগেন্দ্র বাবু এইরূপে মুখবন্ধ করিয়া বক্তব্য বিষয়গুলি ক্রমশঃ বিবৃত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, রামমোহন রায় যখন অল্পবয়স্ক ছিলেন তখন তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। সেই বয়সে এই জ্ঞানেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি তির্ব্বত দেশে যাত্রা করেন। তখন বঙ্গদেশের অবস্থা অতি ভয়ানক, এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার, পথে দস্যুতস্করের অত্যন্ত উপদ্রব, কিন্তু রামমোহন রায় সেই সময় সেই অল্প বয়সে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে উপনীত হন এবং তথায় লামাধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন রামমোহন রায়ের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এতদ্দেশের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছে। এতদ্দেশে বেদ বেদান্তের কিছুমাত্র সমাদর ছিল না। চতুষ্পাঠীতে কেবল ব্যাকরণ স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্র পঠিত হইত। হিন্দু-জাতির প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বেদান্তের চর্চ্চার নাম গন্ধও ছিল না। রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ, বিচার ও প্রমাণোদ্ধার করিয়া ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

উপধর্ম্মে রামমোহন রায়ের বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল। তিনি এই উপধর্ম্ম উন্মূলন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং সেই অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। যে জাতির যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বজাতির পিতা মাতা নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার উপাসনা-স্থান। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের যে এই অভিপ্রায় ছিল ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড্ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। যে কোন জাতি যে কোন বর্ণ ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন ট্রষ্টডীডের ইহাই তাৎপর্য্য। রামমোহন রায় এই রূপে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মকে উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু এতদ্দেশের উপযোগি করিবার জন্য তাহাতে হিন্দু-ভাব অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্র আচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল এবং হিন্দুহৃদয়ের প্রিয় বৈরাগ্য বিষয়ক সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র বাবু রামমোহন রায়ের সম্পাদিত ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য বর্ণনা করিয়া তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত সমাজসংস্কার কার্য্য বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এ বিষয়ে তাঁহার সকল কার্য্য মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টাকে তিনি সর্ব্বোপরি প্রাধান্য প্রদান করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন রামমোহন রায়ের হৃদয় এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখে অতিমাত্র কাতর ছিল। চিরপ্রণয়িনী চির-

সহচরী প্রাণ দিয়াও পতিভক্তি অব্যাহত রাখিবে এই ধর্ম্ম্য ব্যবহার অবশ্যই শ্লাঘনীয় কিন্তু স্নেহের পুত্তলী পুত্র কন্যাকে সজল নয়নে জন্মের মত চুম্বন করিয়া বিদায় গ্রহণ, লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সপ্তবার চিতা প্রদক্ষিণ, চিতাশয্যায় পতির মৃত দেহোপরি শয়ন, ঘৃতধারার সহিত প্রক্ষিপ্ত শালনির্যাসে চিতানল সতেজে উদ্দীপন, শ্মশানভৈরব হরিধ্বনির সহিত তুমুল বাদ্যধ্বনি, একটি জীবন্ত মানব শরীর একদণ্ড মধ্যে ভস্মীকরণ এই সমস্ত ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য মহাত্মা রামমোহন রায়ের অতিমাত্র অসহনীয় হইয়া উঠে। তিনি প্রথমে এই কুপ্রথা উন্মূলন করিবার নিমিত্ত সকলের দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তিনি ইহার জন্য নানারূপ বিদ্রূপ ও কটূক্তি সহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের জন্য তাঁহার হিতৈষণার দুর্দমনীয় আবেগ কিছুতেই নির্বাণ হয় নাই। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত যে ভাবে গ্রহণ করিত তাঁহার নিজের বাক্যই তাহা সপ্রমাণ করিবে। সহমরণের পক্ষীয় লোকেরা বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব অতি মন্দ অতএব তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয়, রামমোহন রায় তাহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—

পঞ্চম, তাহাদের ধর্ম্মভয় অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা; দেখ কিপর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পোনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, অথাপিও ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাসীবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়াথাকে, এবং সুপকারের কর্ম্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, আমাত্যবর্গ এসকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও আমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাঁদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদিগের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজনাবশেষে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ, যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার-দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে একদিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা

করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে, এসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।

রামমোহন রায় সহগমন প্রথা উন্মূলিত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, যাহাতে বিধবার পুনঃসংস্কার হয় তদ্বিষয়েও তিনি যত্নবান হন। হিন্দুপরিবারে বিধবার অত্যন্ত দুরবস্থা, যেন তাহারই কর্ম্মবিপাক তাহার এই দুর্ঘটনার কারণ এই হেতুবাদে সে সকলের বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে, সাংসারিক কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে তাহার হস্ত নাই, সে আমরণ সমস্ত ভোগসুখে বঞ্চিত হইয়া কেবল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবে। এই তরঙ্গময় সংসারে নানা জ্বালা ও যন্ত্রণা কিন্তু তাহার জুড়াইবার স্থান নাই। আত্মীয় স্বজন তাহাকে পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতন করিতেছে কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই, তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রবৃত্তি আছে কিন্তু সকলেরই দ্বার অবরুদ্ধ। হিন্দু বিধবার এই সমস্ত কষ্ট ক্লেশ রামমোহন রায়ের প্রশস্ত ও কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছিল। হিন্দুসমাজের তদানীন্তন বদ্ধমূল কুসংস্কার নিবন্ধন তিনি বিধবার পুনঃসংস্কার প্রদানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু তিনি এই বিষয় লইয়া যে একটী আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার কোন প্রদৌহিত্র বলেন, রামমোহন রায়ের বৈষয়িক কাগজ পত্রের ভিতর এই বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের কোন নিদর্শন-পত্র তিনি দেখিয়াছেন। রামমোহন রায় যখন বিলাতে গমন করেন তখন এই জনরব উঠিয়াছিল যে তিনি বিধবাবিবাহের জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত বিলাত গমন করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, রামমোহন রায় জাতিভেদের বিপক্ষেও উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদ-প্রথার বিপক্ষে বৃদ্ধঘোষ নামক বৌদ্ধের প্রণীত বজ্রসূচি নামক গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। যখন চতুর্দ্দিকে ঘোরতর কুসংস্কার, জনসমাজ সত্যানুসন্ধান ও সত্য গ্রহণ করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ সেই সময় রামমোহন রায় সমস্ত উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ জাতিভেদের উপর কঠোর কুঠারাঘাত করেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম্য ব্যবহার ও ভ্রাতৃভাব প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পান।

নগেন্দ্র বাবু রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার কার্য্য বর্ণন করিয়া তাঁহা দ্বারা ভারতের সকল মঙ্গলের নিদানভূত উৎকৃষ্ট সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীর অনুমোদন ও সমর্থনের বিষয় বলিলেন।

রামমোহন রায়ের বুদ্ধি কর্ম্মঠ ছিল, সুতরাং যে শিক্ষার বলে মনুষ্য সামাজিক হয়, ও জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়, যে শিক্ষার বলে মনুষ্যের বুদ্ধি বদ্ধভাব পরিহার পূর্ব্বক মুক্ত বায়ুতে

বিহার করিতে পারে, যে শিক্ষা পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র এবং মনুষ্য সেই ক্ষেত্রের শ্রমজীবি কৃষক এই রূপ ভাব মনোমধ্যে আনিয়া দেয়, যে শিক্ষা মনুষ্যের অস্থিতে তেজ ও বল ও স্বাধীনতার সঞ্চার করিয়া দেয় রামমোহন রায় সেই ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিতেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বহুতর দোষ উদ্‌ঘাটন এবং ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া লর্ড আমহর্ষ্টকে যে পত্র লিখেন তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই পত্র দ্বারা আরো প্রমাণিত হইতেছে যে যদিও রামমোহন রায় ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে বেদান্তদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন তথাপি ঐ দর্শনে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল না। তিনি এই পত্রে বলিয়াছেন বেদান্তদর্শন লোককে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন করিয়া দেয়। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই, এ সমস্তই ভ্রম মাত্র, এই ভাব অন্তরে একবার বদ্ধমূল হইলে পার্থিব উন্নতিকল্পে আর কাহারই প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। বেদান্তদর্শন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব লোপের সহিত প্রীতি স্নেহ প্রভৃতি লোকের আন্তরিক কোমল ভাবগুলিও বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কে কাহার বন্ধু, কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র, কিছুই কিছু নয়, এই সর্ব্বসংহারক ঔদাস্য মনুষ্যকে বিভ্রান্ত করিয়া সংসারে আস্থাশূন্য করিয়া ফেলে। এই পত্র দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে রামমোহন রায় বৈদান্তিক ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন।

"TO HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONORABLE

LORD AMHERST, GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL

MY LORD.

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs, and ideas, are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves and afford our rulers just grounds of complaint at our apathy did we omit on occasions of importance like the present, to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

"The establishment of a new Sanscrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the natives of India by education,—a blessing for which they must ever be grateful, and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts, made to promote it, should be guided by the most enlightened principles so that the stream of intelligence may flow in the most useful channels.

"When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

"While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge, thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude, we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened nations of the West with the glorious

ambition of planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe.

"We find that the Government are establishing a Sanskrit school under Hindu Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since then produced by speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

"The Sanscrit language so difficult that almost a life time is necessary for its acquisition is well known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of valuable information it contains, this might be much more easily accomplished, by other means than the establishment of a new Sanscrit College, for there have been always and are now numerous professors of Sanscrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the new seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually proomoted, by holding out premiums and granting certain allowances to their most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in England for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed' since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanskrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following; *kha'da*, signifying to eat, *kha'dati* he or she or it eats; query, whether does *kha'dati* taken as a whole conveys the meaning he, she or it eats, or are separate parts of this meaning conveyed by distinctions of the word. As if in the English language it were asked how much meaning is there in the *eat* and how much in the *s*? And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly?

Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta;—in what manner is the the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence that as father, brother, &c. have no actual entity they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the *Mimansa* from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, &c.

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characteriesd, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the

Sanscrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry. Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a College furnished with necessary books, instruments, and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land. actuated by a desire to improve the inhabitants, and therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I have the honor &c,
RAM MOHUN ROY."

নগেন্দ্র বাবু এতদ্দেশীয়দিগের সুশিক্ষা সাধন বিষয়ে রামমোহন রায়ের যত্ন ও চেষ্টার উল্লেখ করিয়া তিনি বঙ্গভাষার যে রূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামমোহন রায়ের সময় বঙ্গভাষার অবস্থা অতিমন্দ ছিল। তৎকালে আদালতের পারস্য-মিশ্রিত বাঙ্গলাই সর্ব্বত্র ব্যবহার হইত। কিন্তু তাহা এত কদর্য্য যে তদ্দ্বারা মনের বিশেষ বিশেষ ভাব ব্যক্ত হইতে পারিত না। রামমোহন রায় এই বঙ্গভাষার সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি গদ্য লিখিবার সূত্রপাত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কোন রূপ ব্যাকরণ ছিল না তিনি তাহা প্রস্তুত করেন। রামমোহন রায় কেবল ভাষাসংস্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যে সমস্ত ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিলে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ ও কর্ম্মক্ষম হয় তিনি সেই সকল গ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুবাদিত খগোল ও জ্যাগ্রাফি (Geography) এক সময় বঙ্গদেশের বিলক্ষণ উপকার সাধন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র বাবু ভাসা-সংস্কারের বিষয় এই রূপ উল্লেখ করিয়া রামমোহন রায় এতদ্দেশের কিরূপ রাজনৈতিক উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবু কহিলেন রাজ্যমধ্যে সাধারণ মত পরিজ্ঞানের উপায় মুদ্রাযন্ত্র। প্রজারা রাজ-পুরুষদিগের ব্যবহার বিষয়ে মুক্তকণ্ঠ হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আপনাদিগের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিবে সার চার্লস মেট্‌কাফের এই অভিপ্রায়। তিনি তদনুসারে মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীন করিয়া দেন। রামমোহন রায় এই দেশহিতকর কার্য্যে অতিমাত্র প্রীত হইয়া মেটকাফকে অভিনন্দন করেন। তাঁহার হৃদয় অসহায় প্রজাদিগের জন্য অত্যন্ত কাতর ছিল। যাহাতে প্রজারা জীবন ও স্বত্ব সুখ সচ্ছন্দে রক্ষা করিতে পারে তিনি তন্নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, ইতাবসরে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় গিয়া অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে ভারতের হিতচিন্তা করিতেন। ভিন্ন দেশীয় রাজার পক্ষে ভিন্ন দেশীয় প্রজাদিগের অবস্থার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সহজ নয়, সুতরাং সেই রাজা শাসনের অনুরোধে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। রামমোহন রায় বিলাতে গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দোষ প্রদর্শন ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করেন। তিনি পার্লমেণ্ট মহাসভায় আহূত হন এবং এতদ্দেশীয়দিগের অবস্থা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। দরিদ্র কৃষক-

দিগের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। হয় ত উঁহারা কিছুই জানিতে পারে নাই কিন্তু রামমোহন রায়ের হৃদয় উহাদের জন্য অশ্রু-পাত করিত। তিনি পার্লমেণ্ট মহাসভায় ইহাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ইহাদের অবস্থা সম্যক প্রকারে সভার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন।

রামমোহন রায় সামান্য সামান্য বিষয়ের সংস্কার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এমন সামান্য বিষয় যে পরিচ্ছদ তাহার সংস্কারের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাঁহার সময় পরিচ্ছদ বিষয়ে মুসলমানদিগের অনুকরণ চলিতে ছিল কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া যান। খিড়কিদার পাগড়ীর পরিবর্ত্তে বাঁধা পাগড়ী এবং নাগরার পরিবর্ত্তে কাবা পরিধান করিবার নিয়ম তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। উক্ত কাবা এক্ষণে চাপকানে পরিণত হইয়াছে। এই পরিচ্ছদ-পরিপাট্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ ছিল। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতেও তিনি উক্ত পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া আসিতেন না এবং কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে তিনি তাহাকে তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন।

রামমোহন রায় ভারতবর্ষের যথার্থতই হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি দূরদর্শী ছিল; জনসমাজের প্রকৃত অভাব কি তিনি সেই অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন এবং সেই সময়ে এই সমস্ত অভাব মোচনের উপায় ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলতঃ আমরা যে উন্নতির সমষ্টির উপর দণ্ডায়মান আছি তিনিই ইহার সূত্রপাত করিয়া যান। যিনি ধর্ম্মসংস্কার করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহার জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি বহুল পরিমাণে পাশ্চত্ত জ্ঞান চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি সমাজ-সংস্কার করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি বঙ্গ-ভাষা সংস্কার করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি রাজনীতির উন্নতি করিতে চান রামমোহন রায় তাঁহারও জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। এখন এমন কোন শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে না যাহাতে রামমোহন রায় হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেছি। সেই মহাত্মাই সকল কার্য্যের মূলাধার।

নগেন্দ্র বাবু এইরূপে রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনের উপসংহার করিয়া কহিলেন, আমরা সেই মহাত্মার স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করিবার আজিও কোন অনুষ্ঠান করি নাই। এক্ষণে সকলের উচিত যে তিনি যে বঙ্গবিদ্যার অনুশীলনের জন্য যত্নশীল ছিলেন তাহাতে প্রবৃত্তি বিধানের নিমিত্ত ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করা। আমরা যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ তদ্দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারিবে।

অনন্তর রামমোহন রায়ের প্রশংসা সূচক একটী গীত গীত হইল।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

ছিল ভ্রান্ত ধর্ম্মে তমোময় ভারত ভুবন
যেমন অস্তাচলে রবি গেলে নিশির আগমন।
হেরে দেশের দুর্গতি রামমোহন মহামতি
প্রকাশিতে সত্যজ্যোতি করিলেন প্রাণপণ।
সর্ব্ব-জাতি-পিতা-মাতা পূজিবে সকল ভ্রাতা
করিতে উপায় তার ভাবিলেন মহাত্মন।
হলো ব্রাহ্ম ধর্ম্মোদয় পবিত্র অমৃতময়
খুলিল মহীমণ্ডলে আনন্দের প্রস্রবণ।
ধন্য মহাভাগ তুমি! ধন্য হে ভারতভূমি!
শুভক্ষণে প্রসবিলে পুরুষ রতন।

পরে বাবু রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাবে জন্মান্ধ শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা মহাশয় সভাস্থ সমস্ত লোককে আর্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত গীতটি গাইতে লাগিলেন। এই গীত ও উপরোক্ত গীতটি মেদিনীপুরে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় প্রতি বৎসর গীত হইত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন।
তোমার জন্মভূমি ভারতভূমি হয়েছে কি সুশোভন।
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল সে বঙ্গভূমি, সুরভি কুসুম তার দেখা যায় অগণন—ছুটি তার পরিমল, মোহিল দেশ সকল, হস্তিনা, দ্বারকা আরো মদ্রে ভূমিবাসীগণ।

ছিল তব আশা মাত্র, বুঝিবে লোক্ সত্যতত্ত্ব, দেখ হে কি পরিবর্ত্ত হয়েছে এখন—(তোমার) যারা করিত পীড়ন, তাদেরি সন্তানগণ, কৃতজ্ঞতা উপহার তোমারে করে অর্পণ।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় উত্থিত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক কবিত্বে সুন্দরিশেষ অনুরঞ্জিত করিয়া রামমোহন রায়ের সম্পর্কে কতকগুলি গল্প বলিলেন।

রামমোহন রায়ের শিষ্য স্থবিরশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয়ও ঐরূপ কতকগুলি গল্প বলিবেন কথা ছিল, কিন্তু এই অশীতিপর বৃদ্ধ বার্দ্ধক্য-জনিত ক্ষীণতা প্রযুক্ত সভায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি যে সকল গল্প জানিতেন তাহা বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু তাহা আপনার গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি যে গল্পগুলি করিলেন আমরা তাহার মধ্যে তিনটি নির্ব্বাচন করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(১)

আপনারা অবগত আছেন সহমরণ প্রথা নিবারণ কার্য্যে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নিকট হইতে রামমোহন রায় প্রবল সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরল ও রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক,—মণি কাঞ্চন যোগ বলিতে হইবে। রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ঘটিত একটি সুন্দর গল্প আছে। রামমোহন রায়ের নিকট হইতে সহমরণ প্রথা নিবারণ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাইতে পা

রাম-

মোহন রায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এই বাসনা জানাইয়া তাঁহার নিকট এডিকং প্রেরণ করেন। কিন্তু রামমোহন রায় বলিলেন "আমি একণে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া শাস্ত্র চর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত আছি; লাট সাহেবকে আমার বিনয় জানাইয়া বলিবেন যে রাজ-দরবারে যাইতে আমার বড় ইচ্ছা নাই অতএব তিনি যেন আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন। রামমোহন রায়ের মত মহৎ লোক যে রাজসন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছু হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। মহৎ লোকেরা রাজদর্শন ও রাজপ্রসাদের জন্য লালায়িত হয়েন না। কথিত আছে ফ্রান্স দেশীয় কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে নির্জনে বাস করিতেন। রাজা লুই ফিলিপ তাঁহার ধার্ম্মিকতার বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ তাঁহার পল্লীগ্রামস্থ বাটীতে আসিবার মানস জানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন যে "আমি রাজপ্রাসাদে যাইলে ভেবরে যাইব; আর রাজা আমার ক্ষুদ্র নিকেতনে আইলে কষ্ট অনুভব করিবেন অতএব এ বিষয়ে সর্ব্বোত্তম বন্দোবস্ত এই যে যিনি যেখানে আছেন তিনি সেই স্থানেই থাকুন।"

সেকন্দর একদা গ্রীক সন্ন্যাসী দায়োজিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। দায়োজিনিস তখন রৌদ্র পোহাইতে ছিলেন। রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত সেকন্দর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর?" দায়োজিনিস উত্তর করিলেন "আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, তুমি আমার নিকট দাঁড়িয়া থাকাতে তোমার ছায়া পড়িয়া আমার রৌদ্র পোহাইবার ব্যাঘাত হইতেছে।

অতএব তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও।” রামমোহন রায় এডিকংকে যাহা বলিলেন এডিকং তাহা লাট সাহেবকে জানাইলেন। বেন্‌টিঙ্ক এডিকংকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলে?” এডিকং উত্তর করিলেন, “আমি বলিয়াছিলাম যে লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরলের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হবেন।” বেন্‌টিঙ্ক বলিলেন যে “তুমি পুনরায় যাও, গিয়া বল যে মিষ্টর্ উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্কের সহিত আপনি একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হয়েন।” এডিকং পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট গিয়া তাহা বলিল। রামমোহন রায় বেন্‌টিঙ্কের এরূপ ভদ্রতা আর অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি বেনটিঙ্কের নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

(২)

আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন আমাদিগের যে ধর্ম্ম তাহা Universal Religion অর্থাৎ বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এই কথা বলিতেন ও অমনি ভাবে গদগদ হইতেন ও সেই সময়ে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত। আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে রামমোহন রায় শিষ্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমার মৃত্যুর পরে হিন্দুরা বলিবে আমি হিন্দু ছিলাম, মুসলমানেরা বলিবে আমি মুসলমান ছিলাম, খ্রীষ্টানেরা বলিবে আমি খ্রীষ্টান ছিলাম, কিন্তু বস্তুতঃ আমি কোন প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী নহি। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে যে ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত, অন্তর্জগৎ ও বাহ্য জগৎ যে ধর্ম্মের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যাহা ভূর্লোকে ও দ্যুলোকে ঈশ্বরহস্ত দ্বারা অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, মনুষ্যের সহজ জ্ঞান যাহার একমাত্র অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ, যাহা দেশকালের অতীত, সকল দেশের সকল কালের জ্ঞানী মনুষ্যেরা স্বীয় স্বীয় দেশ-প্রচলিত কল্পিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাহা অবলম্বন করেন, সেই বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু তাহা প্রচার করিবার সময় যে জাতির মধ্যে তিনি তাহা প্রচার করিতে সচেষ্ট হইতেন সেই জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি তাহা প্রচার করিতেন। তিনি এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হিন্দুদিগের মধ্যে বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেন, কোরান অবলম্বন করিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচার করিতেন ও বাইবেল অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচার করিতেন। তিনি এই সকল শাস্ত্র হইতে এক ঈশ্বরের মত উদ্ধার করিয়া তাহার উপদেশ দিতেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এক ঈশ্বরের মত প্রতিপাদন করিতেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাক্যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিত।

রামমোহন রায়ের মনঃকল্পিত আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের জন্য পৃথিবী তখন প্রস্তুত ছিল না, এই জন্য ধর্ম্ম প্রচারের উল্লিখিত প্রণালী তিনি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও তজ্জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হয় নাই এবং বহুকালও হইবেক না। এখনও ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহা রামমোহন রায়ের প্রচার-প্রণালী আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এখনও ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহাতে হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমি চিরকাল হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কথা বলিয়া আসিতেছি। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় যাউন, দেখিবেন দশ লক্ষ লোক সমাগত তখন বোধ হয় কোথায় বা ইংরাজী শিক্ষা! কোথায় বা ব্রাহ্মসমাজ! ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব রক্ষা করিয়া হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করিলে ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আমরা কখনই সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিব না।

(৩)

রামমোহন রায় এমনি অমায়িক-স্বভাব ছিলেন যে তিনি সামান্য দোষ জন্য শিষ্যদিগকে ভর্ৎসনা করিতে পারিতেন না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি কাবা বাঁদা পাগড়ী পরিধান করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। একবার দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় কুঠী হইতে কি-

রিয়া আসিয়া পুনরায় পোষাক না পরিয়া সামান্য ধুতি চাদর পরিয়া সমাজে আসিয়াছিলেন। রামমোহন রায় সমাজভঙ্গের পরে এই নিয়ম ভঙ্গ জন্য দ্বারকানাথ বাবুকে নিজে কিছু না বলিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহাকে বলিতে অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় বলিলেন "মহাশয় কেন বলুন না?"। রামমোহন রায় সামান্য দোষ জন্য শিষ্যদিগকে ভৎ'সনা করিতে পারিতেন না; কিন্তু নিজে কোন দোষ করিলে এবং তজ্জন্য কোন শিষ্য তাঁহাকে ভৎ'সনা করিলে তাহা বিনীত ভাবে গ্রহণ করিতেন। সেকালের প্রথা অনুসারে রামমোহন রায়ের বাবুরি ছিল। তিনি স্নানের পর তাঁহার দীর্ঘ কেশবিন্যাসে কিছু অধিক কাল ক্ষেপণ করিতেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার স্পষ্টবক্তা শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন "মহাশয়! কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে, এই গীতটি কি কেবল পরের জন্যই হইয়াছে?" রামমোহন রায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "হুঁ। বেরাদর! * ঠিক বলিয়াছ; ঠিক বলিয়াছ।"

রামমোহন রায় সামান্য দোষ জন্য শিষ্যদিগকে ভৎ'সনা করিতে পারিতেন না কিন্তু কোন গুরুতর দোষ করিলে তাহা কখনও ক্ষমা করিতেন না। অপরিমিত মদ্য পান জন্য তিনি ছয় মাস তাঁহার কোন শিষ্যের মুখদর্শন করেন নাই। তাহাতেই শিষ্য সংশোধিত হইয়া যান।

তৎপরে এই গাতটী গীত হইল।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

ভজ অকাল নির্ভয়ে।
পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্ব কাল বিদ্যমান, সর্ব্ব ভুতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।

পরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উত্থিত হইলেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একটী বিকসিত পুষ্প, সৌন্দর্য্য ও সৌরভে ধর্ম্মোদ্যান আমোদিত করিতেছেন। ধর্ম্ম ইহাঁর হৃদয়ের ধন। ইনি বৈষয়িক উন্নতি তুচ্ছ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া ভাসিয়াছেন। ইনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মও ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রদীপ্ত বহ্নি, ধর্ম্মজীবনে জ্বলন্ত প্রভা বিস্তার করিতেছেন। ইনি রামমোহন রায়ের সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক খ্যাতনামা, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত একটি বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরুদ্ধ হন। এই উৎসাহশীল যুবক উত্থিত হইয়া কহিলেন, অক্ষয় বাবুর রচনা পাঠ করিতে আজ আমার হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ উদিত হইতেছে। হর্ষের কারণ এই যে তিনি প্রথমাবস্থায় নিজের জ্ঞান ও ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে পুষ্ট করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যায় শরীর ও মন অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন সেই অক্ষয় বাবুর রচনা পাঠ করা আমি গৌরবের বিষয় জ্ঞান করি; দুঃখের বিষয় এই যে তিনি অসুস্থ শরীরে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ সেবা করিয়াছেন, আমরা এরূপ সুস্থ ও সবল হইয়াও তাহা পারিলাম না। পণ্ডিত শিবনাথ এই বলিয়া গত ২৩ পৌষ দিবসের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অক্ষয় বাবুর বিরচিত অভিনব প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ স্থান পাঠ করিতে লাগিলেন। বয়োধিক্য ও পীড়া নিবন্ধন অক্ষয় বাবুর লেখনীর তেজস্বিতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, তাহা এই প্রবন্ধ সম্যক প্রকাশ করিতেছে।

"যে সময়ে গুরুপাঠশালায় শুভঙ্করী অঙ্ক ও কুচিৎ পার্সী কায়দা শিক্ষা অবধি সর্ব্বসাধারণ বিষয়ী লোকদিগের বিদ্যা-শিক্ষার চরম সীমা ছিল, সেই সময়ে যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন বহুতর প্রধান ভাষা প্রভৃতি দশ ভাষায় ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন; যিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাষায় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক প্রস্তুত করেন, আপনার দেশভাষায় রীতিমত গদ্য

* রামমোহন রায় ভ্রাতৃভাবসূচক পারস্য শব্দ "বেরাদর" বলিয়া সকলকে সম্বোধন করিতেন।

গ্রন্থ রচনার পথ প্রদর্শন করেন, সেই ভাষার ব্যাকরণ রচনাদি দ্বারা তাহার শিক্ষা-প্রচলনের উপায়ানুষ্ঠান করেন এবং যেরূপ শিক্ষায় লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান-পথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনাদি দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা পান; যে সময়ে তাহারা ঘোরতর অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার কুসংস্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তেজস্বিতা প্রভাবে সমুদায় কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাদি সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে সুনিপুণ ও কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে কত কত অতি দূরবর্ত্তি ভূমি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা দেশের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি, নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করেন, যিনি স্বদেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যথায় ব্যথিত ও করুণ রসে অভিষিক্ত হইয়া তদীয় শিক্ষা বিষয়ে সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন ও নিতান্ত সানুকূলভাব প্রকাশ করেন, [illegible] রীতি ও [illegible] কার বিষয়ক ব্যবস্থা তাহাদের অশেষ ক্লেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়া প্রচার করেন, অসঙ্গত [illegible] প্রাণপণে সহমরণরূপ বিষময় প্রথা নিবারণ করেন এবং দেশময় এই জনপ্রবাদ প্রচারিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া [illegible] প্রচলনের উদ্যোগ পাইবেন এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, যে সময়ে স্বদেশীয় লোক [illegible] ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতেই পারিত না, সেই সময়ে যিনি ঐ ধর্ম্মটি আপনার [illegible] স্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাঁহাদের [illegible] বিদ্বেষ ও ঘোরতর প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তাহাদেরই দুঃখ হরণ, সুখবর্দ্ধন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিতে নিরন্তর প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন, কেবল স্বদেশীয় শুভান্বেষণ নয়, যিনি ভূমণ্ডলের প্রধান প্রধান অন্যান্য ধর্ম্ম সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের হিতানুষ্ঠান বিষয়েও উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন; কেবল [illegible] যিনি স্বয়ং স্বাধীন দেশের অধিবাসী ও রাজপুরুষদের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, নিজের যুক্তি, বিদ্যা ও ক্ষমতা প্রভাবে রাজশাসনপ্রণালী সংশোধন ও উন্নতি সাধন করিয়া স্বদেশীয় লোকের দুঃখ হরণ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ অতিশয় সাবধানতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে চেষ্টা পান ও অসাধারণ বুদ্ধি-গৌরব, [illegible], অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অনুরক্ত থাকেন, যে সময়েও আপনার জীবিতকাল মধ্যে যত দূর সম্ভব কৃতকার্য্য হন এবং যিনি উল্লিখিতরূপ মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্বহিতৈষিতা, সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য জাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান, তাঁহার সদৃশ উক্তরূপ অসাধারণ বহুতর গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে এবং বিশেষতঃ এরূপ অযোগ্য দেশে আর কখনও জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্যবিষয়িণী অলোকসামান্য বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতার একত্রসংযোগ আর কখন ঘটে নাই বোধ হয়।

অক্ষয় বাবু আর একস্থানে বলিয়াছেন।

ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকাশ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছচিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময়-পঙ্কিল-ভূমি-পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয় গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য-পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূলপক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ; তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছি। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্য-ধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণদুর্ম্মদ বীর পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ এবং বিচার যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যকরূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমি খণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান

রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

তুমি এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্র সমূহ উত্তরণ পূর্ব্বক ব্রিটিস রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানা-বিষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ সাধনার্থে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জনসমাজে চমৎকারসম্বলিত এরূপ একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস বা নিউটন ধরণী-মণ্ডলে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম-গ্রহণ অবনীমণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না।

সহমরণ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের সদ্বিদ্যা-সম্পাদন ইত্যাদি তোমার কত জয়-স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী শক্তি সংস্থাপন উদ্দেশে [illegible] কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূরস্থিত ভূখণ্ড বাসী সুপণ্ডিত সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই শুভসংকল্প সঙ্কলিত ও কতই দয়া-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু এই ভারতের কপাল মন্দ। সে সমুদয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না।—ব্রিষ্টল! ব্রিষ্টল! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি উৎপদ্যমান হইয়াছিল, সেই অলোক-সামান্য বৃক্ষমূলে সাংঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ।

অক্ষয় বাবু এই বলিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিয়াছেন।

তিনি জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোক কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন উত্তরকালীন লোকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাঁহার তাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ড ভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একটি রীতিমত সমাধি মন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল, ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্মরণার্থে তদীয় প্রতিরূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বেণ্টিক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা, কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম!

সময়াভাবে শেষের দুইটী সঙ্গীত গীত হইল না। সেই দুইটী গীত এই—

রাগিণী সাহানা—তাল ধামার।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওট।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তারে।
ওঁ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

পরে বাবু রাজনারায়ণ বসু উত্থিত হইয়া কহিলেন, আমি প্রস্তাব করি নগেন্দ্র বাবু অদ্যকার সভার কার্য্যবিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব সকলের গ্রাহ্য হইল

ক্রমশ সায়ংসন্ধ্যা আসন্ন হইতে লাগিল। আমরা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে চলিলাম। সূর্য্য অস্তে গিয়াছে, সমাজগৃহের দীপাবলী

প্রজ্বলিত হইল। আমরা ভক্তিভরে সমস্বরে ঈশ্বরবন্দনা করিয়া দিবসের পবিত্র কার্য্য শেষ করিলাম।

বন্দনা।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা, সঙ্কট-ভয় দুখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা।

জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা. বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা।

জয় দেব জয় দেব।

জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে, পরমশরণ তুমি হে জীবন মরণে।

জয় দেব জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা. শরণাগত-বৎসল তুমি পরম পিতা মাতা।

জয় দেব জয় দেব।

আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার, একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।

জয় দেব জয় দেব।

শত অপরাধী আমরা পাপ ক্ষমা কর হে, প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে, তব প্রসাদ লাভে প্রভু পাপ তাপ না রহে।

জয় দেব জয় দেব।

মিলিয়ে ভক্ত-সমাজ মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান, কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান।

জয় দেব জয় দেব।

কি আর যাচিব আমরা করি হে এমিনতি, প্রভু করি হে এমিনতি, এলোকে সুমতি দাও পর লোকে সুগতি।

জয় দেব জয় দেব।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ রবিবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবে।

আয় ব্যয়

মাঘ ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৮১৸৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	১৫০।/৫
সমষ্টি	৬৩২। ১০
ব্যয়	৩৮০॥৶১৫
স্থিত	২৫১॥ ১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		১৮৬৸/১৫
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১১৶৫	
,, চন্দ্রশেখর দেব	৫০	
,, শিবচন্দ্র দেব	৫	
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী	৫	
শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২	
,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১	
,, দিননাথ অধ্যেতা	১	
	১৭৫৶৫	
দানাধারে প্রাপ্ত	৮॥০	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৩৶১০	
	১৮৬৸১৫	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৭৪। ১০
পুস্তকালয় ...		৮০॥৶১৫
যন্ত্রালয় ...		৫০৸ ১৫
গচ্ছিত ...		৮৯। ১০
সমষ্টি		৪৮১৸৶৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১০৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯৬॥/ ৫
পুস্তকালয়	৩৩।৶১০
যন্ত্রালয়	৮৯৸/১০
গচ্ছিত	৫৭৸/১০
সমষ্টি	৩৮০॥৶১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ চৈত্র শুক্রবার।